পরিবেশ সমীক্ষা

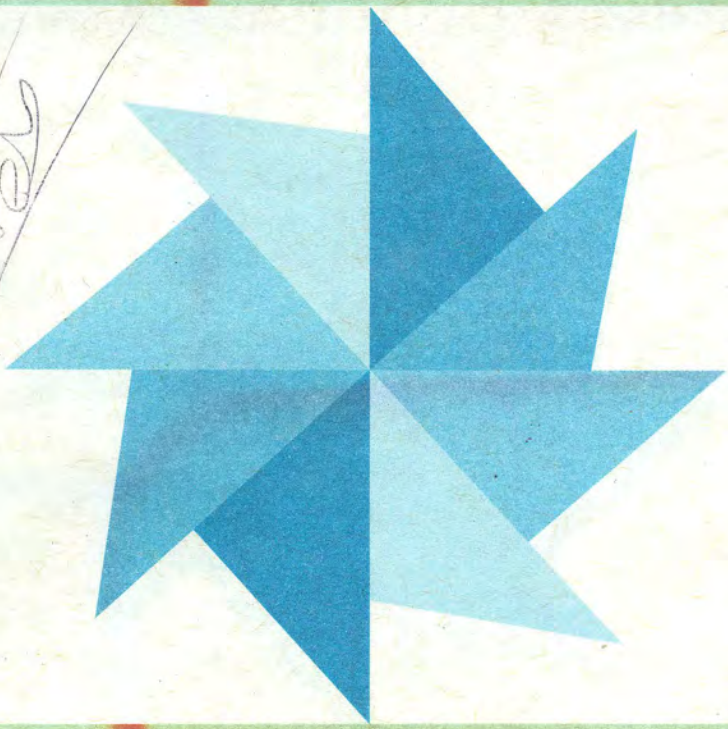

বিশ্বনাথ মজুমদার

পরিবেশ সমীক্ষা

[ENVIRONMENTAL STUDIES]

বিশ্বনাথ মজুমদার
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
ভিটিটিআই, বগুড়া

বাংলা একাডেমী ঢাকা

কলি-৩
BANSDOC Library
Accession No. 17785
Date 10.6.04

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪১০
মে ২০০৩

বাএ ৪৩৪২

(২০০২-২০০৩ পাঠ্যপুস্তক : ভৌ ও প্র ৪)

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগ

ভৌ ও প্র ২২০

প্রকাশক
মুহম্মদ নূরুল হুদা
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোঃ হামিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
মোঃ আবদুর রৌউফ সরকার

মূল্য : ১২০.০০

PARIBESH SAMIKSHA (Environmental Studies) by Biswanath Mazumdar. Published by Mohammad Nurul Huda, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition, May 2003. Price : Taka 120.00 only .

ISBN 984-07-4351-1

ভূমিকা

'পরিবেশ সমীক্ষা' গ্রন্থটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পিটি-৫৫২ (এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ) বিষয়ের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী লেখা হয়েছে। এটি পলিটেকনিক, মনোটেকনিক এবং টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের সব বিভাগের শিক্ষার্থীর ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ পর্বের একটি আবশ্যকীয় বিষয়। বোর্ডের সাম্প্রতিক প্রশ্নের ধারা অনুযায়ী সহজ ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি বাংলাদেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

গ্রন্থটি প্রণয়ন করতে পরিভাষা সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর কারণ ডিপ্লোমা প্রকৌশল বিষয়ে কোনো পরিভাষা নেই। সুতরাং সঙ্গত কারণে এ গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসঙ্গত মনে হলে সবাই ক্ষমাসুন্দরভাবে নেবেন বলে আশা করি এবং ব্যবহৃত শব্দের প্রকৃত পরিভাষা আমাকে লিখিতভাবে জানালে তা পরবর্তী সংস্করণে ব্যবহার করার চেষ্টা করব।

গ্রন্থটির দ্রুত প্রকাশনার জন্য বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগের ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগের সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্বনাথ মজুমদার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : পরিবেশ পরিচিতি ১-৩৩

১.১ কোর্সের পটভূমি ; ১.২ বাংলাদেশের আঞ্চলিক চিত্র ; ১.৩ দেশের জনসংখ্যা ও অর্থনীতি ; ১.৪ পরিবেশগত নাগরিকত্ব কার্যক্রম ; ১.৫ পরিবেশ ও উন্নয়ন ; ১.৬ জনসংখ্যার ধারা, আয় এবং দরিদ্রতা ; ১.৭ আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থা, কাঠামো ও কার্যাবলি ; ১.৮ আন্তঃজৈবিক কাঠামো ; ১.৯ পরিবেশ সংশ্লিষ্ট শব্দ ও সংজ্ঞা ; প্রশ্নমালা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সম্পদ ও পরিবেশ ৩৪-৭৯

২.১ সম্পদ ; ২.২ ভূ-সম্পত্তি ; ২.৩ কৃষি প্রতিবেশী অঞ্চল ; ২.৪ বাংলাদেশের জলাভূমি ; ২.৫ বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা ; ২.৬ দেশের ব-দ্বীপ গঠন ; ২.৭ দেশের পানি সম্পদ ; ২.৮ দেশের শক্তি সম্পদ ; ২.৯ দেশের খনিজ সম্পদ ; ২.১০ দেশে উৎপাদিত শস্য ; ২.১১ দেশের মৎস্য সম্পদ ; ২.১২ দেশের গৃহপালিত পশু সম্পদ ; ২.১৩ বাংলাদেশের বনজ সম্পদ ; ২.১৪ দেশের জীব-বৈচিত্র্য ; প্রশ্নমালা।

তৃতীয় অধ্যায় : প্রধান পরিবেশগত বিষয় ৮০-১১৮

৩.১ পরিবেশগত বিষয় ; ৩.২ বন্যার কারণ ; ৩.৩ বাংলাদেশের আকস্মিক বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতি ; ৩.৪ ঘূর্ণিঝড়ের কারণ ; ৩.৫ অনাবৃষ্টি বা খরার কারণ ; ৩.৬ ভূমিক্ষয়ের কারণ ; ৩.৭ লবণাক্ততার কারণ ; ৩.৮ বন্যা ব্যবস্থাপনা ; ৩.৯ পরিবেশ দূষণ ; ৩.১০ নগরায়ণ ; ৩.১১ স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রভাব ; ৩.১২ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ; প্রশ্নমালা।

চতুর্থ অধ্যায় : দূষণ ও ব্যবস্থাপনা ১১৯-১৭৮

৪.১ দূষণ ; ৪.২ বায়ু দূষণ ; ৪.৩ বায়ু দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ; ৪.৪ পানি দূষণ ; ৪.৫ পানির দূষণ রোধের ব্যবস্থা ; ৪.৬ শব্দ দূষণ ; ৪.৭ শব্দ দূষণ রোধের উপায় ; ৪.৮ মোটরযান শিল্পে দূষণ ; ৪.৯ ইট প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানে দূষণ ; ৪.১০ রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে দূষণ ; ৪.১১ পেস্টিসাইডের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া ; ৪.১২ অজৈব সারের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া ; ৪.১৩ বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা ; ৪.১৪ গ্রাম্য

পায়খানা ব্যবস্থা ; ৪.১৫ শহরের পায়খানা ব্যবস্থা ; ৪.১৬ শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ; ৪.১৭ সিউয়েজ শোধন ; ৪.১৮ বাতাস ও পানির গুণগত মানের বিশ্লেষণমূলক ধারণা ; ৪.১৯ পরিবেশের গুণগত আদর্শমান ; প্রশ্নমালা।

পঞ্চম অধ্যায় : **ভূ-মন্ডল ও আঞ্চলিক পরিবেশগত বিষয়** ১৭৯-২০৭

৫.১ ভূমিকা ; ৫.২ গ্রীন হাউজ ; ৫.৩ গ্রীন হাউজ গ্যাস ; ৫.৪ গ্রীন হাউজের প্রতিক্রিয়া ; ৫.৫ ওজোন স্তর এবং এর প্রতিক্রিয়া ; ৫.৬ ওজোন স্তরের ক্ষয় ; ৫.৭ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও প্রতিক্রিয়া ; ৫.৮ সমুদ্রের পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস ; ৫.৯ উপরিভাগের পানি বণ্টন ; ৫.১০ সমুদ্র দূষণ ; প্রশ্নমালা।

ষষ্ঠ অধ্যায় : **পরিবেশগত কাঠামো, নীতিমালা ও নির্দেশনা** ২০৮-২২২

৬.১ পরিবেশগত কাঠামো ; ৬.২ জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ; ৬.৩ জলবায়ু পরিবর্তনের উপর সম্মেলনের কাঠামোগত কার্যাবলি ; ৬.৪ জাতীয় পরিবেশ সংক্রান্ত আইনসমূহ ; ৬.৫ বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি ; ৬.৬ জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিম্যাপ, বাংলাদেশ ; ৬.৭ পরিবেশগত দিক নির্দেশনা ; প্রশ্নমালা।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের প্রশ্নপত্রের নমুনা ২২৩-২৩০

গ্রন্থপঞ্জি ২৩১

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশ পরিচিতি

১.১ কোর্সের পটভূমি (Course background)

জীবকে কেন্দ্র করেই পরিবেশ অর্থাৎ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাঝে প্রাণী ও উদ্ভিদ অবস্থান করে তাকে পরিবেশ বলে। আবহাওয়া, জলবায়ু, শীত-গ্রীষ্ম, খরা, বন্যা প্রভৃতি পরিবেশকে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যা, শিক্ষার হার ইত্যাদি একটি দেশের উন্নয়নের ধারক ও বাহক। যে দেশে জনসংখ্যা কম এবং শিক্ষার হার বেশি, সে দেশ উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। একটি দেশের জনসংখ্যা বেড়ে গেলে পরিবেশ দূষণের হারও বেড়ে যায়। অনুন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যা বেশি, শিক্ষার হার কম এবং বিভিন্ন কারণে পরিবেশ দূষণের ফলে সে দেশে অসুখ-বিসুখের মাত্রা ও মৃত্যুহার উন্নত বিশ্বের চেয়ে তুলনামূলক বেশি। তবে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে আমাদের দেশে পূর্বের তুলনায় মৃত্যুহার কমছে এবং এ কারণেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ক্ষতিকর, উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তা বাধাস্বরূপ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ শুধু কর্মক্ষমই হয় না, বরং সুচিন্তার মাধ্যমে পরিশ্রম করে তারা দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করতে পারে। সে কারণে পরিবেশ সংরক্ষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বসতবাড়ি, অফিস-আদালত, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। নিয়ন্ত্রিত পানি সরবরাহ, স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহার, পয়ঃনিষ্কাশন পদ্ধতি, প্রচুর গাছপালা লাগানো, বর্জ্য পদার্থের যথাযথ পুনর্ব্যবহার এবং অপসারণ প্রভৃতি পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এগুলো নিয়ন্ত্রণে থাকলে পরিবেশের ভারসাম্যও ঠিক থাকে। বিশ্বের পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ প্রতিনিয়তই পরিবেশ দূষণের বিষক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কবাণী প্রচার করে আসছেন। এ লক্ষ্যে শিক্ষিত ও স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তিগণ কিছু সতর্কতা ব্যবস্থা নিলেও পারিপার্শ্বিকতা ও আভিজাত্য বজায় রাখার কারণে তাঁরাও অনেক সময় পরিবেশ দূষণ করে থাকেন। যেমন : তাঁদের ব্যবহৃত মোটরযান, ফ্রিজ, এসি প্রভৃতি থেকে প্রতিনিয়ত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) প্রভৃতি গ্যাস নির্গত হয় যা দ্বারা পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়। বস্তিবাসীদের ঘর-বাড়ি থেকে যে হারে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ধনী ব্যক্তিদের দ্বারাও পরিবেশ কম দূষিত হচ্ছে না।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে বছরে একদিন করে পরিবেশ দিবস, স্বাস্থ্য দিবসসহ বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে তেমন সচেতনতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। পরিবেশ দূষণ রোধে আইন প্রয়োগ করলে পরিবেশ দূষণ ঘটানোর পূর্বে মানুষের ভয়-ভীতি থাকে এবং এজন্য পরিবেশ দূষণ রোধ হতে পারে। যেমন বাংলাদেশে আইন করে পলিথিনের ব্যাগ

ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এজন্য বর্তমানে ও ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণ কিছুটা হলেও রোধ হচ্ছে বা হবে। পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রতিনিয়ত বেড়ে যাওয়ায় মানুষ পরিবেশ দূষণের অপকারিতা সম্পর্কে প্রতিনিয়ত বুঝতে পারছে এবং নিজেদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুখে-শান্তিতে বসবাস করার তাগিদে মানুষ পরিবেশ উন্নত করার চেষ্টা করছে। এজন্য প্রতি বছরই পৃথিবীর ১৭২টি দেশ ধরিত্রী সম্মেলনে (Earth Summit) বসছে এবং বায়ুমণ্ডল, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি দূষণমুক্ত রাখতে ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে। বিশ্বের পরিবেশ দূষণ অব্যাহত থাকলে এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে আমাদের দেশের ভূ-খণ্ডের ১৭ শতাংশ পানির নিচে তলিয়ে যাবে, যেখানে দেশের ৬ মিলিয়ন লোক বসবাস করছে। একই কারণে মালদ্বীপও সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞগণের ধারণা।

পৃথিবীর জলবায়ু ও আবহাওয়া দূষিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন দেশে বন্যা, খরা, মহামারি ও নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি হচ্ছে এবং কোনো কোনো এলাকা নদী শূন্য বা গাছপালা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। যানবাহনের কালো ধোঁয়া, সীসাযুক্ত পেট্রোলের ব্যবহার, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য প্রভৃতি পরিবেশকে দুর্বিষহ করে তুলছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে চামড়ার পচা গন্ধ মানুষের মস্তিষ্ককে অকেজো করে দেয় এবং বক্ষব্যাধি ঘটায়।

উন্নত বিশ্বে গ্রীন হাউজ গ্যাসের উৎপাদন বেশি কিন্তু গরিব দেশগুলোতে গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রাদুর্ভাব কম থাকলেও একই ভূভাগের আয়তন অনুযায়ী আমাদের দেশের জনসংখ্যা ভয়াবহ পর্যায়ে চলে গেছে। ভবিষ্যতে জনসংখ্যার হার কমানো, শিক্ষার হার বাড়ানো, পরিবেশ সঠিক রাখতে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি পদক্ষেপ নিলে ভবিষ্যৎ অনেকটা আশঙ্কামুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায় বলতে হয়, "এ পৃথিবী তুমি যেভাবে পেয়েছো, আগামী প্রজন্মের জন্য তার চেয়ে খারাপ করে রেখে যেওনা।"

১.২ বাংলাদেশের আঞ্চলিক চিত্র

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এটি ২০°৩৪″ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬°৩৮″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১″ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯২°৪১″ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের আয়তন প্রায় ১,৪৮,৩৯৩ বর্গকিলোমিটার (নদী ও বনাঞ্চলসহ)। নদী অঞ্চলের আয়তন ৯.৩৭৯.৫১ বর্গকিলোমিটার এবং বনাঞ্চলের আয়তন ২২,৫৮৪ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের সীমারেখা ৪,৭১১.১৫ কিলোমিটার। তন্মধ্যে বাংলাদেশ-ভারত সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫.১৮ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমারেখার দৈর্ঘ্য ২৮০ কিলোমিটার। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের তটরেখা ৭১৬ কিলোমিটার বিস্তৃত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে মায়ানমার ও ভারতের ত্রিপুরা মিজোরাম রাজ্য।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী পশ্চিম ও উত্তর পূর্বদিক থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একযোগে এ সুবিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। এখানে সীমিত উচ্চভূমি, বিস্তীর্ণ সমভূমি এবং অসংখ্য নদ-নদী রয়েছে। সে কারণে বাংলাদেশকে নদীবিধৌত দেশ বলে। ১.১ চিত্রে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও আঞ্চলিক চিত্র

দেখানো হয়েছে। ভূ-প্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যেমন :

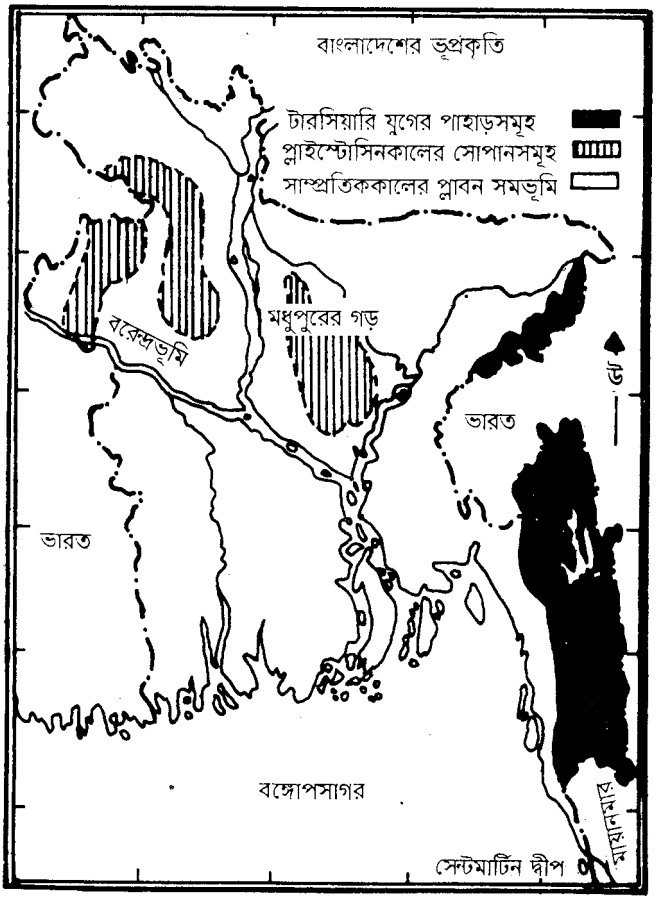

চিত্র ১.১ : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও আঞ্চলিক চিত্র।

(১) পাহাড়িয়া অঞ্চল : পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, সিলেট, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ জুড়ে পাহাড়িয়া অঞ্চল গঠিত। তবে, প্রকৃত পাহাড়িয়া এলাকা বলতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম এলাকাকেই বুঝায়। এখানে পাহাড় ও টিলার সমাবেশ রয়েছে। এই পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা প্রায় ৬০০ মিটার। পাহাড়গুলোর উচ্চতা পশ্চিম দিক থেকে ক্রমশ পূর্বদিকে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কেওক্রাডং এবং উচ্চতা প্রায় ১২৪০ মিটার।

(২) পুরাতন পলল গঠিত চত্বরভূমি : রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের বরেন্দ্র অঞ্চল, মধুপুরের গড়, ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লার লালমাই এলাকা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। গড়গুলোর সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রায় ৭০ মিটার।

(৩) পলল গঠিত সমভূমি অঞ্চল : সাধারণত নদ-নদী বিধৌত সমভূমি অঞ্চলকে পলল গঠিত সমভূমি অঞ্চল বলে। দেশের বড় বড় নদ-নদী যেমন, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, আড়িয়ালখাঁ এবং এগুলোর শাখা নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে এই সমভূমি অঞ্চল গঠিত।

১.৩ দেশের জনসংখ্যা ও অর্থনীতি (People and Economy of the Country)

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯৯ সালের তথ্য মোতাবেক দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৩০ মিলিয়ন বা ১৩ কোটি। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ১.৯২% (১৯৯৩) এবং জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা ২০৩২ সালের মধ্যে।

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি জনসংখ্যার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। উপযুক্ত জনশক্তি ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ দেশও অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশানুরূপ অগ্রগতি লাভ করতে পারে না।

১৯৯১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রতিবর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৭৫০ জন। যেখানে ১৯৮১ সালে ছিল ৬০৫ জন। জনবসতি বণ্টনের হারও সর্বত্র সমান নয়। ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকার উর্বরতা, কর্মসংস্থানের সুবিধা প্রভৃতি কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল জনবসতির অনুপযোগী হওয়ায় জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত কম।

পদ্মা, যুমনা ও মেঘনা উপত্যকার উর্বর মৃত্তিকা কৃষি কাজের জন্য বিশেষ উপযোগী। এ কারণে এ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক। জনসংখ্যার সর্বাধিক ঘনত্ব ঢাকা এলাকায়। বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনবহুল দেশ কিন্তু আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম। সেজন্য এখানকার জনসংখ্যার ঘনত্বও খুব বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জনসংখ্যার ঘনত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যার আধিক্য দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশে নগরায়ণের হার অতি নগণ্য। শিল্প-বাণিজ্যে দেশের অনগ্রসরতাই এর অন্যতম কারণ। দেশের শতকরা প্রায় ১৫ জন লোক শহরে বাস করে। অধিকাংশ শহরই সংগ্রহণ ও বিতরণ কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। প্রায় সকল শহরই শাসনকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। শিল্প শহরের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ১.২ চিত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। এই দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষিকাজের সাথে জড়িত। সেজন্য এই দেশকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয়। এখানে শিল্পের সংখ্যা খুবই কম। এ দেশে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ লোক বেকার রয়েছে। এ দেশে বার্ষিক গড় মাথা পিছু আয় ১৯৯৮ সালের তথ্য মোতাবেক ২৯৮৩ মার্কিন ডলার। সে কারণে, এ দেশ বিদেশী সাহায্য ও ঋণের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ দেশে শিক্ষিতের হার বর্তমানে পূর্বের চেয়ে বেশি এবং

প্রায় ৫০% লোক নিরক্ষর ও অর্ধশিক্ষিত বলে দেশের উন্নতিকল্পে কাজ করার জ্ঞান সীমিত। সে কারণে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিম্নগামী। রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, অসামাজিক কাজকর্ম প্রভৃতির কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। শিক্ষার হার বৃদ্ধি, শিল্প কারখানার প্রসারতা, স্কুল-কলেজে নৈতিক শিক্ষার প্রচলন ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা হ্রাস পেলে দেশের বেকারত্ব কমবে এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোও সুদৃঢ় হবে।

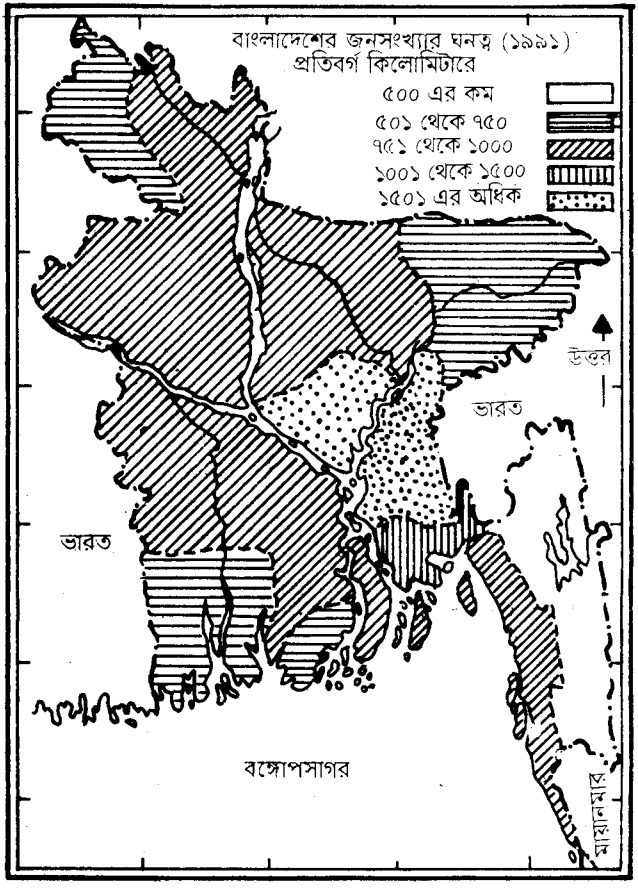

চিত্র ১.২ : বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব।

দেশ বেকারত্বের ভারে জর্জরিত বিধায় প্রতিবছর হাজার হাজার প্রকৌশলী, কারিগর, দক্ষ শ্রমিক, আধাদক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিচ্ছে। কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখানে প্রতিবছর খাদ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। পাট, চা, চামড়া, হিমায়িত চিংড়ি

প্রভৃতি প্রধান রফতানিযোগ্য উপাদান। রবিশস্য, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন ইত্যাদি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রায় ১১% জাতীয় আয় এবং ৮৬% বিদেশী সাহায্য ও ঋণের উপর নির্ভরশীল। দেশে জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে, যার মাত্রা ১৯৯০ সালে ৩.৪ এবং ১৯৯৫ সালে ৫.১ ছিল।

১.৪ পরিবেশগত নাগরিকত্ব কার্যক্রম (Environmental Citizenship Programme)

একটি দেশের নাগরিক হিসেবে একজন মানুষ পরিবেশ উন্নয়ন সংরক্ষণের জন্য যেসব ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে, তাকেই পরিবেশগত নাগরিকত্ব কার্যক্রম বলে। এই কার্যক্রম নিম্নরূপ :

(১) বসবাসের পরিবেশ প্রত্যেককে নিজ দায়িত্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। তাহলে তিনি এবং পরিবারের সকলেই স্বাস্থ্য ঠিক রেখে চলতে পারেন। অন্যের জন্যও এই পরিবেশ উপকারে আসে।

(২) বাড়িঘরের বর্জ্য পদার্থ একটি নির্দিষ্ট পাত্রে জমা করে রেখে তা ক্ষেতে বা সবজি বাগানে দেয়া যেতে পারে। এতে আবর্জনা থেকে পরিবেশ রক্ষা পেল এবং গাছপালা ও সবজি ক্ষেতে বিনা পয়সায় সার দেয়া হলো।

(৩) গাছে যখন পানি দেয়া প্রয়োজন তখনই এবং পরিমিত পানি দিতে হবে কারণ অপচয় করলে পানির কষ্টে তাঁকেই পড়তে হতে পারে।

(৪) ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটরে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন গ্যাস (CFC) ব্যবহৃত হয় যা ক্ষতিকর এবং এই গ্যাস ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

(৫) খাবার পানি অনেকক্ষণ উত্তপ্ত করলে এতে উপস্থিত উপকারী খনিজ পদার্থের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং পানি ফুটতে থাকলে তাপ নিভিয়ে ফেলা উচিত।

(৬) শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সংশ্লিষ্ট সকলেরই নাগরিক দায়িত্ব।

(৭) বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধারে, স্কুল ও অফিসের খোলা জায়গায় বিভিন্ন ধরনের গাছপালা লাগানো দরকার। কারণ, গাছপালা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে, যা মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য অতীব প্রয়োজন।

(৮) কাজ শেষে শ্রেণীকক্ষ, বাড়িঘর, অফিস-আদালত প্রত্যেক এলাকারই বাতি, পাখা প্রভৃতি বন্ধ করা কর্তব্য।

(৯) বাড়িতে পশু-পাখির আবাদ করা ভালো, এতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়। এগুলো থেকে অল্প শ্রমে সহজে পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়। আবার পুকুরের উপরে হাঁস-মুরগীর আবাদ এবং পুকুরে মাছের চাষ করলে হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা (মল) মাছ খেয়ে পরিবেশ দূষণ রোধ করে।

(১০) পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ রাখতে হবে।

(১১) মানুষ ও পশুপাখির যেমন খাদ্য দরকার, গাছপালার জন্যও পরিমিত সার প্রয়োগ করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য, এতে বাড়তি ফলনও পাওয়া যায়।

(১২) অল্প সংখ্যক জামা-কাপড় ব্যবহার করা উচিত, এতে অপচয় হ্রাস হয় (waste reduction)।

(১৩) গাড়ির পরিবর্তে সাইকেল, রিকশা প্রভৃতি ব্যবহার করা স্বাস্থ্যসম্মত। এতে ব্যায়াম হয়, খরচ কম হয় এবং পরিবেশ দূষণের পরিমাণও হ্রাস পায়।

(১৪) পানির ট্যাপের প্যাঁচ কেটে গেলে তা তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত অথবা পরিবর্তন করতে হয়। এতে পানির অপচয় রোধ হয়।

(১৫) জমিতে কেঁচো বেশি থাকলে জমির উর্বরা শক্তি বাড়ে। কেঁচো প্ল্যান্ট তৈরি করলে কেঁচো জমির বর্জ্য পদার্থ খেয়ে বাঁচে এবং কেঁচোর বর্জ্য থেকে ক্ষেতের জন্য প্রয়োজনীয় সার তৈরি হতে পারে।

(১৬) অ্যারোসল (aerosol) জাতীয় বিষ, প্রোপেন গ্যাস প্রভৃতি ব্যবহার রোধ করা আবশ্যক।

(১৭) নিজস্ব গাড়িতে দূর-দূরান্তে ভ্রমণের চেয়ে রেলগাড়িতে ভ্রমণ করা স্বাস্থ্যকর।

(১৮) অফিস-আদালতে একটি খাম (envelope) বারবার ব্যবহার করা যায়, এতে কাগজের এবং অর্থের সাশ্রয় হয়।

(১৯) ঘর-বাড়ি, অফিস-আদালতে কাগজ জমা করে রেখে তা পুনঃচক্রের (recycle) মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়।

(২০) যাদের মোটরযান আছে, তাঁদের মোটরযান থেকে যাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত না হয় সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ইঞ্জিন যত পুরানো হয়, তা থেকে CO_2 এবং CO গ্যাস অধিক হারে নির্গত হয়। সুতরাং মোটরযানের ইঞ্জিনের কার্যকাল শেষ হয়ে গেলে সেটি অকেজো বলে গণ্য করতে হবে। উন্নত দেশের গাড়ির মালিকগণ এই নিয়ম অনুসরণ করেন এবং দরিদ্র দেশের জনগণ সে গাড়ি ক্রয় করে রিকন্ডিশন মোটরযান (reconditioned vehicle) হিসেবে ব্যবহার করেন, যেটি পরিবেশ রক্ষণের জন্য মোটেই ঠিক নয়। তবে, নিজ নিজ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সব জনগোষ্ঠীকে নাগরিক হিসেবে যে সাধারণ কার্যক্রমগুলো করতে হয় তা নিম্নরূপ :

(ক) নিজ নিজ ঘরবাড়ির পরিবেশ, পাড়া, গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলা তথা দেশের পরিবেশ বসবাস উপযোগী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। এজন্য পাড়া ও মহল্লায় মজা পুকুর, ঝোপ জঙ্গল প্রভৃতি পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করতে হয়।

(খ) ঘরবাড়ি ও এলাকার বর্জ্য আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে তা নির্দিষ্ট সময়ে পুড়িয়ে ফেলতে অথবা মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়।

(গ) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ঠিক রাখতে পারেন।

(ঘ) অফিস আদালত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির অভ্যন্তরীণ ময়লা ও বর্জ্য পদার্থ নির্দিষ্ট স্থানে জমা করতে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

(ঙ) যেসব এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়, সে এলাকার জনগণকে অধিক সতর্ক হতে হয়। এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে নিজে যেমন বাঁচতে পারে, একইসাথে অপরকেও বাঁচাতে পারে।

(চ) কোনো বাড়িতে আগুন লাগলে প্রত্যেকেরই উচিত পানি, বালি, ভেজা কাঁথা অথবা কম্বল দ্বারা আগুন নেভানো। ফলে অন্যের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমে এবং নিজের ঘরও পোড়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

(ছ) অসুখ ও মহামারিতে নিজ এলাকার জ্ঞানী, গুণী, ডাক্তার প্রত্যেককে সচেতন হতে হয় এবং মহামারি রোধ করতে জনগণকে পরামর্শ দান, টীকা দান, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করতে হয়।

১.৫ পরিবেশ ও উন্নয়ন (Environment and Development)

পরিবেশ বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হতে পারে। যেমন : বসতবাড়ির পরিবেশ, বাগানের পরিবেশ, গ্রামীণ পরিবেশ, হাট-বাজারের পরিবেশ, রাস্তাঘাটের পরিবেশ, পশু পালনের পরিবেশ, কৃষিক্ষেতের পরিবেশ, শিল্প-কারখানার পরিবেশ, অফিস আদালতের পরিবেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ইত্যাদি পূর্বে যেমন ছিল বর্তমানে অবিকল তেমনটি নেই। শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে পরিবেশেরও উন্নয়ন ঘটছে। এ উন্নয়নের ধারা নিচে বর্ণিত হয়েছে।

(১) শিক্ষার অগ্রগতিতে পরিবেশ উন্নয়ন : উদাহরণস্বরূপ, আদিম যুগে জনগণ রান্না জানতো না। তারা পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবহার ও উৎপাদন পদ্ধতি জানতো না। শিক্ষার প্রসারতার ফলে তারা আগুন আবিষ্কার, মাংস পুড়িয়ে খাওয়া, ঘরবাড়ি তৈরি করা ইত্যাদি জানার ফলে বর্তমানে মানুষ কত রঙ-বেরঙের জিনিস ব্যবহার করছে। টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমানে পৃথিবীর সামাজিক ও বসবাসের পরিবেশের বহুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে মানুষ অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারে।

(২) চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পরিবেশ উন্নয়ন : অনুন্নত পরিবেশ ও অজ্ঞতার কারণে পূর্বে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতো। যেমন ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি। বর্তমানে শিক্ষার প্রসার ও পরিবেশ উন্নয়নে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব ও ভয়াবহতা কমে গেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধনের ফলে মৃতের হারও পূর্বের তুলনায় কমে গেছে। পূর্বে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার না থাকায় অশিক্ষিত জনগণের মাঝে কৃমি ও কলেরা রোগের উপদ্রব বেশি ছিল। বর্তমানে অধিকাংশ স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের ফলে এ ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেয়েছে।

(৩) স্বাস্থ্য রক্ষার জ্ঞান প্রয়োগে পরিবেশ উন্নয়ন : পূর্বে রান্না ও খাবার কাজে পুকুরের পানি, নদীর পানি, কূপের পানি ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে নলকূপ, গভীর নলকূপ ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সংগ্রহ করে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কাজ করা হচ্ছে। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে কাঁচা বাড়ি ছাড়া পাকা বাড়ি দেখা যেত না। বর্তমানে পাকা বাড়ি ব্যবহারের ফলে গ্রামাঞ্চল ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। পূর্বে লোকে ফল-

ফলাদি ছাড়া বৃক্ষ রোপণের তেমন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো না। বর্তমানে জনগণ শিক্ষার আলো পেয়ে বুঝতে পেরেছে যে, গাছপালা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। কারণ গাছ শুধু জ্বালানি কাঠ সরবরাহ করে না ও ছায়াই দেয় না। গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। এতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ কলুষমুক্ত হয় এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ফলে দেশে ও বিদেশে বনায়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

• বসবাস ও সামাজিক পরিবেশের উন্নয়নের উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। কারণ, একজন স্বাস্থ্যবতী মা এক বা একাধিক স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্ম দিতে পারেন। সে সন্তানই একদিন সুশিক্ষা লাভ করে হতে পারে প্রকৌশলী, ডাক্তার, কৃষিবিদ ইত্যাদি। আর এসব জনগণই দেশ উন্নয়নের ধারক ও বাহক হিসেবে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করে থাকে।

(৪) আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবনে পরিবেশের উন্নয়ন : পূর্বের চাষাবাদ পদ্ধতিতে অধিক জমিতে অল্প ফসল হতো এবং বর্তমানে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রয়োগ, উচ্চ ফলনশীল বীজ (high breed seed) প্রভৃতি ব্যবহারের ফলেই এ উন্নয়ন সম্ভবপর হয়েছে। তবে এগুলোর অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ক্ষতিও হয়।

(৫) শিল্প-কারখানা বিকাশে পরিবেশের উন্নয়ন : পূর্বে দেশে যে পরিমাণ শিল্প কারখানা ছিল, বর্তমানে সেই শিল্পের সংখ্যা সাফল্যজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে কর্মসংস্থান বেড়েছে কিন্তু জনসংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিস্থিতির উন্নতি ও অবনতি উভয়ই ঘটেছে। আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ ফ্রিজ, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ফ্ল্যাট বাড়ি প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাপন করছে। কিন্তু শিল্প কারখানার ক্ষতিকর গ্যাসে কিছু কিছু জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যহানির শিকার হচ্ছে।

দেশের বড় বড় শহরে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ করায় মানুষ স্বাস্থ্যকর ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বসবাসের সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু অনুন্নত জনগোষ্ঠী ও বস্তিবাসীর অপরিকল্পিত গৃহায়ণে পরিবেশের দূষণ ঘটছে।

(৬) শহরায়নে পরিবেশের উন্নয়ন : দেশে শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ ইত্যাদির বিপর্যয় ঘটলে পরিবেশের ক্ষতি হয়। আবার অপরিকল্পিতভাবে শহরের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাম থেকে শহরের দিকে লোকজন ধাবিত হয়। শহরে এসে থাকার গৃহ না পাওয়ায় যত্রতত্র বস্তি তৈরি করে তারা বসবাস করে। এরা যেখানে সেখানে পায়খানা প্রসাব করে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়।

মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন—অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা পূরণের লক্ষ্যে একটি দেশে উন্নয়ন আবশ্যক। আর এগুলো পূরণ করতে হলে জনগণের আর্থিক সংস্থান বা আয় রোজগারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরিবেশ ভালো রেখে এই আয়-রোজগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে কারণ, দেশে বেকার সমস্যা বেড়ে গেলে অসামাজিক কাজকর্মের মাত্রা বেড়ে যায়। এ কথা ভেবে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করা, কর্ম

সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, দেশ-উপযোগী কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করা, বেকারদের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে পরিবেশগত কার্যক্রম ও উন্নয়নের সংশ্লিষ্ট বিষয় (Environmental Activities in Bangladesh and Development Linkages) : বাংলাদেশের আবহাওয়া, জলবায়ু ও অন্যান্য পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ, সরেজমিনে তদারকি ও পরিবেশ উন্নয়নে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, এসব বিষয়ে কাজ করার জন্য দেশে নিম্নবর্ণিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন—

১। সরকারি সংস্থা (Government Sectors)

(ক) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (Ministry of Environment and Forest)

(খ) পরিবেশ বিভাগ (Department of Environment)

(গ) বন বিভাগ (Forest Department)

(ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয় (Ministry of Agriculture)

(ঙ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (Ministry of Water Resources)

(চ) মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় (Ministry of Fisheries and Live Stock)

(ছ) শিল্প মন্ত্রণালয় (Ministry of Industry)

(জ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (Ministry of Planning)

২। বেসরকারি সংস্থা (NGOS)

(ক) পরিবেশগত বেসরকারি সংস্থার যৌথকর্মী দল (Coalition of Environmental NGOS, CEN)

(খ) বাংলাদেশ উন্নয়ন সংস্থা পরিষদ (Association of Development Agencies in Bangladesh, ADAB)

(গ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন পরিষদ, প্রশিকা (Proshika), কারিতাস (Caritas), প্রভৃতি এনজিও।

৩। শিক্ষা সংস্থা (Education Sectors)

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় (University) (প্রকৌশল ও মেডিকেল, কৃষি)

(খ) টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট (Technical Institute)

(গ) কলেজ (Colleges)

(ঘ) মাধ্যমিক স্কুল (Secondary Schools)

(ঙ) প্রাথমিক স্কুল (Primary Schools)

(চ) অনির্ধারিত স্কুল (Non-formal Schools)

৪। **গবেষণা ইন্সটিটিউট** (Research Institute)

(ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা সংস্থা (Bangladesh Agriculture Research Council)

(খ) বন গবেষণা ইন্সটিটিউট (Forest Research Institute)

(গ) নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট (River Research Institute)

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)

(ঙ) বাংলাদেশ উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ ইন্সটিটিউট (Bangladesh Institute for Development Studies, BIDS)

(চ) বাংলাদেশ উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Bangladesh Centre for Advanced studies BCAS)

(ছ) মহাকাশ গবেষণা ও তথ্য সরবরাহ সংস্থা (SPARRSO)

৫। **মাধ্যম** (Media)

(ক) মুদ্রিত খবর (দৈনিক ও সাপ্তাহিক)

(খ) ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া (রেডিও, টেলিভিশন, ফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট) প্রভৃতি

সরকারি কার্যক্রম (Government Activities)

দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সরকারিভাবে যেসব কার্যক্রম গৃহীত হয়, তা নিম্নরূপ :

(১) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় স্থাপন (১৯৮৯),

(২) পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্র সংঘের (UN) আলোচনা সভায় যোগদান, ব্রাজিল (১৯৯২),

(৩) পরিবেশ নীতি (১৯৯৩),

(৪) আন্তর্জাতিক সম্মেলন স্বাক্ষর (জলবায়ু, জৈব সম্পদের বৈচিত্র্য, বনজপ্রাণী, জলজ সম্পদ, ইত্যাদি),

(৫) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫),

(৬) নির্ধারিত শিল্প কারখানার জন্য নির্দেশাবলি, পরিবেশের আধুনিকতা (EQS), ক্ষারকীয় ও রাসায়নিক পদার্থের জন্য নির্দেশাবলি (প্রস্তুতের অপেক্ষায়)।

উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি (Development Linkages)

আমাদের দেশকে উন্নত করতে হলে অনেকগুলো বিষয় লক্ষণীয় যা নিম্নরূপ :

১। **দরিদ্রতা সংশ্লিষ্ট বিষয়** (Poverty linkages) :

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (disasters) যেমন– সাইক্লোন (cyclones), বন্যা (floods), জলোচ্ছ্বাস, খরা (droughts), ক্ষয় (erosion) প্রভৃতি।

(খ) অবলুপ্তি (degradation) যেমন– বনভূমির উজাড় (deforestation), নদী সম্পদের হ্রাস (wetland loss), মাটির ক্ষয় (soil erosion)।

(গ) নগরায়ণ (urbanization) : যেমন– রোগের প্রাদুর্ভাব, পয়ঃপ্রণালি ও পানি সরবরাহ।

(ঘ) দূষণ (pollution) যেমন– পয়ঃপ্রণালি ও পানি সরবরাহ সমস্যা, কলেরা ও মহামারি রোগের প্রাদুর্ভাব।

২। উন্নয়ন বিষয়াবলি (development) : (ক) রাস্তাঘাট (roads) এবং নর্দমা পুঞ্জিভূত হওয়া (drainage congestion)।

(খ) চরপড়া (siltration)– এতে পানি সম্পদ এলাকা এবং মৎস্য সম্পদের ঘাটতি হয়।

(গ) নগরায়ণ (urbanization)– এতে কৃষিক্ষেত কমে যায়।

(ঘ) ইট প্রস্তুতকরণ (brick building)– এতে মাটির উপরিভাগ নষ্ট হওয়া কমে যায়।

(ঙ) পাহাড় কর্তন (hill cutting)– এতে উচ্চতার ভাগ কমে যায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

(চ) শিল্প কারখানা (industries)– এতে পরিবেশ দূষিত হয়।

(ছ) কৃষি উন্নয়ন বা তীব্রতর করা (agriculture intensification)—এতে কৃষিজ রাসায়নিক কীটনাশক দ্বারা পরিবেশ দূষণ, জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস এবং বনজ সম্পদ বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস হয়।

৩। সুদূরপ্রসারী বিষয় (Long term issues) : কোনো দেশে আশানুরূপ উন্নয়ন ঘটতে থাকলে অথবা উন্নয়নে বিলম্ব ঘটলেও তার জন্য সে দেশের উপর নিম্নবর্ণিত খারাপ প্রতিক্রিয়াগুলো স্থান পায়। যেমন—

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি (population increase)

(২) জলবায়ু পরিবর্তন (climate change)

(৩) নগরায়ণ (urbanization)

(৪) মরুকরণ বা খরা দ্বারা আক্রান্ত (desertification or drought)

(৫) ধ্রুব লবণাক্ততা (constant salinity)

(৬) আন্তঃজৈবিক পদ্ধতির সাথে এবং পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের বৃদ্ধি সাধন, জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমানো, ভূ-গর্ভস্থ পানি অধিক হারে ব্যবহার না করা ইত্যাদি ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করা সকলেরই কর্তব্য।

১.৬ জনসংখ্যার ধারা, আয় এবং দরিদ্রতা (Population Trends, Income and Poverty)

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভূ-খণ্ড পূর্বে যেমন ছিল, এখনও প্রায় সেভাবেই আছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে, পূর্বে যে পরিবারের মাথাপিছু জমি ছিল ৫০ বিঘা,

বর্তমানে সেই পরিবারের মাথাপিছু জমি দাঁড়িয়েছে ৫ কাঠা। আবার কোনো কোনো পরিবার ভূমিহীন অবস্থায় বস্তিতে জীবনযাপন করছে। জনসংখ্যা তত্ত্ববিদ মালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে এবং খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে। সেজন্য জনসংখ্যার সীমাবদ্ধতা একান্তই আবশ্যক।

পৃথিবীতে জনসংখ্যা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে উন্নত বিশ্বে এই বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম এবং গরীব দেশগুলোতে বেশি। বিশ্বের জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিশ্বের জনসংখ্যা ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ছিল মাত্র ৫০ কোটি বা অর্ধ বিলিয়নের মতো, ১৮০০ সালের দিকে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো প্রায় ১০০ কোটি বা ১ বিলিয়নের মতো। অতএব ৮০০ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বের জনসংখ্যা আবার হয়ে যায় প্রায় ২০০ কোটি বা ২ বিলিয়ন। অর্থাৎ ১৩০ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। আবার ১৯৮০ সালের দিকে জনসংখ্যা হয়ে যায় ৪০০ কোটি বা ৪ বিলিয়ন অর্থাৎ মাত্র ৫০ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা তৃতীয় বারের মতো দ্বিগুণ হয়। বর্তমানে ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে এই জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০০ কোটি বা ৬ বিলিয়ন। এ সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন বা ১৩ কোটি। পূর্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ০.৫% থেকে ১% এবং বর্তমানে এই বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১.৯৩%। নিম্নবর্ণিত তিনটি সারণি থেকে বিভিন্ন দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উপলব্ধি করা যায়।

বর্তমানে আমাদের দেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৮৮০ জন লোক বসবাস করে এবং জনসংখ্যা এ হারে বৃদ্ধি পেলে আগামী ৩৩ বছরে এ দেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২৬০ মিলিয়ন বা ২৬ কোটিতে। আমাদের দেশে পৌর এলাকার তুলনায় গ্রামাঞ্চলে জন্মহার অধিক পরিলক্ষিত হয় যা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ১ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও বৃদ্ধির হার (গ্রামাঞ্চল ও পৌর এলাকা)।

	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)			বার্ষিক জন্ম বৃদ্ধির হার (%)	
এলাকা	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৬১–৭৪	১৯৭৪–৮১
গ্রামাঞ্চল	৫০.৭৩	৭০.১৩	৭৬.৬১	২.৪২	২.০৯
পৌর এলাকা	২.৬৪	৬.২৭	১৩.২৩	৪.৭২	৩.৯২
মোট	৫৩.৩৭	৭৬.৪০	৮৯.৮৪	৭.১৪	৬.০১

উৎস : বি.বি.এস বাংলাদেশ জনসংখ্যা গণনা ১৯৮১।

সারণি ২ : বিশ্ব ও বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তারতম্য।

সাল	বাংলাদেশ (%)	বিশ্ব (%)
১৯০০–১৯২০	--	০.৬৫
১৯২০–১৯৩০	--	
১৯৩০–১৯৪০	--	

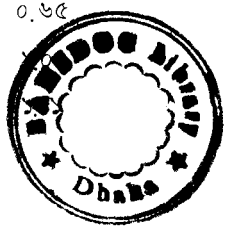

১৯৪০–১৯৫০	--	১.১০
১৯৫০–১৯৬০	--	১.৮৩
১৯৬০–১৯৭০	২.২৬	--
১৯৭০–১৯৮০	২.৪৮	--
১৯৮০–১৯৯০	২.১৭	--

উৎস : বাংলাদেশ আদমশুমারি, ১৯৯১ এবং জাতিসংঘের ডেমোগ্রাফিক ইয়ার বুক, ১৯৬২।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২.১৭%। ২০১০ সালে এ দেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৬১ মিলিয়ন বা ১৬.১ কোটি। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২% এর নিচে নামে তাহলে ২০১০ সালে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৫৪ মিলিয়ন বা ১৫.৪ কোটি। এই বৃদ্ধির হার ১.৭%–এ নামিয়ে আনতে পারলে ২০১০ সালে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৪৬ মিলিয়ন বা ১৪.৬ কোটি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৯০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি (মিলিয়ন) তিনটি তথ্যের সমন্বয়ে দেখানো হয়েছে :

সারণি ৩ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে বাংলাদেশে জনসংখ্যার তিনটি তথ্য।

(বছর সাল)	তথ্য–১	তথ্য–২	তথ্য–৩
১৯৯০	১১৪.২	১১৪.২	১১৪.২
১৯৯৫	১২৭.০	১২৬.৩	১২৪.০
২০০০	১৪০.০	১৩৭.৩	১৩৩.০
২০১০	১৬১.২	১৫৪.৫	১৪০.০

বাংলাদেশ যেহেতু অধিক জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত এবং একটি কৃষিপ্রধান দেশ, তাই এ দেশে কৃষি সম্পদ, গবাদি পশু পালন ও হাঁস–মুরগির খামার করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে ও দরিদ্রতা দূর করতে হবে।

পূর্বে জনসংখ্যা কম ছিল বিধায় বছরে একটি ফসল করার পর জমি ফেলে রাখা হতো। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমিতে ২ বা ৩টি ফসল করার পরেও দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ সঙ্কটজনক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে আমাদের দেশে শিল্প কারখানাতো বাড়ছেই না, বরং পূর্বে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু ছিল, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অদূরদর্শিতা, দুর্নীতি, হরতাল ও অসামাজিক কার্যকলাপের কারণে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণে দিন দিন চুরি, ডাকাতি এবং অন্যায়ভাবে জনগণের অর্থ লুণ্ঠিত হচ্ছে। আয় কমে গেলে দরিদ্রতা ও পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। দেশে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ লোক বেকার থাকার ক্লারণে ৫০ লক্ষ পরিবার দারিদ্র্য সীমার নিচে জীবনযাপন করছে। দেশের অনেকেই দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। এজন্য লক্ষ লক্ষ মা ও শিশু পুষ্টিহীনতার শিকার হচ্ছে। প্রতিবছর অপুষ্টির কারণে এবং বিনা চিকিৎসায় হাজার হাজার মা ও শিশু মারা যাচ্ছে। শুধু

দরিদ্রতার কারণে নয়, কিছু কিছু পরিবারের লোক অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে অপুষ্টির শিকার হচ্ছে এবং অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে।

সুতরাং দেশে উন্নত পরিবেশ থাকলে সেখানে কাজের সংস্থানও থাকে। ফলে দেশের জনগণ স্বাচ্ছন্দ্যে আয় করে জীবনযাপনের মান বাড়াতে এবং সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে।

বাংলাদেশে বেকার সমস্যা ও দরিদ্রতা দূরীকরণে গবাদি পশুপালন ও হাঁস-মুরগি উন্নয়নের পদক্ষেপ : আমরা জানি যে, বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। মূলত এর অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ গবাদি পশু রয়েছে। ৫ লক্ষ মহিষ, ১ কোটি ৫ লক্ষ ভেড়া ও ৯ কোটি হাঁস-মুরগি আছে। জাতীয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে এসব পশুপাখির অবদান অপরিসীম। যেমন—

১। প্রধান অবদান হিসেবে হাল চাষ ও গাড়ি টানার কাজটি গবাদি পশু সম্পন্ন করে। এদেশে এখনও প্রায় ৯৮ ভাগ জমি পশু শক্তি দিয়ে চাষাবাদ করা হয়।

২। এই পশু বছরে ২ লক্ষ ৯০ হাজার টন মাংস ও ১০ লক্ষ টন দুধ যোগান দেয়।

৩। বছরে ২ লক্ষ টনের সমপরিমাণ রাসায়নিক সার গবাদি পশুর গোবর থেকে পেয়ে থাকি, যা দিয়ে অতিরিক্ত ৬ লক্ষ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে।

৪। এ ছাড়া ৬৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন শুষ্ক গোবর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে এদেশ বছরে ১৫ লক্ষ টন জ্বালানি তেলের আমদানি করা থেকে রেহাই পাচ্ছে।

৫। মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পশুপালনে জড়িত থেকে কর্মসংস্থানে আছে।

৬। মোট জিডিপির শতকরা সাড়ে ৬ ভাগ আয় এই পশুপাখি সম্পদ থেকে আসে।

৭। চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ১৪ ভাগ আয় হচ্ছে।

৮। পশুপাখি প্রতিপালনে গ্রামীণ জনশক্তির কর্মসংস্থান হচ্ছে।

আমরা সবাই জানি আমাদের দেশীয় গবাদি পশুর দুধ, মাংস উৎপাদন ও কাজের ক্ষমতা খুবই কম ; বংশগত চরিত্র, অপুষ্টি এর কারণ। এশিয়ায় গাভী প্রতি গড় দুধ উৎপাদন ৭০০ লিটার, ইউরোপে ৩৩৫৮, নরওয়ে, সুইডেন ও যুক্তরাষ্ট্রে ৫০০০ লিটারের উপরে। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে ২০০–৩০০ লিটার।

সরকারি পর্যায়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমস্যা তথা জাতীয় সমস্যা দূরীভূত করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) পুষ্টি নিবারণে, (১) এ.ডি.বি প্রকল্প কর্মসূচি, (২) বিনামূল্যে ঘাসের কাটিং সরবরাহ।

(খ) স্বাস্থ্য রক্ষার্থে, (১) ওষুধের বাজেট বাড়ানো, (২) টিকা উৎপাদন বাড়ানো ও টিকা প্রয়োগ কর্মসূচি জোরদার, (৩) ক্রিমিজনিত অসুখের ওষুধ প্রয়োগ।

(গ) জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে : (১) কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ, (২) উন্নত জাতের ষাঁড় বিতরণ, (৩) গাভী বিতরণ।

(ঘ) পুঁজি সরবরাহ : (১) এন. জি. ও, (২) কৃষি ব্যাংক, (৩) স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য সরকারের সাথে আলোচনা ও ব্যবস্থা।

(ঙ) **অন্যান্য :** (১) উদ্বুদ্ধ করা, (২) প্রশিক্ষণ।

সবদিক চিন্তা করে দুস্থ ভূমিহীন বা কৃষকদের পশুপাখি প্রতিপালনের মাধ্যমে মোটামুটি জীবিকা অর্জনের একটি পথ খুঁজে নেয়ার অবকাশ আছে। পশুপালন অধিদপ্তরের আওতায় মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন গ্রামে মুরগি পালনের মাধ্যমে দুস্থ ভূমিহীন মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করে বেশ কয়েক বছর এ বিষয়ে আমরা ভালো ফল লাভ করেছি। প্রকল্প এলাকার ১০০–২০০ ভালো জাতের ডিমের মুরগি পালন করে কিংবা ১০০–২০০টি এক দিনের বাচ্চা লালন পালন করে যে আয় হয় তাতে পরিবার পরিজন নিয়ে মোটামুটি ভালোভাবে জীবিকা অর্জন সম্ভব। এই কর্মসূচিতে পশু সম্পদ অধিদপ্তর থেকে উৎসাহী মুরগি পালনকারী, মুরগি পালনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, মুরগির বাচ্চা বা বড় মুরগি সরবরাহ, প্রয়োজনে মুরগির খাদ্য সরবরাহ, প্রতিষেধক টিকা সরবরাহ করা হচ্ছে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এন.জি.ও) থেকে স্বল্প পুঁজির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নিজেদের আয়ের উপর যারা এই ধরনের খামার করছে তাদেরকে ঋণের বোঝা ও সুদের ঝামেলা পোহাতে হয় না।

এছাড়া দুস্থ মহিলাদের প্রতিষেধক টিকা দেয়ার কলাকৌশল প্রশিক্ষণ দিয়ে পশু সম্পদ অধিদপ্তর বিনামূল্যে প্রতিষেধক টিকা সরবরাহ করে আসছে এবং টিকা দেয়ার দরুন মোরগ–মুরগির মৃত্যুর হার যথেষ্ট পরিমাণ কমে গেছে। সুতরাং অভিজ্ঞতার আলোকে এখন বলা যায় দুস্থ, ভূমিহীন কৃষকদের আয়ের উৎস হিসেবে মুরগি পালন বিশেষ সহায়ক।

সুতরাং শহর ও গ্রামের বেকার যুবক, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গবাদি পশুপালন ও হাঁস–মুরগির খামার করে নিজেরা উন্নতি করতে পারে। বেকার সমস্যা এবং দরিদ্রতা দূর করে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেয়া যায়।

আশার খবর এই যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার লোকজন গবাদি পশুপালন ও হাঁস মুরগির খামার করার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, তাদের ৬৯% এর মধ্যে ২২% নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জীবন যাপন করছে। ৫ জন লোকের পরিবারে ৫টি গরু পালন করা হলে তাদের সম্মিলিত পায়খানা ও গোবর দ্বারা যে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট (bio-gas plant) তৈরি করা হয়, তার গ্যাস দ্বারা সেই পরিবারের জ্বালানি খরচ, বাতির খরচ এবং ৫ একর জমির সারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। সুতরাং দরিদ্রতা দূরীকরণের জন্য এ পদক্ষেপ বেশি কার্যকর।

বাংলাদেশে দরিদ্রতার কারণ ও মোচনের উপায় (Causes of Poverty in Bangladesh and Ways of Remedy) : 'দরিদ্রতা'-বলতে মানুষের স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করার জ্ঞানের অভাব বা অক্ষমতাকে বুঝায়। নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার অধিকার রয়েছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে ৮০ ভাগ জনগণ দারিদ্র্য সীমায় বসবাস করছে এবং এদের মধ্যে প্রায় ৫০ ভাগ রয়েছে দারিদ্র্য সীমার নিচে। একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের জন্য প্রতিদিন খাদ্যের মাধ্যমে কমপক্ষে ২১২১ ক্যালরি এবং ৫৮ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করা আবশ্যক কিন্তু এদেশের ৮০%

থেকে ৯০% লোক এই হারে খাদ্য গ্রহণের সামর্থ্য রাখে না। ফলে তারা নানা ধরনের রোগ ও অপুষ্টির শিকার হয়।

বাংলাদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক অর্থ আয় করে থাকে এবং তা দরিদ্রতা মোচনে সহায়ক হয়। কিন্তু, বর্তমানে জনশক্তি রফতানি গভীর সঙ্কটে। বর্তমানে মালয়েশিয়া, কুয়েত, কাতার ও দক্ষিণ কোরিয়ায় নিয়োগ বন্ধ (২০০২ সালের পত্রিকায় প্রকাশিত খবর মোতাবেক)।

বছরওয়ারি জনশক্তি রফতানি (জন হিসেবে) নিম্নরূপ :

বছর	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২
রফতানি	২, ৬২, ১৮২	২২২, ৬৮৬	১,৮৮,৯৬৫	৪০,০০০ (তিন মাসে)

দেশে জনগণের কর্মসংস্থানের অভাবজনিত কারণেই তারা জীবনযাত্রার মান বজায় রেখে চলতে পারছে না। তাই নারী সমাজের অনেকেই পুরুষের পাশাপাশি শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জন করছে সংসারের স্বচ্ছলতার জন্য। দেশের জনগণের দরিদ্রতা দূর করার জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) জনগণের অর্থোপার্জনের পথ সুগম করা প্রয়োজন।

(২) সঠিক অর্থনীতির আওতায় গ্রামাঞ্চলে জনগণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

(৩) কাজ করে যাতে জনগণ স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে শ্রমিক ও কর্মচারির বেতন নির্ধারণ করা আবশ্যক।

(৪) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোতে চাকরিগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা মোতাবেক বেকার জনগণের চাকুরি প্রাপ্তির সুবিধার্থে পদ সৃষ্টি করা আবশ্যক।

(৫) শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

(৬) কৃষিক্ষেতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের স্বচ্ছলতার সুবিধার্থে তাদেরকে সময়মত উন্নত জাতের শস্য বীজ, সার ও কীটনাশক দ্রব্য ন্যায্যমূল্যের ভিত্তিতে সরবরাহ করা আবশ্যক।

ভবিষ্যতে দরিদ্রতা দূরীকরণের কার্যকর পদক্ষেপ (Future poverty alleviation action programme)

দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে দরিদ্রতা দূরীকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যকর পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন :

(১) অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান দান করা।

(২) দরিদ্র জনগণের জন্য চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(৩) ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে কৃষি কাজ করার জন্য জমি দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৪) সব ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণগ্রহণের সুযোগ দান এবং কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

(৫) ছোট ছোট কৃষকদের ঋণের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

(৬) কৃষক ও বেকার যুবকদের বাড়ির আঙ্গিনায় গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, মাছ প্রভৃতির খামার তৈরির সহযোগিতা প্রদান।

(৭) খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচিতে (Food for Work, FFW) রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পে (road maintenance project or RMP) গ্রামীণ বেকার জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা।

(৮) মহিলারা যাতে ঘরসংসারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প ও হালকা ধরনের কাজ পায় তার জন্য ফলপ্রসূ ব্যবস্থা করা।

(৯) অপ্রাপ্তবয়স্কদের স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা এবং তাদের অভিভাবকদের সম্যক আয় সংস্থানের ব্যবস্থা করা।

তাহলে এই দেশ থেকে দরিদ্রতা আস্তে আস্তে দূরীভূত হবে এবং বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে।

১.৭ আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থা, কাঠামো ও কার্যাবলি (Ecosystem, Structure and Function)

"ইকোসিস্টেম" একটি ইংরেজি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ প্রাণীর সাথে অন্যান্য প্রাণী ও উপাদনের পারস্পরিক ক্রিয়া। একে অন্য কথায় প্রতিবেশ বা আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থা বলে। বৃটিশ প্রতিবেশ বিজ্ঞানী চার্লস ফেলটন (Charls Felton) ১৯২৭ সালে প্রতিবেশ কে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ইতিহাসের সাথে বায়ুমণ্ডলের সম্পৃক্ততা বিবেচনা করেছেন।

প্রাকৃতিক পরিবেশের বায়ুমণ্ডলে (atmosphere) প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন, পানি এবং অফুরন্ত জীবকোষের সমাহার রয়েছে। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদি জীবকোষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। পৃথিবীর উপরিভাগে যে বায়ুস্তর রয়েছে, তাকে বলা হয় বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও পানি থাকে বলেই জীব বেঁচে থাকতে পারে। সেজন্য বায়ুমণ্ডলকে অন্য কথায় জীবমণ্ডল (bio-sphere) বলে। জীবমণ্ডলে রয়েছে, জীবকোষ, পানি, বায়ু ও খনিজ পদার্থ। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য গাছপালা (plants), জীবজন্তু (animal) এবং অন্যান্য জীবকোষের (organism) পারস্পরিক যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয়তাকে আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থা (eco-system) বলে। যেমন– একটি পুকুরের পানিতে মাছ, শেওলা, শাপলা, ব্যাঙ, পানির পোকা প্রভৃতি একত্রে বাস করে। মাছগুলো শ্যাওলা খেয়ে বাঁচে। আবার বড় মাছগুলো ছোট মাছ এবং শ্যাওলা খেয়ে বাঁচে। সুযোগ পেলে তারা ব্যাঙ ধরেও খায়। কথায় বলে মাছে ভাতে বাঙালি। মানুষ, নদী এবং মাছ, সবই প্রকৃতি প্রদত্ত

উপাদান। পৃথিবীতে কিছু কিছু গাছ আছে, যাকে রাক্ষুসে গাছ বলে। এই গাছ মানুষ ও জীবজন্তু ধরে খায়। এ ধরনের গাছ আফ্রিকার জঙ্গলে পাওয়া যায়। সুতরাং জীবজন্তু একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে বলে একে প্রতিবেশ ভারসাম্য (ecological balance) বলে। নদী এবং পুকুরের পাড়ে কলা গাছ, নারকেল গাছ খুব ভালো জন্মে। কারণ, এই গাছ জলাশয়ের পানি শোষণ করে জীবন ধারণ করে। মাটির রস থেকে পানি নেয়ার চেয়ে পুকুর অথবা নদী থেকে শিকড়ের সাহায্যে পানি চুষে নেয়া সহজ। যে কারণে, ফসলে পানি সেচ করলে ফসলের গাছগুলো সজীব হয় এবং তা থেকে ভালো ফসল পাওয়া যায়। ১.৩ চিত্রে আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থায় একটি পুকুরের পানিতে শৈবাল, ছোট মাছ, বড় মাছ প্রভৃতি একে অপরের উপর নির্ভর করে কিভাবে বেঁচে থাকে তার নমুনা দেখানো হয়েছে।

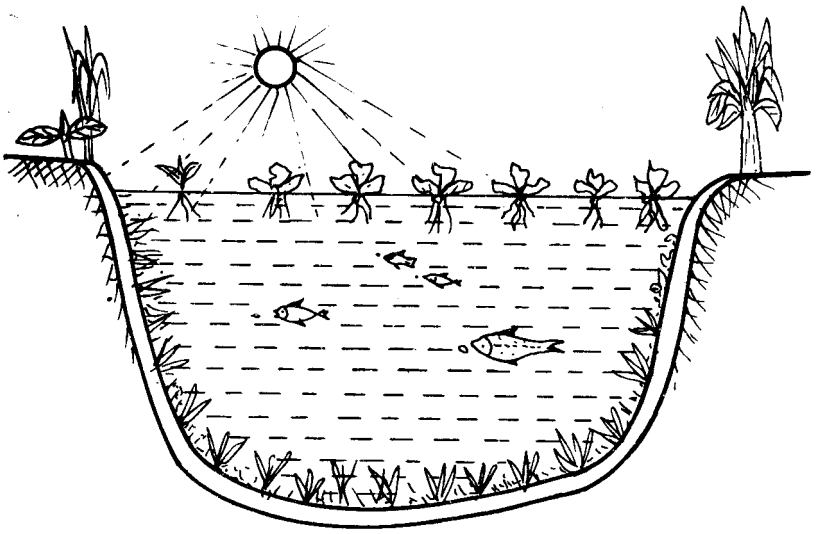

চিত্র ১.৩ : আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থায় একটি পুকুরের পানি ও মাটিতে রক্ষিত বিভিন্ন জৈব উপাদানের জীবন ধারণের নমুনা প্রদর্শন।

১.৮ আন্তঃজৈবিক কাঠামো (Ecosystem Structure)

জীবকোষের উপাদান হলো মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু ও ক্ষুদ্র জীব। আন্তঃজৈবিক কাঠামো বলতে জীবকোষ ও পরিবেশগত দিককে বুঝায়। সব জীবকোষ (organism) বা জীব, গাছপালা, জীবজন্তু ও ক্ষুদ্র জীবকোষ ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশকে আন্তঃজৈবিক কাঠামো বলে। আন্তঃজৈবিক কাঠামোতে বিভিন্ন উপাদান ধারণ করার জন্য অজৈবিক উপাদানেরও প্রয়োজন পড়ে।

সুতরাং আন্তঃজৈবিক কাঠামোর উপাদান দুই প্রকার। যথা :

(১) জৈবিক উপাদান (Biotic Component) এবং

(২) অজৈবিক উপাদান (Abiotic component)

(১) জৈবিক উপাদান (Biotic Components) : জীবজন্তু, গাছপালা, জীবকোষ প্রভৃতি হলো জৈবিক উপাদানের আওতাভুক্ত। এগুলোর একটি জীবন মরণের চক্র আছে, যার মাধ্যমে তারা প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বাতাস, পানি ও খাদ্য গ্রহণ করে। জীবজন্তুর মলমূত্র থেকে যে সার হয় তা গাছ গ্রহণ করে। গাছ যে অক্সিজেন ছাড়ে, তা প্রাণীকূল গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে। জৈবিক উপাদান দুই প্রকার, যেমন :

(ক) উৎপাদক (Producers) এবং

(খ) ভোক্তা (Consumers)

(ক) উৎপাদক : বিশ্বের বৃক্ষরাজি হলো উৎপাদক। কারণ, এরা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাবার মাটি, বাতাস ও পানির মাধ্যমে নিজেরাই তৈরি করতে পারে। গাছপালা অজৈব যৌগ থেকে তাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় জৈব উপাদান তৈরি করে নেয়। সে কারণে, আলো ও বাতাসশূন্য আবদ্ধ ঘরে, পানি শূন্য এলাকা প্রভৃতি পরিবেশে গাছ বাঁচতে পারে না।

(খ) ভোক্তা : যে জীব বা জীবকোষ নিজে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না এবং ঘাস, অন্য প্রাণী প্রভৃতি খেয়ে জীবন ধারণ করে তাকে ভোক্তা বলে। উদাহরণস্বরূপ, ছাগল ঘাস খেয়ে বাঁচে এবং মানুষ ছাগলের মাংস খেয়ে বাঁচে। তাহলে, এক্ষেত্রে ছাগল হচ্ছে প্রাথমিক ভোক্তা এবং মানুষ হলো দ্বিতীয় ভোক্তা। আবার কোনো কোনো প্রাণী ঘাস, লতাপাতা ও মাংস উভয় উপাদান খেয়েও জীবন ধারণ করে।

সুতরাং ভোক্তা প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

(১) উদ্ভিদভোজী,

(২) মাংসাশী এবং

(৩) উদ্ভিদভোজী ও মাংসাশী।

(১) উদ্ভিদভোজী : যেসব প্রাণী গাছের লতাপাতা, ঘাস প্রভৃতি খেয়ে জীবনধারণ করে, তাদেরকে উদ্ভিদভোজী বলে। যেমন : গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি।

(২) মাংসাশী : যেসব প্রাণী অন্য পশুর মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করে, তাদেরকে মাংসাশী বলে। যেমন : কুকুর, বাঘ, ভালুক, সিংহ প্রভৃতি।

(৩) উদ্ভিদভোজী ও মাংসাশী : যেসব প্রাণী ঘাস, লতাপাতা, শাকসবজি, মাছ, মাংস প্রভৃতি খেয়ে জীবন ধারণ করে, তাদেরকে উদ্ভিদভোজী ও মাংসাশী বলে। যেমন : শূকর, মানুষ ইত্যাদি।

১.৪ চিত্রে আন্তঃজৈবিক কাঠামোতে সূর্যের আলো থেকে গাছপালার জীবন ধারণ ও বায়ুমণ্ডলের ভূমিকা দেখানো হলো।

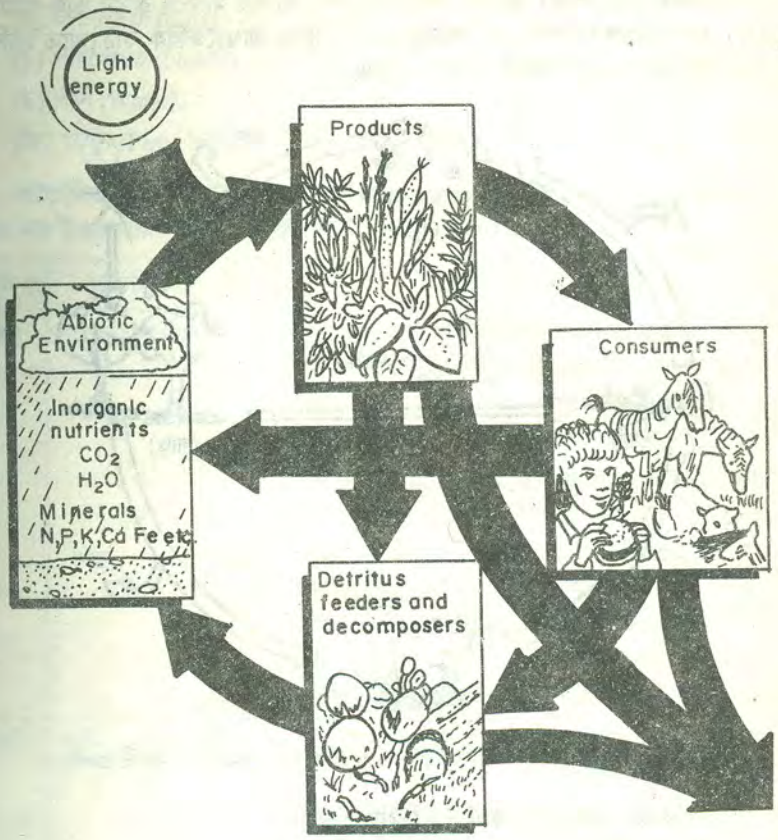

চিত্র ১.৪ : আন্তঃজৈবিক কাঠামোতে সূর্যের আলো থেকে গাছপালা ধারণ ও বায়ুমণ্ডলের ভূমিকা প্রদর্শন।

আমরা জানি, সূর্য সকল শক্তির উৎস। এ শক্তির দ্বারাই বায়ুমণ্ডলের জীবজন্তু ও প্রাণীকুল বেঁচে আছে এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বায়ুমণ্ডল সংরক্ষিত আছে। আন্তঃজৈবিক কাঠামোর কোনো উপাদানের ত্রুটি ঘটলে সমগ্র বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে প্রকটভাবে।

জৈবিক উপাদানের কাজ (Function of Biotic Components) : গাছপালা, ঘাস, লতাপাতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বাতাস, পানি ও খাদ্য গ্রহণ করে। আবার, জীবজন্তু গাছপালার পাতা, ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে জীবনধারণ করে। জীবজন্তুর মলমূত্র থেকে সার তৈরি হয়। আবার জীবজন্তুর মলমূত্র খেয়ে মাছ জীবনধারণ করে। গাছপালা, সার ও জীবজন্তুর মলমূত্র গ্রহণ করে। গাছপালা অক্সিজেন (O_2) ত্যাগ করে, মানুষ ও পশুপাখি

সেই অক্সিজেন গ্রহণ করে। আবার প্রাণীকুল শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ত্যাগ করলে গাছপালা তা গ্রহণ করে। ১.৫ চিত্রে আন্তঃজৈবিক কাঠামোতে জৈবিক ও অজৈবিক উপাদানের কার্যাবলি দেখানো হয়েছে।

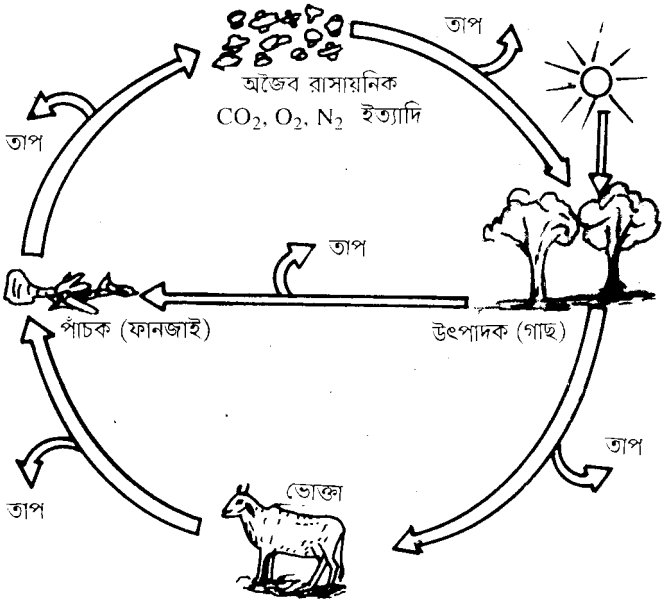

চিত্র ১.৫ : আন্তঃজৈবিক কাঠামোতে জৈবিক ও অজৈবিক উপাদানের কার্যাবলি প্রদর্শন।

সুতরাং জৈবিক উপাদানের কার্যাবলি নিম্নরূপ। যেমন :

(১) ভোগ করা,

(২) সার প্রস্তুত করা এবং

(৩) পাচকে পরিণত করা। জৈবিক উপাদান এই কার্য সম্পাদনে অজৈবিক উপাদান যেমন—সূর্যের তাপ, বাতাস, পানি প্রভৃতির সহায়তা গ্রহণ করে।

(২) অজৈবিক উপাদান (Abiotic Components) : আন্তঃজৈবিক কাঠামোর যেসব উপাদান বায়ুমণ্ডলীয় সব জীবজন্তু ও প্রাণীকুলকে ধারণ করে বাঁচিয়ে রাখে সেগুলোকে অজৈবিক উপাদান বলে। এই উপাদান আবার ৮ (আট) প্রকার। যথা :

(ক) জলবায়ু (Climate) ও আবহাওয়া (Weather),

(খ) মাটি (Soil),

(গ) ভূমিরূপ (Topography),

(ঘ) আপেক্ষিক অম্লত্ব (Relative Acidity or pH),

(ঙ) লবণাক্ততা (Salinity),
(চ) পরিশোষক (Nutrients),
(ছ) পানি (Water),
(জ) আগুন (Fire) প্রভৃতি।

অজৈবিক উপাদানের কার্যাবলি (Function of Abiotic Components) : অজৈবিক উপাদানের কার্যাবলি নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	অজৈবিক উপাদান	অজৈবিক উপাদানের কাজ
(ক)	জলবায়ু ও আবহাওয়া	(ক) সারা বছরব্যাপী কোনো এলাকার বৃষ্টিপাত ও গড় তাপমাত্রাকে জলবায়ু বলে। পৃথিবীর জলবায়ু সব স্থানে এক রকম হয় না। সেজন্য জলবায়ুর বিভিন্নতায় বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু বেঁচে থাকছে। (খ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জলবায়ুকে আবহাওয়া বলে। বিভিন্ন ঋতুতে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। যেমন : মেরু অঞ্চলে ঠাণ্ডা এবং বিষুবীয় অঞ্চলে উষ্ণ। সে কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাণীকুলের জন্য বসবাস ও অভ্যাস অনুযায়ী জলবায়ু ও আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়, অন্যথায় এদের বাঁচানো কষ্টকর হয়।
(খ)	মাটি (Soil)	আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থায় জৈবিক উপাদানগুলো মাটির রস, উর্বরা শক্তি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। মাটি প্রধানত তিন প্রকার। যথা : (ক) বেলে মাটি (Sandy Soil), (খ) দোআঁশ বা পলি মাটি (Alluvial Soil) এবং (গ) এঁটেল মাটি (Hard Soil)। রাসায়নিক ও জৈব সার দ্বারা মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ানো হয়। পাথরযুক্ত এবং শুষ্ক মাটিতে গাছপালা এবং ফসল ভালো হয় না।
(গ)	ভূমিরূপ (Topography)	ভূমির আকৃতি অনুযায়ী ভূমি সাধারণত তিন প্রকার। যথা : (ক) সমতল ভূমি (Plain land), (খ) অসমতল বা টিলাযুক্ত ভূমি (Non-plain land) এবং (গ) পাহাড়ি ভূমি (Hilly land)।

		সমতল ভূমি অধিক উর্বর ও এতে ফসল ভালো হয়। অসমতল ও পাহাড়ি ভূমিতে পানি আটকাতে পারে না বলে এতে অনেক সময় শুষ্কতা বিরাজ করে। পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষায় এই তিন ধরনের ভূমি থাকা প্রয়োজন।
(ঘ)	আপেক্ষিক অম্লত্ব (Relative acidity)	এসিড (Acid) অর্থ অম্ল। এটির গুণাগুণকে অম্লত্ব বলে। মাটিতে অম্লত্ব বেড়ে গেলে আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোটরযান, শিল্প-কারখানা, ইটের ভাটা প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন কালো ধোঁয়ায় প্রচুর সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_2) থাকে। এগুলো বায়ুমণ্ডলের জলীয় কণার সাথে মিশে অম্ল বৃষ্টিপাত (Acid-rain) ঘটায়। এই পানি গাছপালা, ফসল, জলাশয় প্রভৃতিতে অম্লত্বের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে এগুলো নষ্ট করে ফেলে। অম্ল স্বাভাবিক থাকা আবশ্যক, এর মাত্রা বেড়ে গেলে প্রাণী ও গাছপালার ক্ষতি হয়।
(ঙ)	লবণাক্ততা (Salinity)	মিঠা পানিতে লবণাক্ততা স্বাভাবিক এবং সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেশি থাকে। সেজন্য সমুদ্রের পানি মিঠা পানি এলাকায় মিশে গেলে ভূমি, ফসল, মাছ প্রভৃতিতে লবণাক্ততার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং ফসল নষ্ট করে। মাটিতে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়ে গেলে সেখানে সাধারণ গাছপালা ও ফসল হয় না।
(চ)	পরিশোষক (Nutrients)	অক্সিজেন (O_2) এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) যথাক্রমে মানুষ ও গাছপালার জন্য পরিশোষক হিসেবে কাজ করে। যেমন : মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে এবং গাছপালা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ত্যাগ করে। আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থায় এটি একটি বিশেষ প্রাকৃতিক কার্যক্রম।
(ছ)	পানি (Water)	পানির অপর নাম জীবন। এটি আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম উপাদান। যেখানে পানি ও বাতাসের অস্তিত্ব থাকে না, সেখানে গাছপালা ও প্রাণীকুল বাঁচতে পারে না। পানির অভাবে খরা ও মরুময়তার প্রাদুর্ভাব ঘটে। আবার, অধিক বৃষ্টিপাত, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, যা প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করে।

(জ)	আগুন (Fire)	আগুন আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থার একটি উপাদান। মেরু অঞ্চলে আগুন বা অগ্নিতাপ নেই বলে সেখানে বরফাচ্ছন্ন হয়ে আছে। পুরাকালে আগুন ছিল না বলে মানুষ ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়েছে এবং কাঁচা মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করেছে। সভ্য সমাজে আগুন একটি অন্যতম উপাদান। রান্নাবান্না, উত্তপ্ত করা, পোড়ানো প্রভৃতি কাজে আগুনের বিকল্প নেই। কিন্তু দাবানলের আগুন বনরাজি ও পরিবেশের ক্ষতি করে। তাই, এটিকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ব্যবহার করতে হয়।

১.৯ পরিবেশ সংশ্লিষ্ট শব্দ ও সংজ্ঞা (Environmental terms and definitions)

পরিবেশ সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

(১) আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থা (Ecosystem) : বিশ্বের প্রাণীজ ও অপ্রাণীজ উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়াকে আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থা বলে। একে অন্যকথায় প্রতিবেশ বা আন্তঃজৈবিক প্রক্রিয়া বলে। বৃটিশ প্রতিবেশ বিজ্ঞানী চার্লস ফেল্টন (Charles Felton) ১৯২৭ সালে প্রতিবেশকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত বিবেচনা করেছেন।

আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থায় জীবমণ্ডলে রয়েছে জীবকোষ, পানি, বায়ু ও খনিজ পদার্থ। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য গাছপালা (plants), জীবজন্তু (animals) এবং অন্যান্য জীবকোষের (organism) পারস্পরিক যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয়তাকে আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থা বলে। পরিবেশের জীবজন্তু একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং ভারসাম্য রক্ষার সহায়ক বলে বিবেচিত হয়।

(২) আন্তঃজৈবিক কাঠামো (Ecosystem structure) : প্রত্যেক জীবের শরীরেই জীবকোষ রয়েছে। জীবকোষের সদস্য হলো মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু ও ব্যাকটেরিয়া (bacteria)। এসব জীবকোষের সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশকে আন্তঃজৈবিক কাঠামো বলে। জৈবিক কাঠামোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কতকগুলি অজৈবিক উপাদানের প্রয়োজন হয়। সেগুলো হচ্ছে বাতাস, পানি, মাটি, সূর্যরশ্মি, আগুন প্রভৃতি। সুতরাং জৈবিক এবং অজৈবিক উপাদানের সমন্বয়ে আন্তঃজৈবিক কাঠামো গঠিত হয়।

(৩) ধরিত্রী সম্মেলন (Earth Summit) : বিশ্বের পরিবেশ কলুষমুক্ত রাখার জন্য ১৭২টি দেশ প্রতিবছর একটি স্থানে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের যে পদক্ষেপ গৃহীত হয় তাকে ধরিত্রী সম্মেলন বলে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রাজধানী রিওডি জেনিরোতে প্রথম 'ধরিত্রী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সম্মেলনে বিশ্বের ১৭২টি দেশের প্রতিনিধি মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবেশ রক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। বিশ্বের পরিবেশ বিঘ্নিত হলে বছরে একাধিকবারও ধরিত্রী সম্মেলন হতে পারে। ১৯৯৭ সালের ২৩ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতিসংঘের সাধারণ সম্মেলন।

এই সম্মেলনে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে কোন দেশ কোন দিকে দূষণ ঘটাচ্ছে, একটি খারাপ প্রতিক্রিয়া ঘটাতে কোন বিষয়টি দায়ী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে সম্মেলনে প্রতিরোধ বা দূষণ রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(৪) **পুনঃচক্র** (Re-cycle) : একটি দ্রব্যকে পুনঃউৎপাদনের মাধ্যমে বারবার ব্যবহার করাকে পুনঃচক্র বলে। আমাদের ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে ছেঁড়া কাগজ, টিনের কৌটা, প্লাস্টিকের বোতল প্রভৃতি প্রতিনিয়ত বর্জ্য হিসেবে জমা হয়। বাড়ি অথবা সব প্রতিষ্ঠানেই এসব দ্রব্য আলাদা-আলাদা পাত্রে জমা করা হয় এবং এগুলোকে কাঁচামাল (Raw materials) হিসেবে নির্দিষ্ট শিল্প কারখানায় ব্যবহার করা হয়। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে এ কাজটি যত্ন সহকারেই করা হয়। এতে দ্রব্যের অপচয় হয় না, সহজে কাঁচামাল পাওয়া যায় এবং বর্জ্য (waste) নিয়ন্ত্রিত উপায়ে দূরীভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানিতে এই ধরনের কার্যক্রম চালানো হয়। ছেঁড়া কাগজ থেকে সে দেশে পুনঃচক্রের মাধ্যমে যে কাগজ প্রস্তুত করা হয়, সে কাগজের উপর লেখা থাকে "পুনঃচক্রের কাগজ" (recycling paper)।

আবার, একটি শহরে যত টিস্যু পেপার টয়লেট থেকে বিতাড়িত হয়, সেগুলো ব্যাগে রেখে দেয়া হয়। সকালে পৌরসভার গাড়ি এসে সেগুলো নিয়ে যায় এবং এগুলোকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে ১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানো হচ্ছে। জার্মানির সোলিঙ্গেন (Solingen, Germany) শহরে এটি দেখা যায়।

(৫) **মেরামতকৃত যান** (Reconditioned Vehicle) : একটি মোটরযানের কার্যকাল থাকে ১০ থেকে ১৫ বছর। মোটরযানের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর তা মেরামত করলে তাকে মেরামতকৃত মোটরযান বলে। এই মোটরযানের ইঞ্জিন থেকে প্রতিনিয়তই কালো ধোঁয়া (যেমন : কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাস উৎপন্ন ও নির্গত হয়। এই গ্যাস পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

উন্নত দেশসমূহে কোনো মোটরযানের কার্যকাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়েল দেখে বাতিল করা হয়। অনুন্নত বিশ্বের লোভী ব্যবসায়ীগণ সেগুলো স্বল্পমূল্যে কিনে রং করার পর চাকচিক্য দেখিয়ে বিক্রয় করে ফলে সেই দেশের পরিবেশ দূষিত হয়। এজন্য মেরামতকৃত যান বা ব্যবহারের অনুপযোগী মোটরযান ব্যবহার না করা সচেতন জনগণের কর্তব্য।

(৬) **উচ্চ ফলনশীল বীজ** (High breed seed) : প্রচলিত বীজ ব্যবহার করে ক্ষেতে পূর্বাপর স্বাভাবিক হারে ফসল পাওয়া যায়। কিন্তু উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারে প্রচলিত বীজের তুলনায় দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ ফসল পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (BARI)-এর গবেষণা সেলে এই ধরনের বীজ উদ্ভাবন করে বাজারজাত করা হয় এবং সেগুলো কৃষকদের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে বিতরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ইরি-৮, সুফলা বীজ প্রভৃতি উচ্চ ফলনশীল বীজের আওতাভুক্ত। এই বীজ পোকায় খেতে পারে না। সঠিকভাবে চাষ করলে পুষ্ট ও ফলনশীল গাছ হয়। পরবর্তীতে সেই গাছ থেকে উচ্চহারে ফলন পাওয়া যায়।

(৭) **প্রতিবেশ** (Ecology) : ইকোলজির বাংলা আভিধানিক অর্থ প্রতিবেশ। Ecology গ্রীক শব্দ OIKOS থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার বিশ্লেষণাত্মক অর্থ গৃহ বা বসতি। জার্মান জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট হ্যাকেল প্রতিবেশ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, প্রতিবেশ প্রকৃতির অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট যা জীবজন্তু, জৈবিক ও অজৈবিক পরিবেশ, গাছপালা প্রভৃতির একটি

সরাসরি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ধারণ করে। বৃটিশ প্রতিবেশ বিজ্ঞানী চার্লস ফেল্টন ১৯২৭ সালে প্রতিবেশকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ইতিহাস হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা সমাজবিজ্ঞানী ও প্রাণী অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত। আজকাল প্রতিবেশকে পরিবেশ বিজ্ঞান ও পরিবেশ চর্চা হিসেবে বুঝানো হয়ে থাকে, যেখানে পরিবেশের যাবতীয় উপাদান সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।

(৮) টেকসই উন্নয়ন (Sustainable development) : কারিগরি কর্মকাণ্ডে সাংসারিক, সরকারি ও বেসরকারি পরিবেশে যে উন্নয়নের কোনো হঠকারিতা নেই, স্বল্প বা অধিক ব্যয়ে দেশের সর্বস্তরে সব পদ্ধতি সঠিকভাবে চালিত হয়, তাকে টেকসই উন্নয়ন বলে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারে সারা বছর জমি থেকে ২/৩টি ফসল উৎপাদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নকল প্রতিরোধ ও সুশিক্ষাদান, সরকারি ও বিরোধীদলের আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে দেশ গঠন, ঘুষ প্রথা রহিতকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি টেকসই উন্নয়নের আওতাভুক্ত।

পূর্বে লোকে ফসলের ক্ষেতে কীটনাশক দেয়া, অধিক সার ব্যবহারের সুফল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (waste management), দরিদ্রতা দূরীকরণে আত্মকর্মসংস্থান (self development) ইত্যাদি বুঝতো না। বর্তমানে এসব উন্নয়নের ধারা বুঝতে পারা ও কাজে যোগদানের মাধ্যমে বেকারের হাত কর্মীর হাতে পরিণত হচ্ছে, দরিদ্র ব্যক্তি হচ্ছে স্বচ্ছল, আর দেশ উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং আয়-রোজগার দিন দিন বাড়ছে। টেকসই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে বলেই এগুলো সম্ভব হচ্ছে।

(৯) বনায়ন : পতিত জমি, পাহাড়ি এলাকা, নদী ও রাস্তার ধার প্রভৃতি এলাকায় বিভিন্ন ফলমূল ও অর্থকরী গাছ বপন করে বন সৃষ্টি করাকে বনায়ন বলে। বনায়নে অনেক উপকারিতা রয়েছে যেমন—গাছপালা থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য আমরা অক্সিজেন পাই এবং জীবজন্তু থেকে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে, তাই বনের গাছপালা আমাদের প্রকৃত বন্ধু। বন থেকে আমরা ফলমূল, আসবাবপত্র প্রস্তুতের কাঠ, জ্বালানি, বন্য জীবজন্তু, বেত প্রভৃতি পাই। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে বনভূমি আমাদেরকে অনেক সময় রক্ষা করে। নদীর পাড়ে বনভূমি থাকলে সেটি নদীর মাটি বা পাড়ের ক্ষয়রোধ করে। তাছাড়া, বনভূমি মাটিতে ছায়া দিয়ে মাটিকে ফসলের জন্য সিক্ত বা ভেজা রাখে। গরমের সময় গাছের ছায়ায় বসলে পথিকের ক্লান্তি দূর হয়, প্রাণ জুড়ায়।

একটি দেশের জন্য বনভূমি থাকা দরকার মোট ভূ-খণ্ডের প্রায় ২৫ ভাগ। আর সেখানে আমাদের রয়েছে মাত্র ৮ ভাগ। কিন্তু জার্মানিতে বনভূমি রয়েছে মোট ভূ-খণ্ডের ৬০ ভাগ। তাই, নির্দিষ্ট পতিত জমিতে বনায়ন করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

(১০) পরিবেশ দূষণ (Environment pollution) : পরিবেশ বলতে ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত, রাস্তাঘাট, হাট-বাজার, শহর ও গ্রাম, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতিকে বুঝায়। ধুলাবালি, বর্জ্য, নোংরা, পচা দুর্গন্ধ, কালো ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি দিয়ে যখন ঐগুলোকে মানুষের বসবাসের অযোগ্য করা হয় তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

যেখানে সেখানে কফ, থু থু ফেলা, খাবার ঢেঁকে না রাখা, যত্রতত্র পায়খানা-প্রস্রাব করা, কালো-ধোঁয়াযুক্ত দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন ব্যবহার করা ইত্যাদি কারণে পরিবেশ দূষণ ঘটে। পরিবেশ দূষণ ঘটলে গাছপালা, মানুষজন, পশুপাখি প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আমরা প্রচুর

গাছপালা বপন করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেকে, অনিয়ম না করে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পারি।

(১১) ম্যানগ্রোভ বনভূমি : যে বনভূমি পানির স্রোতে ও আর্দ্রস্থানে আপনা-আপনি সৃষ্টি হয় তাকে ম্যানগ্রোভ বনভূমি বলে। বাংলাদেশের সুন্দরবন একটি ম্যানগ্রোভ বনভূমি। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এই বনভূমি অবস্থিত। এই বনে সুন্দরী, গড়ান, গেওয়া, শাল, সেগুন, বেত, গোলপাতা প্রভৃতি গাছের সমাহার রয়েছে। সুন্দরবনে যেসব গাছপালা আছে, সেগুলোর ফল, ডালপালা প্রভৃতি নিচে পতিত হলে পানির মধ্যেই সেগুলো থেকে আবার গাছপালা গজায়। কিছু কিছু গাছপালা কেটে নেয়া হলেও অধিকাংশ গাছপালা, লতাপাতা পচে সার হয় এবং সেগুলো গাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হরিণ গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার (Royal bengal tiger) পৃথিবী বিখ্যাত। সুন্দরবনে দেশের প্রায় ৭০% মধু প্রস্তুত হয় এবং এই মধু আহরণ করতে গিয়ে অনেক বাওয়ালি বাঘের আক্রমণে আহত বা নিহতও হয়।

(১২) নিমাপ (National Environmental Management and policy or NEMAP) : নিমাপ বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ নীতিকে বুঝায়। ১৯৯২ সালে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব ও উন্নতি নির্ভরশীল। পূর্বে পরিবেশ নীতি না থাকার জন্য আমাদের দেশ থেকে অনেক প্রাণী ও গাছপালার বিলুপ্তি ঘটেছে। তাই, সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি সব প্রকার প্রাণের অস্তিত্ব এবং মানব সভ্যতার উন্নয়নের একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

দেশে উপর্যুপরি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, লবণাক্ততার বিস্তার রোধ করার জন্য দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং এনজিও (NGO) বিভিন্ন সংস্থা নিমাপ এর দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে থাকে।

(১৩) মহাকাশ গবেষণা ও তথ্য সরবরাহ সংস্থা (SPARRSO) : এটি এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এই সংস্থার গবেষণা যন্ত্রগুলোর ইউনিট আকাশে ভাসমান অথবা ভূ-উপগ্রহে অনেক উপরে স্থাপিত অবস্থায় ভূমিতে রক্ষিত গ্রাহক যন্ত্রে ভূ-মণ্ডলীয় খবর প্রেরণ করে। বিভিন্ন ঋতুতে আবহাওয়া, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, বৃষ্টিপাত হওয়ার আগাম খবর আবহাওয়া অফিস এই সংস্থা থেকেই পেয়ে থাকে। আবার, বিশ্বের কোথায় কোন ঘটনা ঘটলো সেগুলো এই সংস্থার চলমান ক্যামেরা (running camera) ধারণ করে রাখে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সে তথ্য যথাযথ গ্রাহক ও প্রচার যন্ত্রে প্রেরিত হলে, সেটি বিশ্ববাসী জানতে পারে। যেমন : আমেরিকার টু-ইন-টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা (২০০১ সালে) এই সংস্থার মাধ্যমে ক্যামেরা থেকে টিভিতে সম্প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববাসী অবগত হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এ ধরনের পরিবেশ গবেষণামূলক তথ্যকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়।

(১৪) গ্রীন হাউজ (Green house) : গ্রীন হাউজের বাংলা আভিধানিক অর্থ সবুজ ঘর। শীতপ্রধান দেশে এই ঘরের মধ্যে ফুল, ফলমূল, শাক-সবজি প্রভৃতি উৎপন্ন করা হয়। বরফের হাত থেকে এসব গাছপালাকে রক্ষা করার জন্য সবুজ ঘরের ছাদ হিসেবে কাচ অথবা

প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়। সূর্যের রশ্মি এই ঘরের ছাদ দিয়ে প্রবেশ করতে পারে এবং এভাবে গাছপালা সতেজ থাকে। ঘরের দেওয়ালে ছিদ্র থাকে, যার মধ্যে দিয়ে এই ঘরে বায়ু চলাচল করতে পারে। বসতবাড়ি, শিল্প-কারখানাকেও অন্য কথায় গ্রীন হাউজ বলা হয়।

আমাদের দেশেও বন সম্প্রসারণ এবং কৃষি সম্প্রসারণ সংস্থা প্রখর সূর্যতাপ থেকে গাছকে রক্ষা করার জন্য গ্রীন হাউজ ব্যবহার করে। জার্মানি, ডেনমার্কসহ বিশ্বের শীতপ্রধান দেশে শীতকালে বরফ এবং গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যতাপ থেকে এই সবুজ গাছকে রক্ষা করার জন্য সবুজ ঘর সারা বছরই ব্যবহার করা হয়। এই ঘরের দৈর্ঘ্য বেশ লম্বা (প্রায় ২০০ মিটার) এবং অপেক্ষাকৃত কম চওড়া (প্রায় ২০ মিটার)। এ ঘরে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাও থাকে।

(১৫) গ্রীন হাউজ গ্যাস (Green house gas) : বসতবাড়ি, রান্নাঘর, মোটরযান, ইটের ভাটা, শিল্প-কারখানা প্রভৃতি থেকে যে জ্বালানি প্রজ্বলনের গ্যাস নির্গত হয়, তাকে গ্রীন হাউজ গ্যাস বলে। গ্যাসীয় জ্বালানি থেকে যে পরিমাণে ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত হয়, তার চেয়ে অধিক ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত হয় খনিজ জ্বালানি (fosil fuel) থেকে। গ্রীন হাউজ গ্যাস বলতে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), কার্বন মনোক্সাইড (CO), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) ইত্যাদিকে বুঝায়।

মোটরযানসহ অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহারের যন্ত্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন মনোক্সাইড জীবজন্তুর শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অনেক বেশি মারাত্মক। কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস ভর্তি কোনো কক্ষে জীবজন্তু প্রবেশ করলে ক্ষণকালের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। রেফ্রিজারেশন এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের (freeze and air-conditioning unit) পাইপ লাইন লিকেজ হলে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাস পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

গ্রীন হাউজ গ্যাস ওজোন স্তরের (ozone layer) নিঃশেষকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গ্রীন হাউজ গ্যাস বায়ুমণ্ডলের বাতাসের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি করছে। তাই, এ গ্যাস যত কম নির্গত হয় ততই পৃথিবী তথা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। পরিবেশ বলতে কি বুঝ?

উত্তর : বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তাই নিয়ে আমাদের পরিবেশ। মানুষের জীবন ধারণ ও বিকাশের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সম্মিলিত উপাদান যেমন, মানুষজন, গাছপালা, জীবজন্তু, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, আলোবাতাস প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত হয় পরিবেশ।

২। পরিবেশ দূষণ ঘটে কিভাবে?

উত্তর : বাড়িঘর, হাটবাজার, শিল্পকারখানা প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন গ্যাস প্রভৃতি যথেচ্ছভাবে নির্গত হলে পরিবেশ দূষণ ঘটে।

BANGLADESH Dhaka

৩। পরিবেশ ভালো রাখতে নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব কি?

উত্তর : নাগরিক হিসেবে সবাইকে ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত, হাট-বাজার, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, নদী-নালা প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা ও বর্জ্য ব্যবস্থার কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা কর্তব্য।

৪। ধরিত্রী সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : ধরিত্রী সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সব দেশের নিজ নিজ পরিবেশ সুন্দর রাখতে আলোচনা এবং সে মতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫। বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ বলা হয় কেন?

উত্তর : বাংলাদেশে অসংখ্য নদী রয়েছে। এসব নদী দেশের ভূ-খণ্ডের বাংলা অক্ষর ব এর মতো অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে, সেজন্যে বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ বলা হয়।

৬। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি?

উত্তর : অশিক্ষা, অসচেতনতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মান্ধতা আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।

৭। দরিদ্রতার মূল কারণ কি কি?

উত্তর : শিক্ষার অভাব, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, অলসতা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীনতা, পরিশ্রম বা কাজ করতে অনীহা প্রভৃতি দরিদ্রতার মূল কারণ।

৮। পরিবেশ প্রধানত কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : পরিবেশ প্রধানত দুই প্রকার, যথা :

(ক) জীব পরিবেশ (Biotic Environment) এবং

(খ) জড় পরিবেশ (Abiotic Environment)

৯। আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থা কি?

উত্তর : বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিবেশে প্রাণীজের সাথে প্রাণীজ ও অপ্রাণীজ উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়াকে আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থা বলে।

১০। জৈবিক উপাদান (Biotic Component) কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : জৈবিক উপাদান দুই প্রকার, যথা :

(ক) উৎপাদক (Producers) এবং

(খ) ভোক্তা (Consumers)।

১১। অজৈবিক উপাদান কত প্রকার? যে কোনো তিনটির নাম লিখ।

উত্তর : অজৈবিক উপাদান সাধারণত আট প্রকার, যথা :

(ক) জলবায়ু ও আবহাওয়া,

(খ) মাটি ও

(গ) পানি।

১২। আন্তঃজৈবিক কাঠামো (Ecosystem structure) কি?

উত্তর : জীব, জীবকোষ এবং অজৈবিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত কাঠামোকে আন্তঃজৈবিক কাঠামো বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। পরিবেশ কি এবং এটি কি কি উপাদান নিয়ে গঠিত হয়?

উত্তর : মানুষজন, পশুপাখি, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, মাটি ও বায়ু, হাট-বাজার প্রভৃতি নিয়ে পরিবেশ গঠিত হয়। পরিবেশের উপাদান দুই প্রকার, যথা : (১) জীব পরিবেশের উপাদান, উদাহরণস্বরূপ, জীবজন্তু, গাছপালা, পশুপাখি। (২) জড় পরিবেশের উপাদান, উদাহরণস্বরূপ, জলবায়ু ও আবহাওয়া, মাটি, পানি, আগুন।

২। বাংলাদেশের আঞ্চলিক চিত্র বর্ণনা কর।

উত্তর : বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ। এটি ২০° ৩৪′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬° ৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ০১′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯২° ৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের আয়তন প্রায় ১,৪৮,৯৩৯ বর্গকিলোমিটার (নদী ও বনাঞ্চলসহ)। দেশের উত্তরে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে মায়ানমার ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। এটি একটি নদীমাতৃক দেশ।

৩। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও অর্থনীতি (People and Economy) সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর : বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯৯ সালের তথ্য মোতাবেক এদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৩০ মিলিয়ন বা ১৩ কোটি। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৯৩%। ভূ-পৃষ্ঠের দিক থেকে এটি বিশ্বের ৮ম জনবহুল দেশ। এদেশের প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৭৫০ জন লোক বসবাস করে। শিক্ষার হার বর্তমানে প্রায় ৫০%। এদেশে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ লোক বেকার রয়েছে। মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২৮৩ মার্কিন ডলার। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রায় ৭% জাতীয় আয় এবং ৮৬% বিদেশী সাহায্য ও ঋণের উপর নির্ভরশীল। দেশের প্রায় ৫০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে।

৪। বাংলাদেশে দরিদ্রতা মোচনের পাঁচটি শর্ত লিখ।

উত্তর : বাংলাদেশে দরিদ্রতা মোচনের পাঁচটি শর্ত হলো :

(ক) দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে হবে ;

(খ) শিক্ষার হার বাড়াতে হবে ;

(গ) কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে ;

(ঘ) আত্মকর্মসংস্থানের দিকে যুবক-যুবতীকে উৎসাহিত করতে হবে ;

(ঙ) বেকারের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করতে ও সন্ত্রাস দূর করতে হবে।

৫। নাগরিক হিসেবে ছাত্রছাত্রীর দায়িত্ব কি লিখ।

উত্তর : নাগরিক হিসেবে ছাত্রছাত্রীর দায়িত্ব নিম্নরূপ :

(ক) ছাত্রছাত্রীকে নিজ নিজ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রেখে ঠিকমতো পড়ালেখা করতে হবে।

(খ) ছাত্রছাত্রীকে দিবারাত্র ১০ থেকে ১৫ ঘণ্টা পাঠচর্চা এবং বিকালে একঘণ্টা খেলাধুলা করতে হবে।

(গ) পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গুরুজনদের উপদেশ মেনে চলতে হবে এবং ছোটদেরকে আদর করতে হবে।

(ঘ) চরিত্র গঠনে সচেষ্ট থাকা এবং মাতৃভূমির প্রতি অনুগত থাকতে হবে।

(ঙ) অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও ধর্মীয় মনোভাবের আওতায় বিশ্বের সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে।

৬। দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে কোন কোন সংস্থা ভূমিকা রাখে?

উত্তর : দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে নিম্নবর্ণিত সংস্থা ভূমিকা রাখে, যেমন :

(ক) সরকারি সংস্থা (Government Sectors), যেমন : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বন বিভাগ, পরিবেশ বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় প্রভৃতি।

(খ) বেসরকারি সংস্থা (NGOs), যেমন : পরিবেশগত বেসরকারি সংস্থার যৌথ কর্মীদল (NGOs, CEN), এডাব (ADAB), প্রশিকা (Prashika), কারিতাস (Caritas) প্রভৃতি।

(গ) শিক্ষা সংস্থা (Education Sectors), যেমন : বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, কলেজ, প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ প্রভৃতি।

(ঘ) গবেষণা ইন্সটিটিউট, যেমন : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা সংস্থা (BARC), বন গবেষণা ইন্সটিটিউট (FRI), বিশ্ববিদ্যালয়, মহাকাশ গবেষণা ইন্সটিটিউট (SPARRSO) প্রভৃতি।

(ঙ) মাধ্যম (Media), যেমন : দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট প্রভৃতি।

৭। একটি পুকুরের আন্তঃজৈবিক কাঠামো বর্ণনা কর।

উত্তর : একটি পুকুরে পানির মধ্যে শৈবাল, শেওলা, কচুরিপানা, লতাপাতা, কাদামাটি, গুল্ম, ঘাস প্রভৃতি থাকে। এখানে ছোট মাছ, মাঝারি মাছ, ব্যাঙ, সাপ, কেঁচো, প্রভৃতি বাস করে। ছোট মাছ শেওলা, ব্যাকটেরিয়া, পানির পোকা, প্রভৃতি খেয়ে জীবন ধারণ করে। বড় মাছ শেওলা, ব্যাকটেরিয়া, ছোট মাছ প্রভৃতি খায়, ব্যাঙ ছোট মাছ ও পোকামাকড় খায়, সাপ ব্যাঙ ও ছোট মাছ ধরে খায়। এটিই হলো একটি পুকুরের আন্তঃজৈবিক কাঠামো।

৮। পরিবেশ শিক্ষা (Environment Education) কি?

উত্তর : যে বিষয় পাঠ করে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, পশুপাখি, গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, ঝড়-ঝঞ্জা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, জলবায়ু, আবহাওয়া, খরা প্রভতি সম্পর্কে জানা যায় তাকে পরিবেশ শিক্ষা বলে।

পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে সে ব্যক্তির পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, সংসার ছোট এবং স্বচ্ছল, পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন ঘটানো, পরিবেশের দূষণরোধে ভূমিকা গ্রহণ প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পাদনের স্পৃহা জন্মে। তখন যত্রতত্র পায়খানা প্রস্রাব করা, কফ-থুথু যেখানে সেখানে ফেলা,

টবিনের বাইরে বর্জ্য ফেলা তার চরিত্রে থাকতে পারে না। যে উন্নত বিশ্ব যেমন, জার্মানি, পান, আমেরিকা ঘুরে আসে সে সেখান থেকে ঠিকই পরিবেশ শিক্ষা কি জেনে আসে। মাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশ সংক্রান্ত সংস্থাসমূহ বর্তমানে পরিবেশ শিক্ষা পর্কে সতর্ক হয়েছে।

নামূলক প্রশ্ন

১। পরিবেশ (Environment) বলতে কি বুঝ? এটি কত প্রকার ও কি কি, াহরণসহ লিখ।

২। মানচিত্রসহ বাংলাদেশের আঞ্চলিক চিত্র চিত্রায়িত কর।

৩। দেশের জনসংখ্যার সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক বর্ণনা কর।

৪। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে তোমার ভূমিকা কি? অন্ততপক্ষে দশটি র্যাবলির নাম লিখ।

৫। বাংলাদেশের কোন কোন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ পরিবেশ সংরক্ষণে মিকা রাখে? সেগুলোর ধারাবাহিক নাম উল্লেখ কর।

৬। দরিদ্রতা বলতে কি বুঝ? দরিদ্রতা দূরীকরণে কমপক্ষে দশটি পদক্ষেপের নাম লিখ।

৭। আন্তঃজৈবিক ব্যবস্থা (Eco-system) ও আন্তঃজৈবিক কাঠামো (Eco-system ucture) কি, উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৮। টীকা লিখ (যে কোনো চারটি) :

(ক) ধরিত্রী সম্মেলন (Earth Summit),

(খ) প্রতিবেশ (Ecology),

(গ) টেকসই উন্নয়ন (Sustainable development),

(ঘ) বনায়ন (Afforestation),

(ঙ) পরিবেশ দূষণ (Environment pollution) ও

(চ) ম্যানগ্রোভ বনভূমি (Mangrove forest)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পদ ও পরিবেশ

২.১ সম্পদ (Resources)

মানুষের কল্যাণে সম্পদ অতীব প্রয়োজন। আমরা প্রতিনিয়ত যেসব উপাদান ব্যবহার করি, সেগুলো সবই সম্পদের আওতাভুক্ত। যেমন : আমাদের ঘরবাড়ি, জমিজমা, অর্থ, পশুপাখি, পানি, বায়ু, গাছপালা ইত্যাদি সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। বিশিষ্ট সম্পদ বিশারদ জিমারম্যানের (Zimerman) মতে, সম্পদ হলো মানুষের অভাব মোচনের উপযোগী পদার্থ যা মানুষের চাহিদার নিবৃত্তি এবং সামাজিক লক্ষ্য পূরণ করে।

সম্পদ আছে বলেই আমরা সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারি, চাহিদা মেটাতে পারি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, গাড়ি, বসতবাড়ি প্রভৃতি নির্মাণ করতে পারি। আবার, সম্পদের সদ্ব্যবহার না করলে সম্পদ থাকলেও তা কাজে ব্যবহার করা যায় না এবং পদে পদে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। বৃষ্টির পানি, নদীর পানি, পেট্রোলিয়াম ও কয়লাখনি, ভূ-গর্ভস্থ গ্যাস প্রভৃতি সম্পদ হলেও এগুলো সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়।

সম্পদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Resources)

সম্পদ প্রধানত দুই প্রকার, যথা :

১। অর্জিত সম্পদ (Earned Resources) এবং

২। অনার্জিত সম্পদ (Unearned Resources)।

এসব সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হয়েছে।

১। **অর্জিত সম্পদ** (Earned resources) : এ সম্পদ মানুষ চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। অধিক চেষ্টার মাধ্যমে এই সম্পদ বৃদ্ধি এবং পরিচর্যার অভাবে এই সম্পদের অপচয় বা বিপর্যয় ঘটে। অর্জিত সম্পদকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

(ক) মানব সম্পদ (Human resources) : মানব সম্পদ বলতে দেশের জনসংখ্যার সুষ্ঠু বণ্টন, শ্রমের যোগান ও উৎকর্ষতা প্রভৃতিকে বুঝায়। অধিক জনসংখ্যা থাকলে তখনই বোঝা হয় যখন জনগোষ্ঠীর কোনো কাজ থাকে না। বেকারের হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করলেই সেই জনগোষ্ঠী মানব সম্পদে পরিণত হয়।

(খ) সাংস্কৃতিক সম্পদ (Cultural Resources) : সাংস্কৃতিক সম্পদ বলতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি, মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশ ও প্রয়োগ প্রভৃতিকে

া। এই সম্পদ ঘাটতির কারণে দেশে প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটে না। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি তি রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক সম্পদে উন্নত বলেই তারা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রগামী।

২। অনার্জিত সম্পদ (Unearned resources) : যে সম্পদ তৈরি করা হয় না এবং তি থেকে আপনা-আপনি পাওয়া যায়, তাকে অনার্জিত সম্পদ বলে। অন্য কথায় ক প্রাকৃতিক সম্পদও বলা হয়। অনার্জিত সম্পদকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়, –

(অ) অজৈব সম্পদ (Inorganic resources) : প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত যে সম্পদের না প্রাণ নেই, তাকে অজৈব সম্পদ বলে। যেমন, ভূমি, পানি, বায়ু, সূর্যালোক, খনিজ র্থ প্রভৃতি অজৈব সম্পদের উদাহরণ।

(আ) জৈব সম্পদ (Organic resources) : প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত যেগুলোর আছে তাকে জৈব সম্পদ বলে। উদাহরণস্বরূপ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, পশুপাখি, মৎস্য তি জৈব সম্পদের উদাহরণ।

ভূ-সম্পত্তি (Land Resources)

বাড়ি নির্মাণ, চাষাবাদ, রাস্তাঘাট, পুকুর, নদীনালা প্রভৃতি খনন ও তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ভূমি প্রকৃতির দান এবং এর একটি নির্দিষ্ট মূল্য আছে। রি ভূমিতে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়, নদীনালায় মাছের চাষ হয়। তাই ভূমিকে ত্তি, ভূ-সম্পত্তি বা ভূ-সম্পদ বলা হয়। আবার ভূ-অভ্যন্তরে বিভিন্ন খনি বিদ্যমান। া, পেট্রোলিয়াম, বিভিন্ন ধাতু প্রভৃতি খনি থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং ভূমি থেকে রিত দ্রব্য ও পদার্থ আমাদের দৈনন্দিন চলার পথে পাথেয় হিসেবে পরিগণিত হয়। ভূমি আহরিত সম্পদের তালিকা নিম্নরূপ :

(১) ফসল : ধান, পাট, চা, ইক্ষু, আলু, পিয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, পান, তৈলবীজ, যব, গম, ভূট্টা প্রভৃতি।

(২) ফলমূল : আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, সুপারি, আতা, লেবু, পেঁপে, বেল, আনারস, কমলা, তরমুজ, তাল, বেদানা, খিরাই, আমড়া, কুল, আঙ্গুর, রা প্রভৃতি।

(৩) খনিজ পদার্থ : লৌহ, ইস্পাত, তামা, সীসা, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি।

(৪) জ্বালানি : পেট্রোলিয়াম, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি।

(৫) পানি সম্পদ : বিভিন্ন প্রকার মাছ, জলযান উপযোগী পরিবেশ, ফসলের জন্য সেচের ব্যবস্থা, খাবার পানি প্রভৃতি।

(৬) বনজ সম্পদ : কাঠ, জ্বালানি, জীবজন্তু, জীবজন্তু বাঁচার জন্য অক্সিজেন, মধু, প্রভৃতি।

(৭) নির্মাণ কাঠামো : ভূ-সম্পত্তিতে বসতবাড়ি, দালানকোঠা, হাটবাজার, বাণিজ্যিক া প্রভৃতি।

একটি দেশের অস্তিত্ব নির্ভর করে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের উপর। কথায় বলে, যার বাড়ি করার জন্য এক টুকরা জায়গা নেই, দুনিয়ায় সে সবচেয়ে গরিব। কোনো প্ল্যান্ট স্থাপন করতে গেলে প্রথমেই এলাকা নির্বাচন করতে হয়। এক্ষেত্রে উপযোগী ভূমি একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

২.৩ কৃষি প্রতিবেশী অঞ্চল (Agro-ecological Zone)

যেসব এলাকায় কৃষিজাত পণ্য ভালো জন্মে, সেসব এলাকাকে কৃষি সম্পদ বা কৃষি প্রতিবেশী এলাকা বলে। বিস্তীর্ণ সমভূমি, উর্বর মৃত্তিকা ও বৃষ্টিবহুল জলবায়ু—বাংলাদেশকে একটি উৎকৃষ্ট কৃষিভূমিতে পরিণত করেছে। দেশের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ লোক কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশ হলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে কৃষিক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বাংলাদেশের বহুবিধ সমস্যা রয়েছে। এদেশের জনপ্রতি আবাদি জমির পরিমাণ পৃথিবীর অন্যান্য জনবহুল ও কৃষিপ্রধান দেশের তুলনায় অনেক কম।

দেশের ৯১,০৫,৭৫০ হেক্টর জমিতে কৃষিকাজ করা হয়। অর্থাৎ মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ মাত্র ০.৮৩ হেক্টর। অনাবাদি জমির পরিমাণ কম বলে ভবিষ্যতে কৃষির সম্প্রসারণ সম্ভাবনাও সীমিত। পর্যায়ক্রমে তলানি পড়ার ফলে বহু নদীগর্ভের গভীরতা হ্রাস পেয়ে স্থানে স্থানে স্বাভাবিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে।

এভাবে ধীরে ধীরে মৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদনশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। অতি বৃষ্টি, বন্যা ও বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা, প্রয়োজনীয় পানি সেচ ব্যবস্থার অভাব, কীটপতঙ্গের আক্রমণ, জমির স্বল্পতা, উৎকৃষ্ট সার, মূলধন ও সংগঠনের অভাব বাংলাদেশের কৃষি সমস্যার অন্যতম। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা ও আত্রাই নদীর উপত্যকা, পদ্মা ও যমুনা নদীর অববাহিকা প্রভৃতি অঞ্চল কৃষিসম্পদ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগের অধিক জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি এলাকায় ধান ও তৈলবীজ ভালো জন্মে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি এলাকায় পাট ভালো জন্মে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সিলেট এলাকায় চা ভালো জন্মে। রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বগুড়া অঞ্চলে আখের চাষ ভালো হয়। রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, ঢাকা ও ময়মনসিংহে তামাকের চাষ হয়। পাবনা, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি এলাকায় গমের চাষ ভালো হয়।

১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরে দেশের প্রধান কৃষি দ্রব্যের আবাদভূমি ও উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ : ১৯৮৭-৮৮)

ক্রমিক নং	শস্য	ভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদনের পরিমাণ
১.	ধান	১,০৬,০৯,০৩৮	১৬০.২২ লক্ষ মেট্রিক টন
২.	গম	৫,৮৪,৭৫৯	১১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন

৩.	পাট	৭,৬৯,০০০	৬৭.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন
৪.	আখ	১,৬২,০০০	৬৮.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন
৫.	তামাক	৪৬.১৩২	৪৬ হাজার টন
৬.	চা	৪৬.৪৪৪	৪০.৩৮ মিলিয়ন কেজি

আমাদের দেশের জনগণ রুটির পরিবর্তে ভাতই অধিকহারে পছন্দ করে। সে কারণে নের উৎপাদন সব এলাকাতেই প্রাধান্য পায়। দেশে ৩২ প্রকার ধান পাওয়া যায়। দেশে যে ষি জমি রয়েছে, তা থেকে আমরা নিম্নবর্ণিত হারে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করে থাকি। মন :

শস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমি	=	৭১%
মৎস্য চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি	=	১০%
গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি	=	০৯%
বনজ সম্পদ উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত জমি	=	১০%
	মোট :	১০০%

উৎস : বাংলাদেশের পরিসংখ্যান বোর্ড, ১৯৯২-৯৩।

বাংলাদেশে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার মাত্রা সব এলাকায় এক রকম নয়। মাটির পযোগিতার উপর এটি নির্ভরশীল। আবার বছরের ছয়টি ঋতুতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কার ফসল উৎপন্ন হয়। পরিসংখ্যান তথ্য মোতাবেক দেশের বিভিন্ন এলাকায় ফসল ৎপন্নের হার নিচে দেয়া হলো :

আমন ধান উৎপাদনের পরিমাণ	=	৪৯%
আউশ ধান উৎপাদনের পরিমাণ	=	১১%
গম, যব, উৎপাদনের পরিমাণ	=	০৬%
বোরো ধান উৎপাদনের পরিমাণ	=	০৩%
	মোট :	৬৯%

দেশে প্রায় ৩১% খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। ফসল উৎপাদনের কমবেশির উপর প্রতিবছরই ই হারের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

জমিতে সার ব্যবহারের উপর উৎপাদনের মাত্রা নির্ভরশীল। আমরা এতদিন যেসব কথা নছি যে, সার ব্যবহারে জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পায়, একথা বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে ঠিক নয় া প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৭৪ এবং ১৯৯৩ সালে প্রতি হেক্টর জমিতে বাংলাদেশ ও অন্যান্য উন্নত বিশ্বের দশসমূহে সার ব্যবহারের খতিয়ান দেয়া হলো :

১৯৭৪ বাংলাদেশে = ৫৯ কেজি/হেক্টর/বছর

১৯৯৩ বাংলাদেশে = ১০১ কেজি/হেক্টর/বছর

১৯৯৩ কোরিয়ায় = ৬৭০ কেজি/হেক্টর/বছর

১৯৯৩ চীনে = ৬৫০ কেজি/হেক্টর/বছর

চীন দেশে অধিক হারে সার প্রয়োগের ফলে ফলনের পরিমাণ কি হারে বাড়ে এবং বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত কম সার প্রয়োগ করে কি হারে কম ফসল পাওয়া যায়, তার পরিসংখ্যান নিচে দেয়া হলো :

ধান, চীনে = ১০.৫ টন/হেক্টর (উন্নতজাতের ধান)

ইরি ধান, বাংলাদেশ = ৩.৫ টন/হেক্টর (যখন সার ৪০০ কেজি/হেক্টর/বছর ব্যবহার করা হয়)

দেশী ধান, বাংলাদেশ = ১.২ টন/হেক্টর (যখন সার ১০১ কেজি/হেক্টর/বছর ব্যবহার করা হয়)

ইউরিয়া সার শুধু ক্ষেতের উর্বরা শক্তিই বাড়ায় না, গরু ও পুকুরে মাছের পুষ্টিকর খাবার হিসেবেও ইউরিয়া ব্যবহৃত হয়। তবে, জমিতে কীটনাশক ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ, কীটনাশক কীটপতঙ্গের জন্য যেমন জীবননাশক, অন্যান্য জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা, নদী ও পুকুরের পানি প্রভৃতির জন্যও দূষণীয়।

এক কৃষি সমীক্ষায় জানা গেছে যে, ১৯৯৪-৯৫ সালে দেশে ফসলের জমিতে ৭,৫০০ মেট্রিক টন কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে। আজকাল শাকসবজি ও শুঁটকি মাছেও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। কীটনাশক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা ও সরকারি নিয়ন্ত্রণের অভাবে খাদ্যশস্য, শুঁটকি মাছ ও শাকসবজিতে লাগামহীনভাবে এর ব্যবহার জনগণকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আশির দশকের প্রথম দিকে সচরাচর ব্যবহৃত কীটনাশকের সংখ্যা ছিল ২৪টির মতো। কিন্তু বর্তমানে এর সংখ্যা প্রায় ৩০০ তে পৌঁছেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে বছরে শতকরা ৭ থেকে ৮ ভাগ কীটনাশক শস্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শাকসবজিতে এর ব্যবহার অনেক বেশি।

বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের অধীনে পরিচালিত আই এফ আর বি (The Institute of Food and Radiation Biology) কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় শাকসবজি ও শুঁটকি মাছে বিষাক্ত কীটনাশকের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। আণবিক শক্তি কমিশন এক গবেষণায় উল্লেখ করে যে, শাকসবজি ও খাদ্যশস্যে কীটনাশকের অপব্যবহার ও অতিব্যবহার ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা আরও বলেন, পরীক্ষার জন্য নমুনা হিসেবে সংগৃহীত অধিকাংশ শুঁটকি মাছে আশঙ্কাজনক পরিমাণ ডি ডি টি পাওয়া গেছে। এর পরিমাণ ৫০ পিপিএম (PPM or Parts per million) থেকে ১০০ পিপিএম পর্যন্ত।

সুতরাং লক্ষ লক্ষ মানুষ সুস্বাস্থ্য ও নিশ্চিত জীবনযাপনের লক্ষ্যে ফলপ্রসূ আইনের প্রয়োগ এবং সাথে সাথে কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহারকারী যেন শাকসবজি ও শুঁটকি মাছে বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৪ বাংলাদেশের জলাভূমি (Wetland of Bangladesh)

ংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৬.৪ ভাগ জলাভূমি। এ দেশে অসংখ্য নদীনালা ও খালবিলের মন্বয়ে গঠিত প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ রয়েছে। ন্মধ্যে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার সারা বছর নৌ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। অবশিষ্ট প্রায় ,০০০ কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহার করা হয়। এই নদীবাহিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে াকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ অন্যতম। এ এলাকার অনেকাংশ ারা বছর পানির নিচেই থাকে। কিছু কিছু এলাকায় পানি সরিয়ে শীতকালে ফসল ফলানো য়, আবার কোনো কোনো এলাকায় প্রচুর মাছের চাষ করা হয়।

বাংলাদেশে জলাশয়ের সংখ্যা নিম্নরূপ :

পুকুর..... প্রায় ১৭,৬৭,০০০টি।

হাওড়, বিল, দিঘি .....প্রায় ৬০,০০০টি।

দেশের বিভিন্ন এলাকা যেমন যশোহর জেলায় বিল ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে ১৩৫৮ হক্টর, বৃহত্তর রাজশাহী ও পাবনা জেলায় বিল ও অন্যান্য জলাশয় ৩৭,৫০০ হেক্টর, বৃহত্তর নমনসিংহ জেলায় বিল ও হাওড় মিলে ১১,৫৪৫ হেক্টর এবং বৃহত্তর সিলেট জেলায় হাওড় জুড়ে আছে ৬৫,২৪৬ হেক্টর জমিতে। এ ছাড়াও বাংলাদেশে আরো ছোট ছোট বিল, নালা, াল ও জলাশয় রয়েছে। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে ছোট বড় অনেক দিঘি রয়েছে। গুলোর মধ্যে দিনাজপুরের রামসাগর, মহাবাজার দিঘি, সুখ সাগর, বামনদিঘি, আয়নার দিঘি ভৃতি অন্যতম। রাজশাহীর ধরিয়ার সাগর, দিঘাপাতিয়া দিঘি, কুসুম্বা দিঘি, মহারাজ দিঘি ভৃতি উল্লেখযোগ্য। বগুড়ার নন্দাইল ও কুঞ্জিলা দিঘির আকার ও গভীরতার নিদর্শন রয়েছে। কুমিল্লার ধর্মসাগর ও রাণীর দিঘি বেশ উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামের ফয়েজ লেক-এর চতুর্দিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাকৃতিক পরিবেশ দিয়ে দর্শনার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উজানে ৯০৬ বর্গকিলোমিটার আকারের বিশাল কৃত্রিম হ্রদ রয়েছে, যেখানে ারা বছর পানির প্রবাহ ও গভীরতা থাকে। পাবনা ও রাজশাহী জেলার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে একটি বিল ছিল, এটিকে বলা হতো চলনবিল। সে চলনবিল এখনও আছে তবে বেশ ছোট আকারের। এটির চারদিকে বর্তমানে ধানের চাষ করা হয়। বিল, হাওড়, দিঘি, খাল, লেক, হ্রদ সবই পানির আধার হিসেবে কাজ করে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে এসব হাওড়, বিল, দিঘি প্রভৃতির নাব্যতা বাড়িয়ে সারা বছর এটির সারফেস ওয়াটার ব্যবহার করা প্রয়োজন। এতে ভূ-গর্ভস্থ পানি আহরণের চাপ অনেকটা কমে যাবে। এটি আমাদের দেশের জন্য অতীব লক্ষণীয় বিষয়।

বড় আকারের জলাভূমি রয়েছে দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে। যেমন : খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ প্রভৃতি এলাকার বিস্তীর্ণ স্থানে বঙ্গোপসাগর ও নদীনালার পানি সারা বছরই জমা থাকে। চট্টগ্রাম ও মংলাতে দেশের দুটি বৃহৎ সামুদ্রিক বন্দর রয়েছে। উভয় বন্দর দেশের সমুদয় সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এসব এলাকায় প্রচুর মাছের চাষ হয়।

কক্সবাজারে ১৫৫ কিলোমিটার সমুদ্র সৈকত রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত বিস্তৃত সমুদ্র সৈকত ও কক্সবাজার শহরকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

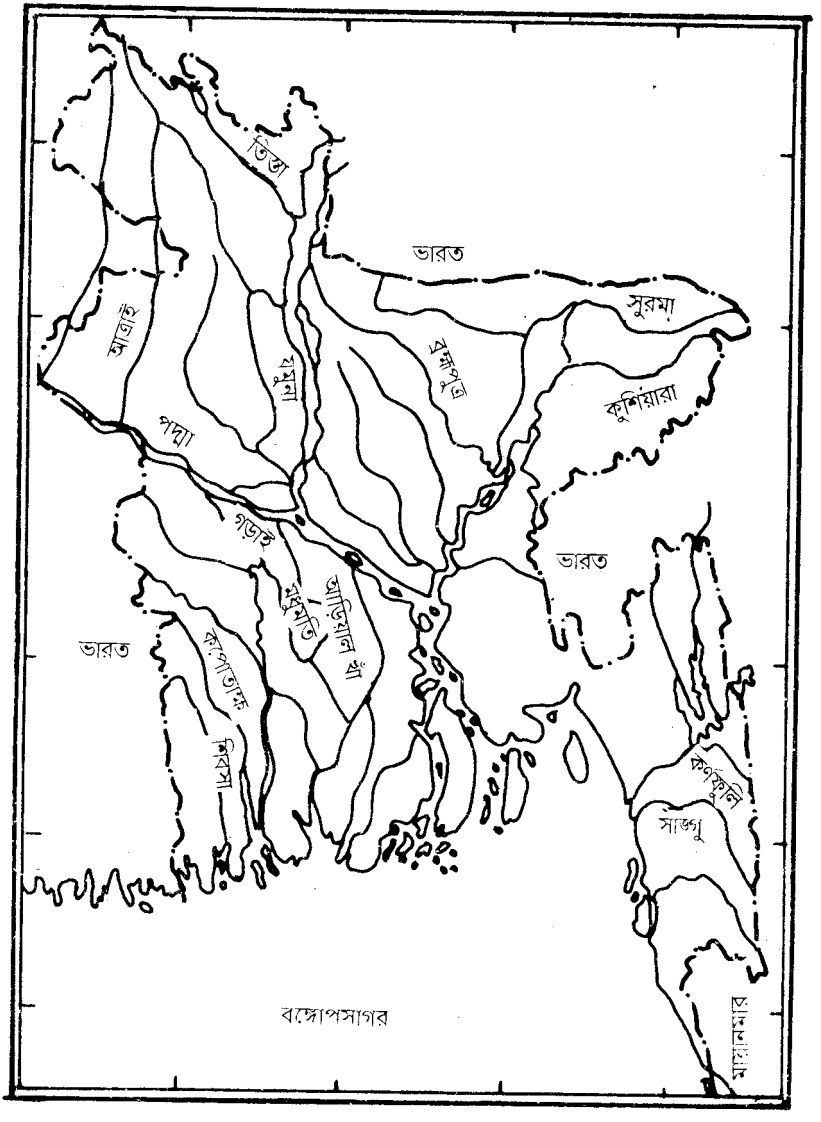

চিত্র ২.১ : বাংলাদেশের মানচিত্রে নদী পদ্ধতির বিস্তার প্রদর্শন।

২.৫ বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা (River Systems in Bangladesh)

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ একথাটি সর্বজনস্বীকৃত। আবার এটিও ঠিক যে, বড় বড় কোনো নদীরই উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশে নয়। বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর ৮% ক্যাচমেন্ট এলাকা আছে বাংলাদেশে এবং অবশিষ্ট আছে সুদূর হিমালয় পর্বত এবং ভারতে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী। এগুলোর অসংখ্য উপনদী ও শাখানদী রয়েছে। কর্ণফুলী, সাঙ্গু ও মাতামুহুরী দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে প্রবাহিত নদীগুলোর অন্যতম। দেশের প্রধান প্রধান নদী হলো পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী প্রভৃতি। এই নদীসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :

(১) পদ্মা (Padma) : এটি বাংলাদেশের প্রধান নদী। এটি গঙ্গা নামে মধ্য হিমালয়ের গংগোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। পরে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে রাজমহল পাহাড়ের নিকট পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করেছে। রাজশাহী অঞ্চলের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে এটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নামে অভিহিত হয়েছে এবং ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের সীমানা বরাবরে এসে কুষ্টিয়ার উত্তর প্রান্তে ধাবিত হয়েছে।

পদ্মা গোয়ালন্দের কাছে যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এর মিলিত ধারা পদ্মা নামেই দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে মেঘনার সাথে মিশেছে। অতঃপর তিন নদীর মিলিত স্রোত মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দক্ষিণে প্রবাহিত পদ্মার শাখা নদীগুলোর মধ্যে ভৈরব, গড়াই, মধুমতি, আত্রাই, আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভৈরব নদীর শাখা নদীগুলো হলো কপোতাক্ষ, শিবসা ও পশুর নদী। উত্তরে পদ্মা নদীর একমাত্র শাখা নদী হচ্ছে বড়াল। উত্তর দিক থেকে উপনদীগুলোর মধ্যে মহানন্দা প্রধান। ২.১ চিত্রে বাংলাদেশের মানচিত্রে দেশের নদী পদ্ধতির বিস্তার দেখানো হয়েছে।

(২) ব্রহ্মপুত্র নদী : এই নদী হিমালয় পর্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের একটি হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সেখান থেকে এটি তিব্বত ও আসামের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রংপুর অঞ্চলের কুড়িগ্রামের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদী ময়মনসিংহ অঞ্চলের দেওয়ানগঞ্জের কাছে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি যমুনা নামে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। ভারতে গঙ্গার একটি উপনদীও যমুনা নামে প্রবাহিত। অপর শাখাটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরবের নিকট মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। প্রায় ২০০ বছর আগে এটিই ব্রহ্মপুত্রের মূলগতিপথ ছিল। মূলত ১৭৮৭ সালে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্রের মূল ধারার গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছিল। ব্রহ্মপুত্রের মূল উৎস থেকে এটির দৈর্ঘ্য মোট ২৭৩৭ কিলোমিটার। বাংলাদেশের ভিতরে এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭৭ কিলোমিটার।

(৩) মেঘনা (Meghna) **নদী :** ভারতের নাগা-মনিপুর জলবিভাজিকার দক্ষিণ ঢালে উৎপন্ন বরাক নদী সিলেট সীমান্তে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উত্তরের শাখা সুরমা পশ্চিম দিকে ছাতক, সিলেট ও সুনামগঞ্জের উপর দিয়ে সর্পিল গতিতে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে অগ্রসর হয়েছে। অতঃপর

আজমিরিগঞ্জের কাছে এটি কালনি নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এটির প্রধান অংশ প্রথমে বিবিয়ানা এবং পরে কালনি নামে আজমিরিগঞ্জের প্রান্তে কালনির সাথে মিলিত হয়েছে। সুরমা, কুশিয়ারার মিলিত প্রবাহ কালনি নামে দক্ষিণে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। মেঘনা পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে। অতঃপর এটি চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

মেঘনা নদীর প্রবাহকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। মেঘনার উপরের অংশ (Upper Meghna), যা কুলিয়ারচর হতে ষাটনল পর্যন্ত বিস্তৃত। নদীর এই অংশের প্রশস্ততা কম। ষাটনল হতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নদীকে মেঘনার নিম্নাংশ (Lower Meghna) বলে। নদীর এই অংশ অত্যন্ত প্রশস্ত।

মেঘনার উপনদীগুলো হচ্ছে, তিতাস, ধনাগোদা, মতলব, গোমতি, হাওড়া, কাসনি, সোনাইমুড়ি, বুড়িমঙ্গল, কাকলি প্রভৃতি। এই উপনদীগুলোতে বন্যার প্রবণতা বেশি। জাঙ্গালিয়া, ডাকাতিয়া প্রভৃতি মেঘনার শাখা নদী।

(৪) যমুনা (Jamuna) **নদী :** এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। এই নদী বেশ চওড়া, যার মাত্রা ৩ থেকে ৫ কিলোমিটার। তিন দশক ধরে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করার পরিকল্পনা থাকলেও তা বাস্তবে রূপ পেল ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন। এটি আমাদের দেশের জন্য গৌরবের বিষয়। এই সেতুটি 'বঙ্গবন্ধু সেতু" হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এটিকে অন্য কথায় "যমুনা বহুমুখী সেতু"ও বলা হয়। সেতুটির প্রশস্ততা প্রায় ১৮ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিলোমিটার। যমুনা সেতুর উপর দিয়ে রেল ও সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা ছাড়াও গ্যাস ও বিদ্যুৎ যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে।

বর্ষাকালে যমুনা সেতুর নিচে নদীর বেশ নাব্যতা থাকে কিন্তু শীতকালে চর পড়ে নদীর জলভাগ শীর্ণকায় হয়ে যায়। সে কারণে, সেতুর নিম্নভাগ দিয়ে সারা বছর বড় ধরনের নৌ চলাচল করতে পারে না। যমুনার উপনদী হলো তিস্তা, আত্রাই, ধরলা, করতোয়া প্রভৃতি এবং ধলেশ্বরী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হলো যমুনার শাখা নদী।

(৫) কর্ণফুলী, সাঙ্গু ও ফেনী (Karnaphuli, Shangu and Feni) **নদী :** কর্ণফুলী নদী লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অতঃপর এই নদী (২৭.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কাফালং, হালদা ও বোয়ালখালী কর্ণফুলী নদীর প্রধান উপনদী। কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে দেশের একমাত্র "জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র" স্থাপন করা হয়েছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট, যাতে কোনো পরিবেশ দূষণ ঘটে না।

সাঙ্গু নদী : সাঙ্গু নদী বাংলাদেশ সীমান্তের আরাকান পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অতঃপর এই নদী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপর দিয়ে কর্ণফুলী নদীর মোহনার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

ফেনী নদী : এটি পার্বত্য ত্রিপুরায় উৎপন্ন হয়েছে এবং ফেনী জেলার পূর্ব সীমানা দিয়ে মেঘনার মোহনায় পতিত হয়েছে।

সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রতিটি নদীর উৎপত্তিস্থলই ভারত। নদীর পানি যেহেতু প্রকৃতির দান, তা ব্যবহার করার অধিকার প্রতিটি দেশেরই রয়েছে। যে দেশের উপর দিয়ে এই নদীগুলো প্রবাহিত হয়েছে, সার্ক (SAARC) এর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নদীর পানির প্রবাহ অঞ্চলের সীমানা অনুযায়ী সমভাবে বন্টন করা উচিত। এতে নদীতে পানির নাব্যতা সারা বছর সমান থাকবে এবং নদীতে চর পড়ে এর গতিরোধ হবে না। ২.২ চিত্রে বাংলাদেশের কর্ণফুলী, সাঙ্গু ও ফেনী নদীর প্রবাহিত অঞ্চল দেখানো হয়েছে।

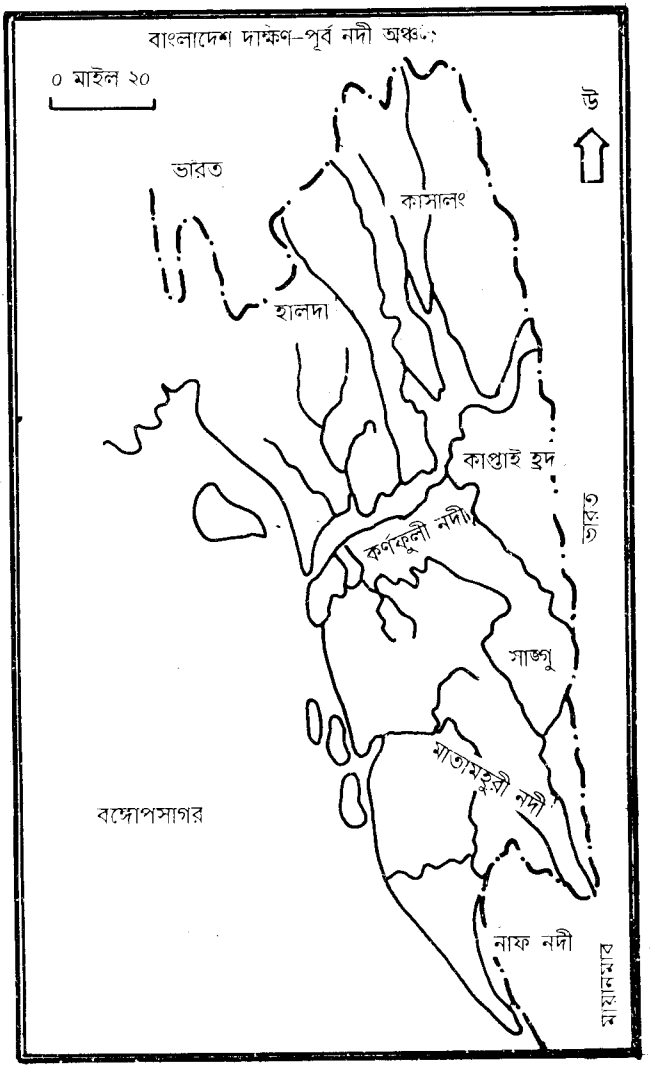

চিত্র ২.২ : বাংলাদেশের কর্ণফুলী, সাঙ্গু ও ফেনী নদীর প্রবাহিত অঞ্চল প্রদর্শন।

২.৬ দেশের ব-দ্বীপ গঠন

বাংলাদেশের উত্তরে যমুনা নদী, পশ্চিমে পদ্মা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান। তাছাড়া অন্যান্য ছোট বড় নদী মেঘনা, সুরমা, মহানন্দা, আড়িয়াল খাঁ, আত্রাই, মধুমতি, টাঙ্গাইল, করতোয়া ইত্যাদি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আষ্টেপৃষ্ঠে ছেয়ে আছে। ফলে দেশের অনেক এলাকারই তিনদিকে পানি এবং মাঝখানে স্থল বিদ্যমান। এতে দেশের অনেক এলাকাই ব-দ্বীপের আকার ধারণ করেছে। যেমন, রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলোতে পাবনা জেলা পদ্মা, ইছামতি ও বড়ালের মধ্যে পড়ে একটি ব-দ্বীপের আকার ধারণ করেছে। তদ্রূপ খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিভাগকে পদ্মা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদী এবং বঙ্গোপসাগর এক একটি ব-দ্বীপে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে ব-দ্বীপ তৈরির নদীগুলো আকারে বড় বিধায় একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের জন্য সেতু অথবা ফেরি সার্ভিস কাজ করছে। যেমন, ঢাকার বুড়িগঙ্গা সেতু, মেঘনা সেতু, সিরাজগঞ্জ ভুয়াপুর ফেরি সার্ভিস, নগরবাড়ি-আরিচা ফেরি সার্ভিস, আরিচা-দৌলতদিয়া ফেরি সার্ভিস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলাদেশে অনেক দ্বীপ রয়েছে। যেমন : সন্দ্বীপ, মহেষখালী, দুবলার চর, হাতিয়া ইত্যাদি। দ্বীপের চারদিকে পানি ও মাঝখানে স্থল থাকে। কিন্তু ব-দ্বীপের তিনদিকে পানি ও মাঝখানে স্থল থাকে বিধায় বাংলাদেশকে একটি বড় আকারের ব-দ্বীপ বলা হয়।

২.৭ দেশের পানি সম্পদ (Water resources of the Country)

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। দেশে বড় বড় নদীগুলোর মধ্যে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, সাঙ্গু ও ফেনী নদী এবং ছোট নদীগুলোর মধ্যে কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতি, আত্রাই, আড়িয়াল খাঁ, কপোতাক্ষ, শিবসা, পশুর, তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই, ধরলা, কুশিয়ারা, কালনি, বিবিয়ানা, হালদা, বোয়ালখালী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এসব নদী থেকে প্রচুর মৎস্য সম্পদ আহরিত হয়। এই নদীর পানি খরা মৌসুমে ফসলের ক্ষেতে সরবরাহ করে কোটি কোটি টাকার ফসল উৎপাদন করা হয়। কর্ণফুলী, পদ্মা ও তিস্তা নদীর পানি ব্যবহার করে ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা এবং মৌসুমে যখন নদীতে পানির প্রবাহ কমে যায় অথবা নদী পানি শূন্য হয়ে যায় তখন সেচ পাম্পের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি উঠিয়ে খাবার পানি এবং সেচকার্যের পানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এজন্য দেশের পানি সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন :

(ক) ভূ-উপরিস্থ পানি (Surface water) এবং

(খ) ভূ-গর্ভস্থ পানি (Under ground water)।

(ক) ভূ-উপরিস্থ পানি (Surface water) : ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস হলো বৃষ্টিপাত, বরফগলা পানি, পাহাড়ি ঢল, বন্যার পানি ইত্যাদি। বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত ও বন্যার টানে নদী, খাল, বিল, হাওড়, পুকুর দিঘি প্রভৃতি ভরে যায়। আবার, যে বছর বৃষ্টিপাত ও বন্যা কম হয় সে বছরে এই জলাশয়গুলো পানি শূন্য অবস্থায় থাকে। তখনই, ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ বেড়ে যায়। আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ বিধায় ভূ-উপরিস্থ পানিকে প্রকল্পের মাধ্যমে

শস্য ক্ষেতে পানি সেচ, খাবার পানি সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কাজে পানি শক্তিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন :

(১) কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Karnaphuli Hydro-electric Power plant) : কাপ্তাইয়ে অবস্থিত কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কর্ণফুলী নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। কর্ণফুলী নদী আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে সিলেটের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে এসে কাপ্তাইয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এটি দেশের সবচেয়ে অধিক খরস্রোতা নদী নামে আখ্যায়িত। পাহাড়ি নদী হিসেবে এতে সারা বছর স্রোত থাকে। তদুপরি এই এলাকায় অধিক বৃষ্টিপাত হয় এবং বরফ গলা পানি ও বন্যার পানির ঢল নামে বলে এর খরস্রোত সর্বদাই থাকে। বাঁধ দেয়ার ফলে পানি বাঁধে আটকে গিয়ে পানির উচ্চতা বা পানির হেড তৈরি হয়। ২.৩ চিত্রানুযায়ী বাঁধের চাপবিশিষ্ট পানিকে যখন চ্যানেল বা পেনস্টক (channel or penstock) এর মধ্যে দিয়ে সরবরাহ করা হয় তখন পানির গতিবেগ আরও বেড়ে যায়। এই খরস্রোত বিশিষ্ট পানি শক্তি যখন বাঁধের তলদেশে স্থাপিত ওয়াটার টারবাইন (water turbine)-কে আঘাত করে তখন পানি শক্তি (water energy) যান্ত্রিক শক্তি (mechanical energy) তে রূপান্তরিত হয়।

ওয়াটার টারবাইন শ্যাফটের সাথে বৈদ্যুতিক জেনারেটরের সংযোগ থাকে। ফলে ওয়াটার টারবাইনের সাথে বৈদ্যুতিক জেনারেটর ঘূর্ণনগতি প্রাপ্ত হয় এবং বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে। ফলে, টারবাইনের যান্ত্রিকশক্তি জেনারেটরের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

চিত্র ২.৩ : কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্পিলওয়ে।

কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৫টি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট রয়েছে। যেগুলোর ক্ষমতা ২টির ৪০ × ২ = ৮০ এবং ৩টির ৫০ × ৩ = ১৫০ মেগাওয়াট। সুতরাং এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট। দেশের পানি সম্পদ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন

এটিই প্রথম এবং ব্যাপক। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্পিল ওয়ে (Spill way)-এর মাধ্যমে, যে পানি বেরিয়ে যায়, তার দ্বারা ভাটিতে হাজার হাজার একর জমিতে পানি সেচ করে লক্ষ লক্ষ টাকার ফসলও উৎপন্ন করা হচ্ছে। ২.৩ চিত্রে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিতাড়িত পানি নির্গত হওয়ার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্পও বলা হয়। কারণ এই প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ কার্য ও মৎস্য চাষ এই ত্রিমুখী কার্যসম্পাদন করা হয়।

এই প্রকল্পটি চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর সেচ কার্য দ্বারা ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ এবং প্রায় ১৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা হয়। ফলে চট্টগ্রাম শহর ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কাপ্তাইয়ে সৃষ্ট এ বাঁধের ফলে কাপ্তাই হ্রদের পানিতে সেচের সাহায্যে রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলে প্রতিবছর দুটি ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এ প্রকল্পটি ১৯৬২ সনে স্থাপিত এবং এটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ৪৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

(২) গঙ্গা কপোতাক্ষ প্রকল্প : পাবনা হার্ডিঞ্জ সেতুর নিচ হতে ভেড়ামারার নিকটে পদ্মা নদীর পাশে প্রশস্ত খাল কেটে এই প্রকল্পটি স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় জাপানের হিটাচি কোম্পানি এই প্রকল্পটি স্থাপন করে। এই প্রকল্পের প্রধান খালে পানির মাত্রা থাকে কমপক্ষে ১৩ ফুট (৪.৩ মিটার)। যে দালানে ৩টি পানি সরবরাহের সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প সংযুক্ত আছে, সেটি মাটির নিচে ১০ তলা বিল্ডিং-এর আর. সি. সি কাঠামোর মধ্যে ধারণ করা আছে। পদ্মার পানি লেভেল সর্বনিম্ন হলেও এই প্রকল্পের পাম্পের নিচে পানি থাকে। পাম্প থেকে পানি সরবরাহের খাল ২৬ ফুট (৮.৫ মিটার) উপরে অবস্থিত। সেখান থেকে অল্প ঢালু অবস্থায় কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার খালগুলোতে পানি সরবরাহ করা হয়। এই প্রকল্পটি ৩,০০,০০০ একর জমিতে পানি সেচ করতে সক্ষম। সুতরাং এ প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ৯৮ হাজার হেক্টর জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য পানি সেচ করা হয় এবং বছরে তিনটি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। তবে পদ্মা নদী দিন দিন শুকিয়ে ও চর পড়ে যাবার কারণে এই প্রকল্পটির পানি সরবরাহ কাজ চরম ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৫৭ সালে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও মূলত ১৯৭০ সালের দিকে এর সেচ কার্য শুরু হয়। প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। প্রকল্পের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ : (অ) গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পে তিনটি পাম্প সেট আছে। এই পাম্প চালানোর জন্য সিংক্রোনাস মোটর ব্যবহৃত হয়। মোটরের ক্ষমতা ২.৮ মেগাওয়াট, পাম্পের পানির হেড থাকে ২৬ ফুট (৮.৫ মিটার) এবং এটি প্রতি সেকেন্ডে ১৭০০ মিটার কিউব ($1700\ M^3/sec$) পানি সরবরাহ করতে সক্ষম।

(আ) এ প্রকল্পটির মাধ্যমে পানি সেচ করা হয় কুষ্টিয়া, যশোর, মেহেরপুর, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ এর বিস্তীর্ণ এলাকায়। প্রকল্পটি প্রায় ৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে পানির চাহিদা মেটাতে সক্ষম। পানি সেচ ব্যতীত এর দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন কার্যাবলি সম্পাদন করা যায়। তবে পদ্মায় পানির স্তর খরা মৌসুমে একেবারেই কমে যাওয়ায় এই প্রকল্পটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে এই প্রকল্প দ্বারা পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ব্যাহত হচ্ছে।

(৩) তিস্তা বাঁধ প্রকল্প : রংপুর জেলার গাদমারিতে এ প্রকল্পটি স্থাপন করা হয়েছে। স্তা নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি সম্পদ ধারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখান থেকে পাম্প করে নি বিভিন্ন খালের মধ্য দিয়ে সরবরাহ করা হয়। এই পানি দ্বারা রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া লার প্রায় ৫,৪৬,০০০ (পাঁচ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার) হেক্টর জমিতে ফসল উৎপন্ন করা ব। তদুপরি এই প্রকল্প দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন রতে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

(৪) ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা সেচ প্রকল্প (Dhaka-Narayanganj-Demra rigation Project) : এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য জলসেচের মাধ্যমে জমির উৎপাদন মতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পাম্পের সাহায্যে পানি নিষ্কাশন করা। রাজধানী ঢাকা শহরের ক্ষিণ পূর্ব এলাকা এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। এই প্রকল্পের ফলে ৫ হাজার হেক্টর জমি ্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং ৮ হাজার হেক্টর জমিতে ফসল উৎপাদনে পানি সেচের বস্থা নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের পানি বিশোধন করে খাবার পানি হিসেবেও ব্যবহার করা ছে।

(৫) বেড়া পাম্পিং স্টেশন (Bera Pumping Station) : পাবনা জেলার বেড়াতে ই সেচ প্রকল্পটি স্থাপিত হয়েছে। হুড়াসাগর, আত্রাই ও ইছামতি নদীর সংগমস্থলের ন্নিকটে এই প্রকল্পটি স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পটিতেও গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের ল্প হাউজের মতো মাটির নিচে ৫/৭ তলা বিল্ডিং করা হয়েছে। এখানে ৫টি স্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প কাজ করে প্রতি সেকেন্ডে ১৫০০ ঘনফুট (৪৫ ঘনমিটার/সেকেন্ড) নি সরবরাহ করা হচ্ছে। এই পানি সম্পদ ব্যবহার করে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ াকায় হাজার হাজার একর জমিতে ফসল উৎপন্ন করা হচ্ছে। এর দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সাবদ্ধতাও দূর হচ্ছে।

(৬) চাঁদপুর জলসেচ প্রকল্প (Chandpur Irrigation Project) : এই প্রকল্পটি মিল্লা-চট্টগ্রাম বহুমুখী প্রকল্প নামে পরিচিত। এটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হলো চাঁদপুর লা, নোয়াখালী, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, রায়পুর প্রভৃতি এলাকায় পানি সেচের ব্যবস্থা করা। ানে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০ হাজার হেক্টর জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মূল রিকল্পনাটিতে ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন তে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৬০ কোটি টাকা।

এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন এলাকায় আরও অনেকগুলো ছোট ও মধ্যম সেচ প্রকল্প ছে এবং কিছু কিছু বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে। যেমন : মুহুরী সেচ প্রকল্প, মনু নদী ল্প, ফরিদপুর সেচ প্রকল্প, গোমতি সেচ প্রকল্প, রাজশাহী-পাবনা-বগুড়া সেচ প্রকল্প, শাল-পটুয়াখালী প্রকল্প, সাজু নদী প্রকল্প, টজু নদী প্রকল্প, মেঘনা উপত্যকা প্রকল্প ভৃতি। এই প্রকল্পসমূহের পানি দ্বারা প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টন মৎস্য সম্পদও উৎপন্ন করা ছে। সমুদ্রের পানি সম্পদ থেকে দেশে অনেক জায়গাতেই লবণ তৈরির কারখানা স্থাপিত য়েছে। খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, পটুয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি এলাকায় অনেকগুলো লবণ তৈরির খানা রয়েছে। তদুপরি, সমুদ্র উপকূলে শত শত একর জমিতে গলদা চিংড়ি চাষ করা ছে।

(খ) ভূ-গর্ভস্থ পানি (Under ground water) : বৃষ্টির পানি, বরফগলা পানি, বন্যার পানি প্রভৃতি মাটি ছুঁইয়ে ভূ-গর্ভে জমা হয়ে পানির আস্তরণ (water layer) সৃষ্টি করে। এই পানি ভূ-গর্ভস্থ পানি বলে সাধারণত পানির স্তর ভূমির উপর থেকে ১০-১১ মিটার বা ৩০ থেকে ৩৪ ফুট নিচে অবস্থান করে। এই স্তর বন্যার সময় উপরে আসে। আবার কোনো কোনো এলাকায় পানির স্তর ১০০ থেকে ২৫০ মিটার গভীরে অবস্থান করে। বিভিন্ন ধরনের পাম্পের মাধ্যমে এই পানিকে টেনে উপরে তুলে খাবার পানি হিসেবে, সেচের পানি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। এ কাজে হাতে চালিত বৈদ্যুতিক মোটর অথবা ইঞ্জিন চালিত বিভিন্ন ধরনের পানির পাম্প ব্যবহার করা হয়, যেমন :

(১) লিফট পাম্প বা টিউবওয়েল (Lift pump or tube well) এবং

(২) ফোর্স পাম্প (Force pump)।

ফোর্স পাম্প আবার তিন প্রকার, যথা :

(অ) সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প (Centrifugal pump),

(আ) রেসিপ্রোকেটিং পাম্প (Reciprocating pump),

(ই) টারবাইন পাম্প (Turbine pump) প্রভৃতি।

গ্রামে ও শহরে লিফট পাম্প বা টিউব ওয়েল, সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প, রেসিপ্রোকেটিং এবং টারবাইন পাম্প ব্যবহার করে ভূ-গর্ভস্থ পানি তুলে খাবার পানি ও সেচের পানি হিসেবে যোগান দেয়া হয়। এ কাজে ব্যবহৃত পাম্প হিসেবে গভীর নলকূপ ব্যবহার করা হয়। নিমজ্জিত প্রকৃতির (Submersible type) সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প এবং টারবাইন পাম্পকেই গভীর নলকূপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মাটির গভীর তলদেশ থেকে পানি উত্তোলন এবং কার্যকর সরবরাহের জন্য টারবাইন পাম্প খুবই উপযোগী। এই পাম্প আবার দুই প্রকার,
যথা :

(১) গভীর নলকূপ প্রকৃতির (Deep well type) টারবাইন পাম্প এবং

(২) নিমজ্জিত প্রকৃতির (Submersible type) টারবাইন পাম্প।

গভীর নলকূপে সাধারণত গভীর নলকূপ প্রকৃতির টারবাইন পাম্প ব্যবহৃত হয়। ২.৪ চিত্রে গভীর নলকূপ প্রকৃতির টারবাইন পাম্প দেখানো হয়েছে। এই পাম্পকে সাধারণত বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা চালানো হয়। পাম্পের শ্যাফট ও গভীর নলকূপের কেসিংটি খাড়াভাবে বোরিং (boring) করে স্থাপন করা হয়। পানি বিদ্যুৎসহ অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পানি সেচ প্রকল্প, শিল্প প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা এবং শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পানি সরবরাহ করার জন্য গভীর নলকূপ জনপ্রিয়তার সাথে ব্যবহার করা হয়।

তবে, খাবার পানি এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহারের পানি হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে অনেক সময় আর্সেনিক (Arsenic) থাকে, যা জীবজন্তুর শরীরের জন্য ভয়াবহ। সেজন্য দেশের উন্নয়ন কাজে সর্বস্তরে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

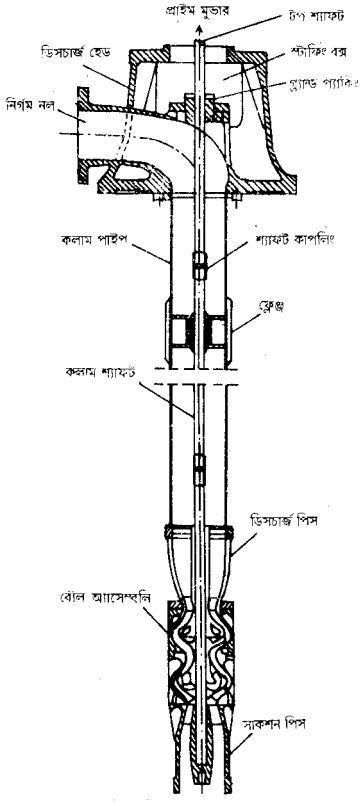

চিত্র ২.৪ : গভীর নলকূপ প্রকৃতির টারবাইন পাম্প দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও সরবরাহ।

র শক্তি সম্পদ (Energy Resources of the Country)

া পদার্থের মধ্যে কাজ করার শক্তি নিহিত থাকে, তাকে শক্তির উৎস (Sources of বলে। পৃথিবীতে নিম্নবর্ণিত ১২ (বারো) প্রকার শক্তি সম্পদ রয়েছে। যেমন :

জ্বালানি (Fuels), এটি আবার তিন প্রকার, যথা :

) **কঠিন জ্বালানি** (Solid fuels),

) **তরল জ্বালানি** (Liquid fuels) ও

) **গ্যাসীয় জ্বালানি** (Gaseous fuels)।

সৌর শক্তি (Solar energy),

সামুদ্রিক জোয়ার ভাটা ও তরঙ্গ (Ocean tides and waves),

৪। ধাবমান জলস্রোত (Flowing Streams of water),

৫। বাতাসের শক্তি (Wind energy),

৬। ভূ-গর্ভস্থ শক্তি,

৭। পারমাণবিক শক্তি (Nuclear energy),

৮। থার্মো আয়োনিক কনভার্টর,

৯। এম. এইচ. ডি. শক্তি (M. H. D. energy),

১০। থার্মো ইলেকট্রিক শক্তি (Thermo-electric energy),

১১। জ্বালানি সেলের শক্তি (Fuel cell energy) এবং

১২। বায়ো গ্যাস (Bio-gas) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে নিম্নবর্ণিত শক্তির উৎস আছে, যা ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।

১। জ্বালানি (Fuels)

(ক) কঠিন জ্বালানি (Solid fuels) : কাঠ, কয়লা, চারকোল প্রভৃতি কঠিন জ্বালানির আওতাভুক্ত। খুলনা জেলার সুন্দরবন, ময়মনসিংহ জেলার ভাওয়ালের গড়, টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরের গড়, চট্টগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। সিলেট, রংপুর ও দিনাজপুর এলাকায় কয়লার খনি আছে। এগুলো ব্যবহার করে জ্বালানির চাহিদা মেটানো হচ্ছে। দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়াতে কয়লা ব্যবহৃত ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বাষ্পীয় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) তরল জ্বালানি (Liquid fuels) : পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি তরল জ্বালানির আওতাভুক্ত। দেশের পূর্বাঞ্চলে কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালী, সীতাকুণ্ডু প্রভৃতি এলাকায় যেখানে গ্যাসের খনি পাওয়া গেছে সেখানে গ্যাস আহরণ করতে গিয়ে পেট্রোলিয়াম বা তরল জ্বালানি পাওয়া যায়। এই জ্বালানি বিভিন্ন ইঞ্জিন, চুল্লি, ইটের ভাটা প্রভৃতিতে জ্বালানি শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কয়লা ও তরল জ্বালানি ব্যবহার করলে পরিবেশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(গ) গ্যাসীয় জ্বালানি (Gaseous fuels) : দেশের পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহে প্রায় ১৪টি গ্যাস খনি পাওয়া গেছে। পাওয়ার প্ল্যান্ট, রান্নার কাজে, হোটেলে, সারকারখানায় এই গ্যাসকে জ্বালানি হিসেবে জনপ্রিয়তার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯৯৩ এর তথ্য মোতাবেক দেশে ২১.৩০ ট্রিল কিউবিক ফুট গ্যাস জমা আছে। গ্যাসীয় জ্বালানি ব্যবহারে পরিবেশ অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পৃথিবীতে সঞ্চিত গ্যাস।

দেশ	মজুদ গ্যাসের পরিমাণ (TCF)	মজুদের শতকরা হার
(১) সোভিয়েত ইউনিয়ন (পূর্বের)	১৬০০	৩৮.০২%
(২) ইরান	৬০০	১৪.২৭%

আবুধাবী	১৮৩	৪.৩৪%
সৌদি আরব	১৮০	৪.২৮%
বাংলাদেশ	৩৩.৭৩	০.৮০%
পৃথিবীর মোট :	৪২০৪	১০০%

বাংলাদেশে গ্যাস সঞ্চালন লাইন স্থাপনের জটিলতায় এই গ্যাস দেশের সব মানুষ ব্যবহার করতে পারছে না। তবে, এই সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। ১৯৯৩ এর ধ্য মোতাবেক বাংলাদেশে তরল ও বায়বীয় জ্বালানি ব্যবহার করে যে ২৬টি তাপ বিদ্যুৎ ন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল, সেগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা সর্বমোট ২৩৭৮ মেগাওয়াট। এগুলো ছ ডিজেল, বাষ্পীয় এবং গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সবগুলোই ছু না কিছু পরিবেশ দূষণ ঘটায়। অপর একটি দূষণবিহীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে, যার পাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট, সেটি হলো কাপ্তাইয়ে স্থাপিত পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। তাপ দ্যুৎ কেন্দ্রে বিভিন্ন মোটরযান থেকে নির্গত গ্যাসের দূষণ রোধ করার জন্য মূলত ১৯৬৩ ল থেকে প্রচেষ্টা চলছে। এ কাজে ক্যাটালিটিক প্রকৃতির প্রজ্জ্বলন যন্ত্র (catalytic type ter burners) ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রটি স্বাভাবিক উপায়ে প্রজ্জ্বলিত জ্বালানির পুনরায় জ্জ্বলন ঘটায়।

প্রকৃতপক্ষে ইঞ্জিনের দহন প্রকোষ্ঠ থেকে অপোড়া গ্যাস বেরিয়ে যায় বলেই সে গ্যাসের থে ৯৪% কার্বন মনোক্সাইড CO) এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস থাকে। াটালিটিক কনভার্টার-এর মাধ্যমে গ্যাস নির্গত হলে এই গ্যাসে পরিবেশ দূষণ করে এমন তিকারক কিছু থাকে না।

২। **সৌর শক্তি** (Solar energy) : বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূর্য হলো শক্তির প্রধান উৎস। সূর্যের াপ ও আলোকে যথাক্রমে সৌরশক্তি ও সৌর আলো বলে। সৌর তাপ দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্য কানো, পরিধেয় বস্ত্র শুকানো প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। সৌর চুল্লির মাধ্যমে কানো কিছু গরম করা এবং ভাত রান্না করা হয়। সৌর তাপ জমা করে ব্যাটারির মাধ্যমে ্যালকুলেটর, ঘড়ি চালানো যায়। সৌরশক্তি ব্যবহার করে দেশ ও বিদেশে মোটরযান লানোরও ব্যবস্থা হচ্ছে। সৌরশক্তি ব্যবহারের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। ইতোমধ্যে ৌরশক্তি ব্যবহারের নানা প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। সৌরশক্তি চালিত যন্ত্রাদি নিম্নরূপ :

(ক) সৌরচুল্লি (Solar heater), (খ) সৌর মোটর (Solar motor), (গ) সৌরঘড়ি Solar watch), (ঘ) সৌর ব্যাটারি (Solar battery), (ঙ) সৌর শুষ্কীকরণ যন্ত্র (Solar rier), (চ) সৌর রেফ্রিজারেটর (Solar refrigerator), (ছ) সৌর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র Solar Air conditioner) ইত্যাদি।

৩। **ধাবমান জলস্রোত** (Flowing Streams of Water) : খরস্রোতা নদীর পানি এক কার শক্তির উৎস। পাহাড়ি এলাকার খরস্রোতা নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে পানিতে ক্তি ধারণ করানো হয়। বাঁধে এবং ক্যাচমেন্ট এলাকায় (catchment area) পানির চ্চতা ও পরিমাণ যত বেশি হবে, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতা তত বেশি হবে। কাপ্তাই

পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত টারবাইনগুলোর নাম হলো কাপলান টারবাইন (Kaplan turbine), যার প্রতিটির ওজন প্রায় ৪৫ টন। এই পানি শক্তির ধাক্কাতেই টারবাইন ঘূর্ণন গতিপ্রাপ্ত হয়।

বাঁধের মধ্যে পেনস্টকের মধ্য দিয়ে যখন এই পানি শক্তিকে সরবরাহ করা হয় তখন এই পানির ধাক্কায় টারবাইন ঘুরে পানি শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করে। পরক্ষণে টারবাইন শ্যাফট সংলগ্ন বৈদ্যুতিক জেনারেটর ঘূর্ণনগতিপ্রাপ্ত হলে যান্ত্রিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ২.৫ চিত্রে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পানি শক্তির ব্যবহার দেখানো হয়েছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে পাঁচটি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট রয়েছে যা থেকে ২৩০ মেগাওয়াট এবং ওভার লোডে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের এই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র দ্বারা কোনো পরিবেশ দূষণ ঘটে না। তবে, বাংলাদেশে একটি পাহাড়ি খরস্রোতা নদী রয়েছে, এটির নাম কর্ণফুলী। এ ধরনের আরো ২/১টি নদী বেশি থাকলে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সহায়ক হতো।

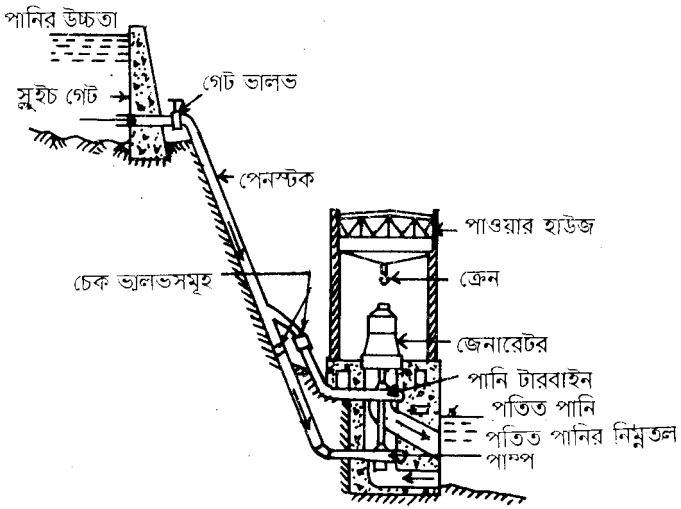

চিত্র ২.৫ : কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পানি শক্তির ব্যবহার।

৪। **বায়ু শক্তি** (Wind energy) : প্রবল বাতাসের শক্তির ধাক্কায় বাতাস টারবাইন বা বাতচক্র চালানো যায়। এই বাতচক্রের চার বা আটটি ব্লেড বা পাখা থাকে। প্রতি ঘন্টায় ১০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগের বাতাস দ্বারা এই বাতচক্রকে ঘুরানো হয়। চক্র ঘুরলে শ্যাফটের সাথে গিয়ারের সমন্বয়ে পানির পাম্প অথবা বৈদ্যুতিক জেনারেটর ঘূর্ণনগতিপ্রাপ্ত হয়। ফলে এর দ্বারা পানির পাম্প ঘুরে পানি সরবরাহ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর ঘুরে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে। ২.৬ চিত্রে বাতাস শক্তির ব্যবহারে বাতচক্র এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর চালানোর দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এ ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিটের

ক্ষমতা কম হলেও এটিতে কোনো পরিবেশ দূষণ ঘটে না। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে এ ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায়।

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল অঞ্চল, যেমন : কক্সবাজার, পতেঙ্গা প্রভৃতি এলাকায় সারা বছর বাতাসের প্রবাহ থাকে। এই এলাকায় ফাল্গুন, চৈত্র মাসের দিকে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস প্রবাহিত হয়। সেখানে শত শত বাতচক্র চালিয়ে পানি সেচের পাম্প চালানো হচ্ছে। ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের বাতচক্র প্রজেক্ট ব্যবহার করে পানির পাম্প চালানো হচ্ছে।

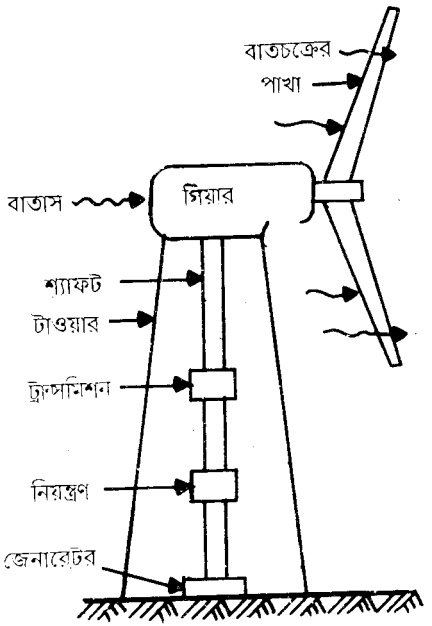

চিত্র ২.৬ : বাতচক্রে বায়ু শক্তির ব্যবহার।

(৫) পারমাণবিক শক্তি (Nuclear energy) : পারমাণবিক জ্বালানিকে কাজে লাগিয়ে বাষ্পীয় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয়। পারমাণবিক জ্বালানি বলতে ইউরেনিয়াম ২৩৫-কে বুঝায়। পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের মধ্যে যখন কন্ট্রোল রডের মাধ্যমে বিক্রিয়া ঘটানো হয় তখন এর মধ্যে প্রচুর তাপ শক্তির উদ্ভব ঘটে। রিয়্যাক্টরকে শীতল করতে শীতক (coolant) ব্যবহৃত হয়।

এই শীতক হিসেবে হালকা পানি ব্যবহৃত হয়। শীতক রিয়্যাক্টরকে ঠাণ্ডা করতে এসে নিজেই অধিক উত্তপ্ত হয়ে যায় এবং এ তাপে বয়লারের পানি বাষ্পে পরিণত হয়। এ বাষ্পের ধাক্কায় বাষ্প টারবাইন চালিত হয়। টারবাইন শ্যাফটের সাথে সংযুক্ত টার্বোজেনারেটর

(Turbo-generator) চালিত হলে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। ১ কেজি পারমাণবিক জ্বালানিতে ২২০০ টন তেল অথবা ৪৫০০ টন কয়লা প্রজ্জ্বলনের তাপশক্তির সমান তাপশক্তি পাওয়া যায়। এজন্য আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র খুবই লাভজনক।

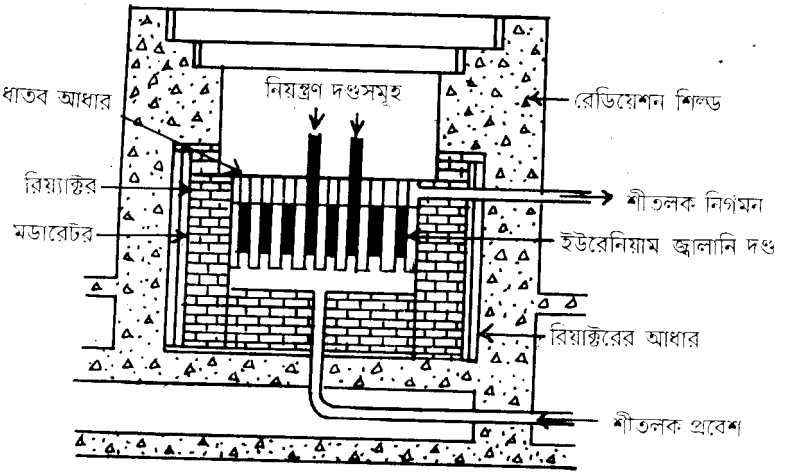

চিত্র ২.৭ : পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পারমাণবিক জ্বালানি শক্তির ব্যবহার।

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের সাভারে ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এটি গবেষণামূলক একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ২.৭ চিত্রে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পারমাণবিক জ্বালানি শক্তির ব্যবহার দেখানো হয়েছে। তবে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিশ্বপরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমার আঘাতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেছে, বিকলাঙ্গ হয়েছে এবং বায়ুমণ্ডলে সেই বোমার তেজস্ক্রিয়তার মধ্যে এখনও মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র অথবা পারমাণবিক চুল্লির লিকেজের কারণে গোটা বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ শক্তির উৎস হচ্ছে কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, খরস্রোতা পাহাড়িয়া নদী ও পারমাণবিক শক্তি। দেশের প্রধান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বলতে সিদ্ধিরগঞ্জের পাওয়ার স্টেশন, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন, চট্টগ্রাম গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বাষ্প বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বরিশাল গ্যাস টারবাইন কেন্দ্র, হরিপুর গ্যাস টারবাইন কেন্দ্র, ভেড়ামারা গ্যাস টারবাইন কেন্দ্র, গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি গ্যাস টারবাইন কেন্দ্র, রাজশাহী ডিজেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, দিনাজপুর ডিজেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সাভার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদিকে বুঝায়।

এদেশে প্রায় ১৩ কোটি লোকের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাত্রা মাত্র ২৫৫০ মেগাওয়াট। এতে মাথা পিছু বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের মাত্রা গড়ে প্রায় ০.২ কিলোওয়াট। অপরদিকে, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে প্রায় ১০০ কোটি জনসংখ্যার বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের মাত্রা প্রায় ৫,০০০ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, যুক্তরাজ্যে এর মাত্রা সবচেয়ে বেশি, আমেরিকার স্থান দ্বিতীয়, জার্মানি তৃতীয়, ফ্রান্স চতুর্থ ও জাপান পঞ্চম স্থানে রয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয় মাত্র ২৮১৮ মেগাওয়াট ও পিকলোড ২২৫০ মেগাওয়াট। দেশের প্রায় ১/৬ অংশে এখনও বিদ্যুৎ শক্তি পৌঁছায় নি।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক শক্তি সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস উল্লেখযোগ্য স্থানে এবং কয়লার স্থান দ্বিতীয়, পিট কয়লা তৃতীয়, এছাড়াও জ্বালানি তেল, বায়োগ্যাস এবং পানি শক্তি রয়েছে। জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করলে পরিবেশের দূষণ ঘটে। কিন্তু বায়ু শক্তি (Wind energy), সৌরশক্তি (Solar energy), পানি শক্তি (Water energy) ইত্যাদির মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করলে পরিবেশ দূষিত হয় না বরং অতি কম খরচে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা যায়। পৃথিবীতে বায়ুশক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ু শক্তি দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তির খতিয়ান নিম্নরূপ :

আমেরিকা (USA) = ১৭৭০ মেগাওয়াট, ইউরোপ (বিশেষত জার্মানি) = ৮৩৮ মেগাওয়াট, এশিয়া (ভারত) = ৫৬০ মেগাওয়াট। তিনটি মহাদেশে এই খাতে এই তিনটি দেশই সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশে বাতাস শক্তি ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা চলছে এবং জরিপের মাধ্যমে যেখানে অধিক বাতাস শক্তি পাওয়া যায়, ঠিক সেখানেই বাতচক্র (Air turbine) জেনারেটর স্থাপন করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। টেকনাফ, খেপুপাড়া, দক্ষিণ নোয়াখালী, কক্সবাজার, পতেঙ্গা, মহেশখালী, কুয়াকাটা প্রভৃতি স্থানে এ ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র শীঘ্রই স্থাপন করা হচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সৌরশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে। এজন্য দেশের বিজ্ঞানীগণ নিরলস কাজ করে চলেছেন এবং খুব শীঘ্রই সৌরচুল্লিসহ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এখান থেকেও আমরা কম খরচে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার করতে পারবো। বাংলাদেশে বর্তমানে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের মাত্রা নিচে প্রদত্ত হলো :

বাণিজ্যিক (Commercial) সেক্টরে = ৩৫% এবং আবাসিক ও অবাণিজ্যিক (Non-Commercial) সেক্টরে = ৬৫%।

বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থার আরও উন্নতি হলে দেশের জনগণ অধিক হারে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে পারবে।

৬। বায়োগ্যাস (Bio-gas) : কৃষিক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত এটি এমন এক প্রকার সম্ভাবনাময় শক্তি, যা জৈব প্রাণীর মলমূত্র হতে পর্যায়ক্রমে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্বালানি উৎপন্ন করে। মৃত জীবজন্তু, কৃষিজাত ফসলের আবর্জনা, গোবর, আগাছা, কচুরিপানা প্রভৃতি থেকে প্রস্তুতকৃত গ্যাসকে বায়োগ্যাস বলে। এই গ্যাস দ্বারা রান্নার চুল্লি জ্বালানো, বাতি জ্বালানো, সেচ পাম্প চালানো, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি কাজ করা যায়।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, এতিমখানা এবং বসতবাড়িতে ৮/১০টি গরুর মলমূত্র এক স্থানে জ করে এটির উপর একটি ঢাকনা দিলে সেই স্থানে বায়োগ্যাস প্রস্তুত হয়। এই ঢাকনার সা ছিদ্রবিহীন অবস্থায় একটি ছিপিসহ নল সংযুক্ত করা হলে, নলের মুখ দিয়ে বায়ো বা জৈ গ্যাস নিঃসৃত হতে থাকে। এই গ্যাস ব্যবহার করে প্রতিদিন ১৫/২০ জন লোকের রান্না-বা এবং অন্যান্য কাজের জন্য তাপশক্তি পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে বায়োগ্যাসের চাহি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনেক কৃষকই এর উপর জ্ঞান লাভ করে এই গ্যাস থেকে উপকৃ হচ্ছে। এই গ্যাসের কূপ নির্দিষ্ট সময়ান্তরে শুকিয়ে গেলে সেই গোবর শস্য ক্ষেতে সার হিসে ব্যবহার করে পুনরায় এই কূপকে বায়োগ্যাসের কূপ হিসেবে ব্যবহার করা চলে। এজ একাধিক কূপও ব্যবহার করা হয়।

উল্লিখিত বর্জ্য উপকরণ ব্যবহার করে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করলে নিম্নবর্ণিত সুবিধা পাওয়া যাবে, যেমন :

(১) গন্ধযুক্ত বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ ঘটে না।

(২) বিনা বা কম খরচে জ্বালানি ও বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

(৩) এটিকে গ্রামে ও শহরে সব স্থানেই ব্যবহার করা চলে।

২.৯ দেশের খনিজ সম্পদ (Mineral Resources of the Country)

মাটির তলদেশ বা খনি থেকে আহরিত সম্পদকে খনিজ সম্পদ বলে। বাংলাদেশে প্রা খনিজ সম্পদের পরিমাণ সীমিত। কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, শ্বেত মৃত্তিকা, খনিজ তেল চুনাপাথর, চীনামাটি, কঠিন শীলা, আণবিক খনিজ পদার্থ, খনিজ লবণ প্রভৃতি বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :

(১) কয়লা (Coal) : বাংলাদেশে কয়লা সম্পদের প্রাচুর্যতা পূর্বে তেমন ছিল না বর্তমানে আশানুরূপ কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

বগুড়া অঞ্চলের জামালগঞ্জ এবং রাজশাহী অঞ্চলের শিবগঞ্জে উন্নতমানের কয়লা পাওয় গেছে। সিলেট অঞ্চলের লালঘাট ও টেকেরহাট নামক স্থানে লিগনাইট জাতীয় কয়লা পাওয় গেছে। ফরিদপুর অঞ্চলের চান্দা বিল, খুলনা অঞ্চলের কোলাবিলে বিপুল পরিমাণ পী কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে।

এছাড়া কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পীট কয়ল পাওয়া গেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া নামক স্থানে প্রাপ্ত কয়লা উত্তোল ও ব্যবহার করা হচ্ছে। ২.৮ চিত্রে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ প্রাপ্তিস্থান দেখানো হয়েছে।

(২) প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas) : প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের খনিজ সম্পদে মধ্যে অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যন্ত যে কয়টি প্রাকৃতিক গ্যাস খনি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাস খনি সর্ববৃহৎ। দেশের অন্যান্য গ্যাসখনি সিলেটে হরিপুর, রশিদপুর, কৈলাসটিলা, টেংরাটিলা, হবিগঞ্জ, ছাতক, চট্টগ্রামের জলাদি, কুমিল্ল জেলার বাখরাবাদ, নোয়াখালী, বেগমগঞ্জ, সীতাকুণ্ডু এলাকায় অবস্থিত। এসব গ্যাস খনিতে

১৪ লক্ষ ট্রিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস মজুদ আছে। পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য এবং পারমাণবিক কাজে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বস্তুত প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান জ্বালানি।

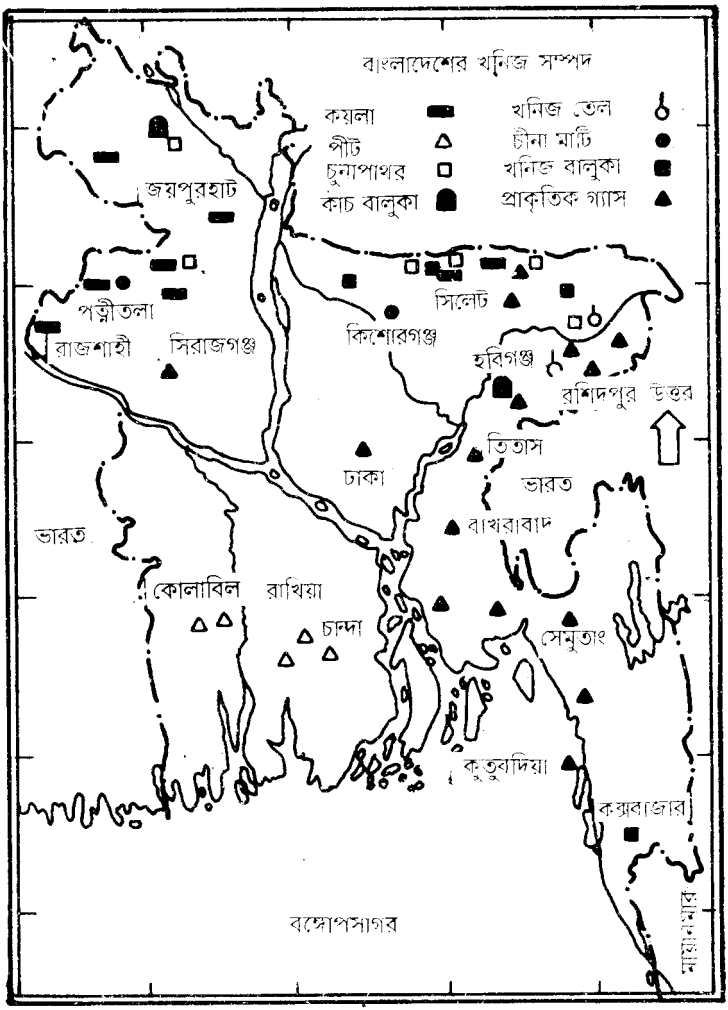

চিত্র ২.৮ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ।

(৩) **খনিজ তেল** (Mineral Oil) : খনিজ তেল বলতে পেট্রোলিয়াম অথবা ক্রুড অয়েলকেই (Petroleum or crude oil) বুঝায়। সিলেট জেলার হরিপুরে খনিজ তেল পাওয়া গেছে। এছাড়া রশিদপুর এবং তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে সামান্য পরিমাণ

খনিজ তেল পাওয়া গেছে। সীতাকুণ্ডে প্রাপ্ত গ্যাস খনিতেও খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। জ্বালানি হিসেবে এই জাতীয় তেল ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৪) **চুনাপাথর** (Limestone) : সিমেন্ট তৈরির কারখানায় চুনাপাথরের ব্যবহার সর্বাধিক। তদুপরি একে বিভিন্ন মূল্যবান সিমেন্ট কংক্রিট (cc) এবং আর. সি. সি প্রস্তুত কাজে ব্যবহার করা হয়। সিলেট অঞ্চলের টেকেরহাটে প্রচুর পরিমাণ চুনাপাথর পাওয়া যায়। এছাড়া উত্তর সিলেটের আরও কয়েকটি স্থানে জয়পুরহাট এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপেও চুনাপাথর পাওয়া যায়।

(৫) **শ্বেত মৃত্তিকা** (Whitish Soil) : চীনামাটির পরিপূরক হিসেবে শ্বেত মৃত্তিকা ব্যবহৃত হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত বিজয়পুর গ্রামে প্রাপ্ত শ্বেত মৃত্তিকা বাংলাদেশের বিভিন্ন মৃৎশিল্প কারখানায় থালাবাসন, কাপপিরিচ ইত্যাদি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। নওগাঁ জেলার পত্নীতলায় উৎকৃষ্টমানের শ্বেত মৃত্তিকা পাওয়া গেছে।

(৬) **কাচ বালি** (Glass Sand) : দেশের বিভিন্ন কাচ তৈরির কারখানায় কাচের উপাদান হিসেবে এই বালি ব্যবহৃত হয় বলে একে কাচ বালি বলে। সিলেটের টেকেরহাট ও শাহজীবাজার এবং জামালপুর জেলা শহরের নিকটে কাচ বালি পাওয়া গেছে।

(৭) **চীনা মাটি** (China clay) : সিরামিক (ceramic) দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য এই মাটি ব্যবহৃত হয়। প্রথমে চীন দেশ থেকে এই মাটিতে প্রস্তুতকৃত সিরামিক ব্যবহৃত ও রফতানি হয়েছে বলে এটিকে চীনামাটি বলা হয়। ময়মনসিংহ ও রাজশাহী জেলায় চীনামাটি পাওয়া যায়।

(৮) **আণবিক খনিজ পদার্থ** (Atomic reactive materials) : সাধারণত মোনাজাইট (Monazite), জিরকন (Zircon), ম্যাগনেটাইট (Magnetite), এলসাইট (Alcite) প্রভৃতি পদার্থকে আণবিক খনিজ পদার্থ বলে। এগুলো পরিচর্যার মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রস্তুত করা হয়, যা আণবিক শক্তি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে। কক্সবাজার ও টেকনাফের সমুদ্র উপকূল এলাকায় প্রচুর পরিমাণ আণবিক খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে।

(৯) **কঠিন শিলা** (Hard rocks) : ভূগর্ভ, পাহাড় ও সামুদ্রিক এলাকায় কঠিন শিলা সৃষ্টি হয়। এটি দেখতে কালো রং এর এবং খুবই কঠিন। ডিনামাইট ফাটিয়ে পাথরের পাহাড় ভেঙ্গে কঠিন শিলা সংগ্রহ করতে হয়। রংপুর জেলার রাণী পুকুর, শ্যামপুর, সিলেট জেলার নদীতে, দিনাজপুর জেলার ভূ-গর্ভে কঠিন শিলার সন্ধান বা অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। রেললাইনে পাথর বিছানো, রাস্তাঘাট, সেতু,বহুতল দালানকোঠা প্রভৃতির ভিত্তি স্থাপনে কঠিন শিলা ব্যবহারের জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়।

(১০) **খনিজ লবণ** (Mineral Salts) : ভূ-গর্ভ থেকে যে লবণ পাওয়া যায়, তাকে খনিজ লবণ বলা হয়। সমুদ্রে পানি বাষ্পীভূত হয়ে গেলে যে লবণ পাওয়া যায়, তা কালক্রমে মাটির নিচে চাপা পড়লে তা খনিজ লবণে রূপান্তরিত হয়। সাগরের লবণাক্ত পানি হতে লবণ তৈরি করার প্ল্যান্ট কম-বেশি সব দেশেই আছে। এগুলোকে প্রাকৃতিক লবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আমাদের দেশের বঙ্গোপসাগরের উপকূল যেমন, খুলনা, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি এলাকায় অনেক লবণ তৈরির কারখানা রয়েছে।

২.১০ দেশে উৎপাদিত শস্য

বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই দেশে প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। তবে, উন্নত বীজ ব্যবহারে আজকাল কোনো কোনো বছরে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যও উৎপন্ন হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত শস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খাদ্যশস্য হচ্ছে— ধান, তৈলবীজ, ডাল, গম, ভূট্টা প্রভৃতি এবং অর্থকরী ফসল হচ্ছে—পাট, চা, আখ, তামাক প্রভৃতি। বিশেষ বিশেষ শস্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :

১। **খাদ্যশস্য** (Food grains)

(১) **ধান** (Paddy) : ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। দেশের শতকরা ৮০ ভাগের অধিক আবাদি জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। এদেশে উৎপন্নকৃত ধানকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন :

(ক) আউশ ধান : এটি সাধারণত উঁচু জমিতে এবং গ্রীষ্মকালে জন্মে। এই ধানের ফলন ও উৎপাদনের পরিমাণ সীমিত।

(খ) আমন ধান : এটি সাধারণত নিম্নভূমিতে জন্মে। শীত মৌসুমে এ ধান জন্মে। বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের আমন ধান বাংলাদেশে পাওয়া যায়।

(গ) বোরো ধান : শীতকালীন ফসল হিসেবে জলাশয়, বিল, হাওড় এবং চর এলাকায় এই ধানের চাষ অধিক হয়।

(ঘ) ইরি ধান : অধিক ফলনশীল ধান হিসেবে এটি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। একই জমিতে বছরে ২/৩ বার এ ধান চাষ করে রেকর্ড পরিমাণ ফসল উৎপাদন করা যায়।

পাহাড়ি ও বনভূমি ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র কম বেশি বিভিন্ন প্রকার ধানের চাষ করা হয়। ১৯৮৬–৮৭ সালে ধানের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬০.২২ লক্ষ মেট্রিক টন। সরকারি প্রচেষ্টায় এবং ধান গবেষকদের উদ্যোগে ইরি (IRRI) নামক যে ধানের চাষ করা হয়, তার ফলন একর প্রতি প্রায় ৪৩ কুইন্টালের অধিক। ব্যাপকভাবে এই ধানের চাষ করা সম্ভব হলে শীঘ্রই খাদ্য সঙ্কট মিটানো সহজ হবে।

(২) **তৈলবীজ** (Oil seed) : ময়মনসিংহ, রাজশাহী, ঢাকা, দিনাজপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সরিষা ও রাই ভালো হয়। তিল ও তিসি রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও কুমিল্লা অঞ্চলে ভালো জন্মে। ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে বাদামের চাষ ভালো হয়।

(৩) **ডাল** : ডাল বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্য। সব জেলায় ছোলা, মসুর, মুগ, খেসারি, মাসকলাই, মটরকলাই ও অড়হর ডাল ভালো জন্মে। তবে, প্রতি বছর ডালের ঘাটতি হলে তা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়।

(৪) **গম** (Wheat) : গম বাংলাদেশের একটি রবিশস্য। পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে গমের চাষ ভালো হয়।

বাংলাদেশে সামান্য পরিমাণে ভুট্টা, বাজরা, যব প্রভৃতির চাষ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী অঞ্চলে ভুট্টা চাষ হয়।

(৫) **ভুট্টা** : ভুট্টা একটি উপাদেয় খাদ্যশস্য। কিন্তু বাংলাদেশে খাদ্য হিসেবে এটির জনপ্রিয়তা কম। তবে আশার বিষয় যে, ভুট্টা গমের সাথে মিশিয়ে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করায় দিনদিন এটির উৎপাদন ও ব্যবহারের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি এলাকাতে এর চাষ হয় এবং বছরে প্রায় ১০ হাজার টনের মতো ভুট্টা উৎপাদন হচ্ছে।

(৬) **আলু** (Potato) : আমাদের দেশে আলু তরকারি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু চাউলের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। তবে জার্মানি, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এটি চাল বা ভাতের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ দেশের সব এলাকাতেই আলু জন্মে। তবে, বগুড়া, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, মুন্সীগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর এলাকাতে প্রচুর আলু জন্মে।

(৭) **মসলা** (Spices) : খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতে মসলার বিকল্প নেই। এগুলো হচ্ছে পিয়াজ, রসুন, আলু, মরিচ, হলুদ, ধনিয়া, জিরা প্রভৃতি। জিরা বাংলাদেশে কম জন্মে। তবে অন্যান্য মসল এদেশে ভালো জন্মে। বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, যশোহর প্রভৃতি এলাকায় মসলা ভালো জন্মে। তবুও পিয়াজ, রসুন, আদা, জিরা ইত্যাদি মসলা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে প্রতিবছরই আমদানি করতে হয়।

(৮) **ফলমূল** (Fruits) : আমাদের দেশে হরেক রকম ফলমূল উৎপন্ন হয়। যেমন— আম, জাম, নারিকেল, আতা, লেবু, কলা, লিচু, বেল, আনারস, কাঁঠাল, তরমুজ, তাল, খিরাই, আমড়া, কুল, জাম্বুরা প্রভৃতি। তবে লেবু, আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি অর্থকরী ফলমূল এদেশে কম উৎপন্ন হয়। রাজশাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি এলাকা আম ও লিচু উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। মধুপুর, সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম আনারস, মুন্সীগঞ্জ, বগুড়া, নাটোর কলা এবং ফরিদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি এলাকা তরমুজ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

২। **ফসল** (Crops)

(১) **পাট** (Jute) : পাট বাংলাদেশের একটি অর্থকরী ফসল। এর দ্বারা প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। তদুপরি শিল্পোন্নয়নে এর অপরিসীম গুরুত্বের জন্য পাটকে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ (Golden fibre) বলা হয়। বাংলাদেশে পাটের তৈরি গালিচা বিশ্বখ্যাত। বর্তমান সরকার পলিথিন নিষিদ্ধ করায় পাটের উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং প্লাবন সমভূমির দোআঁশযুক্ত পলিমাটি পাট চাষের জন্য উপযোগী। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা, আত্রাই প্রভৃতি নদীসমূহের উপত্যকায় এবং পদ্মা নদীর অববাহিকায় এবং কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরের পূর্বাংশে পাট ভালো জন্মে। ময়মনসিংহ, ঢাকা ও কুমিল্লা অঞ্চলে প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ পাট জন্মে।

(২) **চা** (Tea) : পাহাড়ি এলাকার অসম ভূমি চা চাষের উপযোগী। সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল চা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশে মোট ১৫৬টি চা বাগান রয়েছে। এর অধিকাংশই সিলেটের দক্ষিণ ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। কুমিল্লা, দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে চা উৎপন্ন হয়। বর্তমানে প্রায় ৪৬,৪৪৪ হেক্টর জমিতে চা চাষ করা হচ্ছে। দেশের চাহিদা মিটানোর পর চা বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়।

(৩) আখ (Sugarcane) : বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ু আখ চাষের উপযোগী। দেশের উত্তরাঞ্চল যেমন—রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বগুড়া অঞ্চলে আখের চাষ ভালো হয়। আখ থেকে চিনি, গুড়, চিটাগুড় ও আখের ছোবড়া উৎপন্ন হয়। আখের ছোবড়া জ্বালানি ও কাগজ তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে ১৫টি চিনিকল রয়েছে এবং দেশে প্রায় ৫২ লক্ষ টন আখ উৎপন্ন হয়। তথাপিও প্রতিবছর বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করতে হয়।

(৪) তামাক (Tobacco) : তামাক বাংলাদেশের একটি রবিশস্য। রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে তামাকের চাষ ভালো হয়। তদুপরি, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া প্রভৃতি এলাকায় তামাক ভালো জন্মে। সিগারেট, বিড়ি, জর্দায় তামাক ব্যবহৃত হয়। তামাক আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থকরী ফসল। এদেশের প্রায় ২ লক্ষ একর জমিতে তামাকের চাষ হয়।

উৎকৃষ্টতার পার্থক্যভেদে তামাক দুই প্রকার, যথা :

(ক) মতিহারি বা মতিচুর তামাক এবং

(খ) জাতি তামাক।

রংপুর মতিহারি বা মতিচুর তামাক উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। এটি পানের জর্দা এবং হুকোর তামাক প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। কুষ্টিয়া এলাকা জাতি তামাক উৎপন্নের জন্য প্রসিদ্ধ। এটি সিগারেট, বিড়ি প্রভৃতি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

(৫) রেশম (Silk) : রেশম কীট (Silk worm) তুঁত গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে এবং এটি রেশমগুটি (Cocoon) প্রস্তুত করে। রেশম গুটি সিদ্ধ করে তা থেকে রেশম সুতা বের করে রেশমের কাপড় তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে রেশম শিল্প অতি প্রাচীনকালের। রাজশাহী অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি রেশম উৎপন্ন হয়। আজকাল বগুড়া, কুষ্টিয়া ও পাবনা এলাকাতেও রেশম চাষ হচ্ছে। দেশে প্রায় ২৫০০ একর জমিতে রেশমের চাষ হচ্ছে এবং প্রতিবছর মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কিলোগ্রাম। রাজশাহীতে রেশম শিল্প থেকে রেশমি কাপড়, ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর ইত্যাদি প্রচুর উৎপন্ন ও বাজারজাত করা হয়। রেশমি কাপড় মানুষের আভিজাত্য বহন করে।

(৬) রাবার (Rubber) : বাংলাদেশে রাবার উৎপন্ন হচ্ছে কয়েক বছর ধরে। পূর্বে এদেশে মালয়েশিয়া এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে রাবার আমদানি করা হতো। বর্তমানে সিলেট, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাতে রাবারের চাষ হচ্ছে। এজন্য দেশে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ কেজি কাঁচা রাবার উৎপন্ন হচ্ছে। রাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। পরিকল্পিত উপায়ে এটির উৎপাদন বাড়ালে দেশে প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

২.১১ দেশের মৎস্য সম্পদ (Fisheries resources of the country)

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। মৎস্য দেশের একটি অন্যতম সম্পদ। [illegible] বাংলাদেশের জনগণের প্রিয় খাবার। দেশের অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, [illegible] ইত্যাদি এলাকায় প্রচুর মাছের চাষ হয়।

Dhaka

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদকে সামুদ্রিক মাছ ও মিঠা পানির মাছ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। দেশের ৭১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র তটরেখার কাছে অগভীর সাগর জলে সামুদ্রিক মাছ শিকার করা হয়। পূর্ব উপকূলে সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, চট্টগ্রাম, হাতিয়া ও সন্দ্বীপ এবং পশ্চিম উপকূলে, দুবলারচর, রাজাবলি ও বড় বাইশদিয়া প্রধান মৎস্য চাষ কেন্দ্র। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে রূপচান্দা, ছুরি, লটিয়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে ধৃত মাছের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মিঠাপানির মাছ। পুকুর, খাল-বিল ও অন্যান্য জলাশয়ে বড় মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, শোল, চিতল, বোয়াল প্রভৃতি পাওয়া যায়। আশুগঞ্জ, ভৈরববাজার, চাঁদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর, খেপুপাড়া ইত্যাদি দেশের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ মৎস্য কেন্দ্র।

১৯৮৭-৮৮ সালে বাংলাদেশে ৬১,০০০ মেট্রিক টন মিঠা পানির মাছ এবং ২,২৭,০০ মেট্রিক টন সামুদ্রিক মাছ ধরা হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে প্রায় ৭,২৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ নদী, সোয়া পাঁচ লক্ষ পুকুর এবং অসংখ্য খাল-বিল, হাওড় ও অন্যান্য জলাশয়ে মাছের চাষ হয়। নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, ডোবা, হাওড়-বাওড়, দিঘি এবং অন্যান্য জলাশয়ে প্রচুর মিঠা পানির মাছের চাষ করা হয়। বর্তমানে বেকার সমস্যা দূরীকরণে শিক্ষিত ও আধা শিক্ষিত যুবক-যুবতী মাছের চাষের উপর স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে এবং সরকারি এন.জি.ও-এর কাছে ঋণ নিয়ে মাছের চাষ করে লাভবান হচ্ছে। মিঠা পানির মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, চিতল, পাঙ্গাস, বোয়াল, মাগুর, পাবদা, পুঁটি ইত্যাদি প্রধান। পূর্বে পাঙ্গাস মাছ ছিল খুবই দুর্লভ। তবে, বর্তমানে থাইল্যান্ডের পাঙ্গাস দেশে প্রচুর উৎপন্ন হচ্ছে এবং চাষীও চাষ করে লাভবান হচ্ছে। বর্তমানে আরেকটি বিদেশী মাছ বাংলাদেশে উৎপন্ন হচ্ছে। সেটি হলো আফ্রিকার মাগুর। তবে, এটির বৃদ্ধি বেশি এবং খাবারও বেশি লাগে। সে কারণে, এই মাছের চাষে জনপ্রিয়তা কম হচ্ছে।

আমরা প্রতিনিয়ত ডাল ভাতের পাশাপাশি মাছ ভাত খুব পছন্দ করি। সে কারণে, আমাদেরকে মাছে ভাতে বাঙ্গালি বলে। মাছ আমিষ জাতীয় খাদ্য। দেশে ও বিদেশে এটির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মৎস্য সম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। রফতানিযোগ্য মৎস্য সম্পদের মধ্যে রয়েছে চিংড়ি, ব্যাঙের পা, হিমায়িত মাছ, শুঁটকি, লোনা মাছ, কচ্ছপ, হাঙ্গর এর পাখনা, কাঁকড়া প্রভৃতি। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত সময়ে মৎস্য সম্পদ রফতানি করে আমাদের দেশ কি পরিমাণ অর্থ আয় করেছে, তার একটি পরিসংখ্যান নিচে দেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	মৎস্য সম্পদের প্রকৃতি	১৯৯১-৯২		১৯৯২-৯৩	
		পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (কোটি টাকা)
১.	চিংড়ি	১৬,৭৩০	৪৫৫.৭৩	১১,২২২	৩৫৮.৯০
২.	ব্যাঙের পা	৭১১	১১.০৯	--	--
৩.	হিমায়িত মাছ	২,৫০৪	৩০.১০	১,৬৫৬	২৩.৫১

.	শুঁটকি মাছ	৮৯২	১৪.১৮	৪৮০	৮.৫০
.	লোনা মাছ	৮০	১.৩৯	৫৯৯	৯.৮৪
.	কচ্ছপ	৯১	০.৯৫	৬৮৮	৪.৪৮
.	হাঙ্গরের পাখনা	৬৫	৫.৪১	১২২	৮.০৭
.	কাঁকড়া ও অন্যান্য	৮৪	৫.৫৭	১২৫২	১০.০২
	মোট :	২১,১৫৭	৫২৪.৪২	১৬,০১৯	৪২৩.৩২

দেশের মোট রফতানির শতকরা হার : ১৯৯১–৯২–তে ৬.৯১%
১৯৯২–৯৩–তে ৭.৭২%
(মন্তব্য : ১৯৯২–৯৩ তে রফতানির পরিমাণ ভালো ছিল।)

মাছ ধরা, ক্রয়–বিক্রয় এবং রফতানির সাথে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করছে। তাই, মাছ মাদেরকে আমিষ জাতীয় খাদ্যই সরবরাহ করে না, এটি আমাদের বেকার সমস্যা দূর রে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্য রক্ষার য়ম মোতাবেক মাংসের চেয়ে মাছ খাওয়া অনেক ভালো বলে প্রতীয়মান হয়।

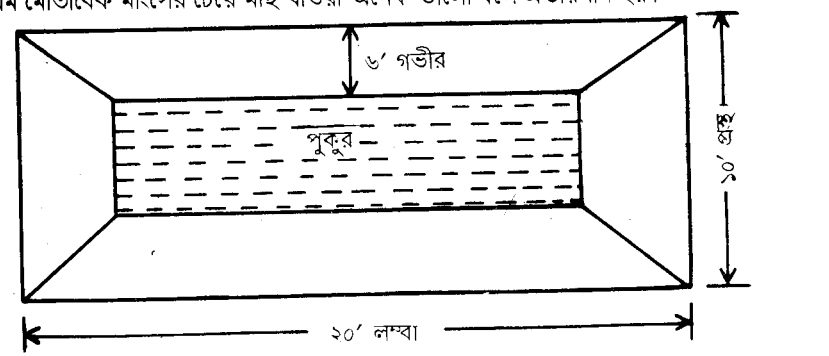

চিত্র ২.৯ : তেলাপিয়া মাছ চাষের জন্য ছোট পুকুরের আকৃতি প্রদর্শন।

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক কারণে অনেক নদী ও জলাশয় শুকিয়ে গেলেও আমরা ভিন্ন এলাকায় ছোট বড় পুকুর খনন করে মাছের চাষের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বাড়াতে বাড়তি আয় করতে পারি। যেমন—তেলাপিয়া মাছ সর্বাধিক বংশবৃদ্ধি করে। একটি ছোট কুর (চিত্র ২.৯) যার পরিমাণ = ২০′×১০′×৬′ (গভীর), নিচে যাতে কাদা না হয়, তার ন্য নিচে পাকা করা হয় অথবা মোটা পলিথিনও বিছিয়ে দেয়া যায়। এতে অনায়াসে তলাপিয়া মাছের চাষ করা যায়।

৪৫ দিন পর পর এই মাছ ধরে খাওয়া বা বিক্রি করা যায়। বাড়ির বারান্দায় ২′×২′×২′ রিমাণ একটি সিমেন্টের আধারের মধ্যেও এই মাছের চাষ করা যায় এবং একটি ছোট রিবারের কিছু মাছের চাহিদা পূরণ করা যায়।

আফ্রিকার মাগুর মাছ উৎপাদন অর্থকরী। এই মাছের ৮ সপ্তাহে ৫ কেজি ওজন বৃদ্ধি পতে পারে। বেকার জনগোষ্ঠী স্বীয় উদ্যোগে এই প্রকল্প গ্রহণ করলে সরকার থেকে ঋণ বিধাও পাওয়া যায়। ইদানীং আমাদের দেশে এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মৎস্য উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ (Causes of detoriation of fish production) : পূর্বে আমাদের দেশে যেভাবে মাছ পাওয়া যেত, এখন সে হারে পাওয়া যায় না, তার কারণসমূহ মূলত দুই প্রকার, যথা :

১। প্রাকৃতিক কারণসমূহ (Natural causes) এবং

২। কৃত্রিম বা মানুষ সৃষ্ট কারণসমূহ (Artificial causes)। এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ :

১। প্রাকৃতিক কারণসমূহ :

(ক) খালবিল, নদীনালা প্রভৃতির চর পড়ে পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস,

(খ) আবহাওয়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে খরা প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাওয়ায় খাল-বিল শুকিয়ে যাওয়া,

(গ) বন্যার সময় খাল-বিল, নদী-নালা একাকার হয়ে মাছের পোনা বড় নদীতে চলে যাওয়া,

(ঘ) বন্যার সময় রাক্ষুসে মাছ পুকুর ও খালে আসার জন্য মাছের পোনা ও ছোট মাছ কমে যাওয়া,

(ঙ) নদীর ভাঙ্গনে ভরাট হয়ে যাওয়া এবং নদীতে পানির প্রবাহ কমে যাওয়া ইত্যাদি।

২। কৃত্রিম বা মানুষ সৃষ্ট কারণসমূহ :

(ক) জনসংখ্যা ও চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিপাচ্ছে, সেই হারে মাছের যোগান বৃদ্ধি না পাওয়া,

(খ) চাষাবাদ করার জমি বাড়ানোর জন্য জলাশয় ভরাট করা এবং মাছের আবাস উচ্ছেদ করা,

(গ) বাড়তি বাড়ি করার জায়গা, রাস্তাঘাট বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে জলাশয় কমে যাওয়া,

(ঘ) পুকুর, নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় থেকে পানি সেচ করে ফসলের ক্ষেতে পানি দেয়া এবং মাছের আবাস স্থান কমে যাওয়া,

(ঙ) কারেন্ট জাল ব্যবহার করে মাছের ডিম বা রেণু, ছোট মাছ মেরে ফেলার কারণে,

(চ) পাম্প দিয়ে পানি সেচে মাছের বংশ শেষ করা বা ডিমওয়ালা মাছ মেরে ফেলা,

(ছ) বর্জ্য পদার্থের পানি পুকুর ও খাল-বিলে নিষ্কাশন করলে মাছ মরে ও কমে যায়,

(জ) কীটনাশক ক্ষেতে প্রয়োগ করলে মাছ মরে যায়,

(ঝ) অজ্ঞতার ফলে সাধারণ মাছের সাথে রাক্ষুসে মাছের চাষ করলে মাছ কমে যায়,

(ঞ) মাছের আধারে খাবার না দিলে এবং রোগ প্রতিষেধক না দিলে মাছ দুর্বল হয়, বংশবৃদ্ধি হয় না,

(ট) খাল-বিল ও পুকুরে মাছের পোনা না ছাড়া,

(ঠ) দেশের জলাশয়গুলো সংস্কার না করা,

(ড) খাল-বিল ও অন্যান্য জলাশয়ে আবর্জনা ফেললে মাছের পোনা উৎপাদনে ব্যাহত হয় ইত্যাদি।

মিঠা এবং লোনা পানির মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি করার সম্ভাব্য উপায়সমূহ নিম্নরূপ :

(১) মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাল-বিল, নদী-নালা, পুকুর-দিঘি প্রভৃতিতে প্রতিবছর অধিক পোনা ছাড়তে হবে।

(২) খাল-বিল, নদী-নালা, পুকুর-দিঘি প্রভৃতিতে পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে সারা বছর মাছের আবাস সংরক্ষিত থাকে।

(৩) মাছের চাষের উপর জরিপ করে মৎস্য আইন সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রকৃত মাছ চাষী বা জেলেদেরকে জল-মহল লিজ দিতে হবে। তাহলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

(৪) ছোট মাছ ধরা ও বিক্রয় করা বন্ধ করতে হবে এবং জাটকা মাছ যারা ধরে তাদেরকে আটক ও জরিমানা করতে হবে।

(৫) কারেন্ট জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৬) পুকুর ও জলাশয় থেকে রাক্ষুসে মাছ মেরে ফেলতে হবে।

(৭) বন্যার সময় যাতে পুকুর ও নদী একাকার হয়ে না যায়, সেজন্য পুকুরের পাড় উঁচু করে দিতে হবে, যাতে সংরক্ষিত মাছ বেরিয়ে যেতে না পারে।

(৮) পুকুর ও খাল-বিলের কচুরিপানা পরিষ্কার করতে হবে, এতে মাছের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

(৯) মৎস্য সম্পদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তে জলাশয়ে মাছের খাদ্য এবং মাছের রোগ প্রতিরোধক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

(১০) যে এলাকা যে মাছ চাষের উপযোগী সেই এলাকায় সেই মাছের চাষ করতে হবে। যেমন—মিঠা পানিতে মিঠা পানির মাছ এবং লবণাক্ত পানিতে লবণাক্ত পানির মাছের চাষ করতে হবে।

(১১) সমুদ্র উপকূল এলাকায় বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি চাষের এলাকা বাড়াতে হবে এবং সেখানকার অব্যবস্থা দূর করতে হবে।

(১২) মৎস্য চাষের পানিতে কোনো বর্জ্য পদার্থ ফেলা এবং বর্জ্য পানি নিষ্কাশন করা যাবে না।

(১৩) কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক উপায়ে মাছের পোনার উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং পোনা ছাড়ার পূর্বেই সেখানকার রাক্ষুসে মাছ যেমন— শোল, বোয়াল মেরে ফেলতে হবে।

(১৪) আফ্রিকার মাগুর মাছ সাধারণ মাছের সাথে রাখা যাবে না, অন্যথায় উক্ত মাগুর অন্যান্য মাছ খেয়ে ফেলতে পারে।

(১৫) মাছের ব্যবসার সাথে জড়িত জনগণকে সহজ শর্তে ঋণ দিতে এবং মাছ চাষের সব দ্রব্য ও সরঞ্জাম প্রাপ্তিতে সহায়তা করতে হবে।

(১৬) মাছ সংরক্ষণ করার জন্য চাষের এলাকায় হিমাগার স্থাপন এবং পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৭) মৎস্য এলাকায় জলদস্যুর তৎপরতা রোধ করতে এবং শক্তিশালী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে।

(১৮) মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে ও বেকার সমস্যা কমাতে বেকার যুবক–যুবতীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এ ব্যাপারে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে।

(১৯) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও মাছের আবাসস্থল বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাজা–মাজ পুনঃখনন করতে হবে।

(২০) ডিমবাহী মাছ ধরা নিষিদ্ধ করতে হবে এবং ধরলেও তা আবার জলাশয়ে ছেড়ে দিতে হবে।

(২১) মাছ নির্দিষ্ট ওজন এবং আকৃতি অর্জন না করা পর্যন্ত তা ধরা যাবে না।

(২২) অধিক মাছ শিকার এলাকায় ব্যাংক স্থাপন এবং নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যবস্থা করতে হবে।

২.১২ দেশের গৃহপালিত পশু সম্পদ (Livestock resources of Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং এ দেশের শতকরা ৮২ ভাগ লোক কৃষিজীবী। কৃষি কাজের জন্য গরু ও মহিষের ব্যবহার ব্যাপক। কলের লাঙ্গল বা ট্রাক্টরের ব্যবহার সীমিত তাই প্রায় প্রতিটি কৃষকের বাড়িতেই অন্ততপক্ষে ২ (দুটি) করে বলদ গরু, গাভী, ছাগল হাঁস, মুরগি প্রভৃতি গৃহপালিত পশু সম্পদ রয়েছে।

পশু চিকিৎসা ও পশু পরিচর্যা করার জন্য এখানে কৃষি বিভাগ থেকে পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছে। হাঁস–মুরগি খামার, দুগ্ধজাত পশুর খামার অনেকেই স্থাপন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) এসব ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, সাভার, বাঘাবাড়ি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় গৃহপালিত পশু খামার রয়েছে। খামার থেকে উৎপন্ন ডিমের আকার বড় হয় ও লাভজনক।

আমাদের দেশে পশু সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ এবং তা থেকে উন্নত এবং জীবনযাত্রার মান অতি সহজেই বৃদ্ধি করা যায়। মানিকগঞ্জে গৃহপালিত পশু সম্পদ পালনের একটি খামার করা হয়েছে, যা একটি উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করেছে। এই প্রকল্পটির নাম মানিকগঞ্জ লাইভস্টক মডেল (Manikganj Livestock Model)। এখানে দুগ্ধ ও ডিম উৎপন্ন করে ঢাকা ও বিভিন্ন এলাকায় সরকারিভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে পশুর চামড়া বিক্রয় খাত থেকে ১৯২৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে। চামড়া প্রক্রিয়াকরণ শিল্প কারখানা অনেক স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশে জীবজন্তুর চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাজেট খুব কম। পশু চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে জীবজন্তুর মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমানো গেলে দেশও উন্নতির দিকে ধাবিত হবে।

পশু সম্পদের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Livestock resources) : কৃষি প্রধান দেশে এবং উন্নত বিশ্বে পশু সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ, যেমন :

(১) বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে এখনও গরু ও মহিষ দিয়ে লাঙ্গল এবং গাড়ি চালানো হয় এবং ফসল মাড়াই করতেও এই পশু ব্যবহার করা হয়।

(২) কৃষকের ঘরে হাঁস–মুরগি, ছাগল–গরু থাকে। অর্থাৎ, চাষাবাদের পাশাপাশি এগুলো পালন করা তাদের অন্যতম পেশা। কারণ, এগুলো থেকে ডিম, দুধ, গোবর প্রভৃতি অর্থকরী দ্রব্য পাওয়া যায়।

(৩) বেকার সমস্যা দূরীকরণে গ্রামের অনেকেই গৃহপালিত জীবজন্তু পালন ও বিক্রয় জীবিকা নির্বাহ করে। অনেকে গরু মোটা-তাজাকরণ প্রকল্প করেও জীবিকা চালায়।

(৪) গ্রাম ও শহরের মানুষের পুষ্টির যোগান গৃহপালিত জীবজন্তুর মাংস, দুধ, ডিম তি থেকে আসে।

(৫) বাংলাদেশে অনেক জায়গাতেই গরুর খামার রয়েছে। সেখান থেকে সরবরাহকৃত ারা মিল্ক ভিটা (milk vita) জাতীয় দুগ্ধ খামার চলে, যেখান থেকে আমরা ঘি, মাখন, , মিষ্টি প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য উপাদান প্রস্তুত করতে পারি।

(৬) বাংলাদেশে অনেক চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ সংস্থা রয়েছে এবং ঢাকাস্থ রিবাগেই এগুলোর প্রায় ১০০টি সংস্থা রয়েছে। গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতির চামড়া পাকা এখান থেকে দেশ ও বিদেশে সরবরাহ ও রফতানি করে অনেক দেশী ও বৈদেশিক মুদ্রা ন করা যায়। ১৯৯৫ সালে এ খাতে ১৯২৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

(৭) পশু পালনের উপর গবেষণা করে দেখা গেছে যে, ১০০টি মুরগি যত্ন সহকারে পালন ল তা থেকে খরচ বাদে মাসে ২,৫০০.০০ টাকা আয় করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়া অনেকেই রণ করে বেকার সমস্যা দূর করতে পারে।

(৮) হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই, পুকুরের এক পাশে মুরগির খামার করে লাভবান হওয়া যায়।

(৯) গরু-মহিষের গোবর থেকে উৎকৃষ্ট জৈব সার উৎপন্ন হয়। গ্রামে সচরাচর এ র সার প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়।

(১০) গরু-মহিষের গোবর জমা করে সেখানে ঢাকনা ও পাইপ লাইন ব্যবহার করে গ্যাস প্ল্যান্ট (Bio Gas Plant) তৈরি করা যায়। ১০টি গরু মহিষের গোবর একটি া বিশিষ্ট কূপে জমা করে বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে ১০/১৫ জন সদস্যের একটি রের জ্বালানি ও বাতির খরচ সাশ্রয় হয়।

(১১) গরু, মহিষ ও ছাগলের নাড়ি ভুড়ি ও মাংসের অপ্রয়োজনীয় অংশ মাছের খাদ্য বে ব্যবহৃত হয় এবং এতেও বাড়তি আয় করা সম্ভব হয়।

(১২) আদর্শ কৃষকের বাড়িতে গৃহপালিত বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি থাকে বলে অতিথি য়ন এবং নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে কোনো সময় পুষ্টিকর খাবারের যোগান পাওয়া বগুড়াতে দুধের দাম সস্তা বলে এখানে উন্নতমানের দই অধিকতর কম মূল্যে পাওয়া

৩ বাংলাদেশের বনজ সম্পদ (Forest resources of Bangladesh)

দের দেশ শস্য শ্যামলা ও সবুজ বন সজ্জিত। উল্লেখ্য যে, সমগ্র বাংলাদেশে ২২,৫৮৪ কিলোমিটার অরণ্যময়। অর্থাৎ ১৯৯৬ এর পরিসংখ্যান মোতাবেক দেশের মোট আয়তনের করা ১৬ ভাগ বনভূমি রয়েছে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, াইল ও খুলনায়। তবে, ১৯৯৮ এ প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক এই বনজ সম্পদের পরিমাণ নো হয়েছে মোট ভূমির মাত্র ৮ ভাগ। একটি দেশের জন্য বনভূমি থাকা উচিত মোট র অন্ততপক্ষে ২৫ ভাগ। উল্লেখ্য যে, জার্মানিতে বনভূমির পরিমাণ রয়েছে মোট ভূমির

৬০ ভাগ। আমাদের দেশের জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বাড়তি ঘর-বাড়ি প্রস্তুত, চাষাবাদের জমি বের করা, জ্বালানি সংকট দূর প্রভৃতি কারণে প্রতিনিয়ত বনভূমি উজাড় হচ্ছে। ২.১০ চিত্রে বাংলাদেশের মানচিত্রে বনভূমির অবস্থান দেখানো হয়েছে।

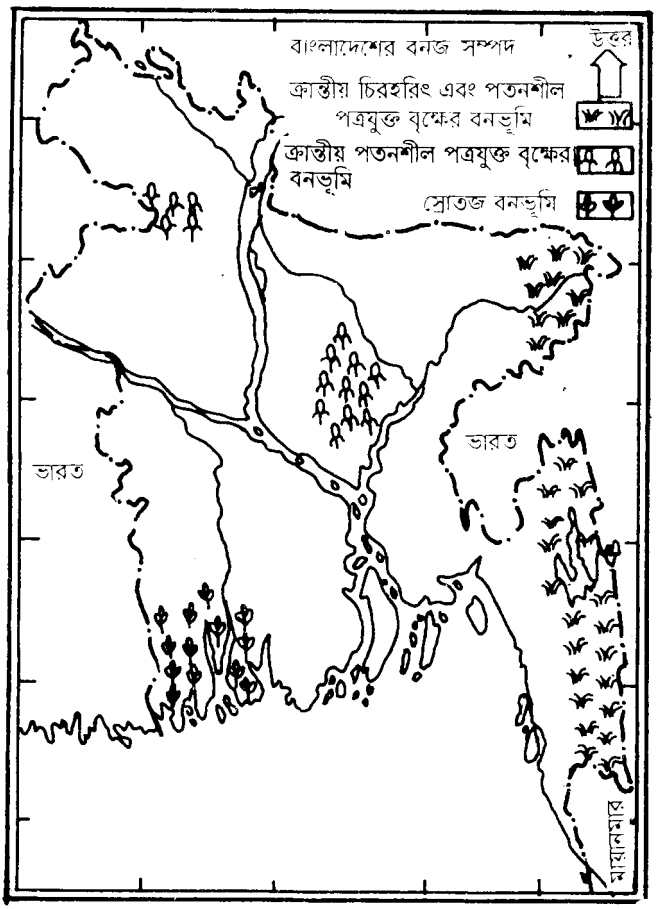

চিত্র ২.১০ : বাংলাদেশের বনজ সম্পদ।

গাছপালা থেকে আমরা অক্সিজেন পাই। তাই গাছপালা আমাদের প্রকৃত বন্ধু। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে, ১৯৮৮–৮৯ সালে বনজ সম্পদ থেকে ২৪.১৯ কোটি টাকা, ১৯৮৯–৯০ সালে প্রায় ১৮.৬৪ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। ১৯৯৪–৯৫ সালে শুধু সুন্দরবন থেকেই ২২ থেকে ৭৭ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

বাংলাদেশে বনভূমির শ্রেণীবিভাগ (Types of forests in Bangladesh) : উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, যথা :

(১) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি, (২) ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন এবং (৩) স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।

এই বনভূমিত্রয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :

(১) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি : প্রায় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের কিয়দংশ স্থানে এ বনভূমি অবস্থিত। অতি বৃষ্টির জন্য এ অঞ্চলে চিরহরিৎ অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। গর্জন, সেগুন, গামারি, তেলসুর, কড়ই প্রভৃতি বৃক্ষ এ বনভূমির বৈশিষ্ট্য। এসব অরণ্যে বেত ও বাঁশ জন্মে।

(২) ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি : ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ঢাকা অঞ্চলের প্রায় ১,১৬৪ বর্গকিলোমিটার এবং দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের ৩৯ বর্গকিলোমিটার এলাকায় শালবন বিস্তৃত। এ বনভূমির শতকরা ৯৫ ভাগ বৃক্ষই শাল। এগুলোর উচ্চতা ১৫ হতে ২১ মিটার হয়। এখানে প্রাপ্ত অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে কড়ই ও বহেড়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

(৩) স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন : সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৬,০৬০ বর্গকিলোমিটার। দক্ষিণ-পশ্চিম পটুয়াখালী অঞ্চলের প্রায় ৬২ বর্গকিলোমিটার ব্যতীত সুন্দরবনের অবশিষ্ট অংশ খুলনা অঞ্চলে অবস্থিত। গরান, সুন্দরী, গেওয়া প্রভৃতি সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে পশুর, বৃন্দল, কেওড়া প্রধান। সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ রয়েছে। এই বনে প্রচুর গোলপাতা জন্মে যা দিয়ে লোকে ঘরের ছাউনি প্রস্তুত করে। ২.৯ চিত্রে বাংলাদেশের বনজ সম্পদের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

বনজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Forest Resources) : প্রাণীজগতের জীবন ধারণের জন্য বনজ সম্পদের প্রয়োজন অপরিহার্য। মানুষের আহার, বাসস্থান ও গৃহস্থালী কাজে বনজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশ তথা বিশ্বের পরিবেশের জন্য বনজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

(১) জীবজন্তুর জন্য অক্সিজেন (Oxygen for living being) : মানুষজন, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, মৎস্য ইত্যাদি যাদের জীবন আছে তাদের বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, বনজ সম্পদ সে অক্সিজেন প্রস্তুত ও সরবরাহ করে। জীবজন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়, বনজ সম্পদ সে গ্যাস গ্রহণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। ভূ-পৃষ্ঠকে ঠাণ্ডা রাখা, বৃষ্টিপাত ঘটাতে সহযোগিতা করা, ভূমিক্ষয় রোধ করা প্রভৃতি কাজেও বনজ সম্পদ ভূমিকা রাখে।

(২) ফলমূল (Fruits) : আমাদের দেশে ফলমূল বাগান ও বনাঞ্চল থেকে পাওয়া যায়। বাগানের ফলমূল বলতে আম, জাম, নারিকেল, আতা, লেবু, কলা, লিচু, বেল, আনারস, কাঁঠাল, তরমুজ, তাল, পেয়ারা, খেজুর, আমড়া, কুল, জাম্বুরা ইত্যাদি পেয়ে থাকি। এগুলো থেকে প্রচুর ভিটামিন-সি (Vitamin-C) পাওয়া যায়, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। বনাঞ্চল থেকে কুল, চালতা, বাদাম, জাম প্রভৃতি ফলমূল পাই।

(৩) কাঠ (Wood) : বনভূমি থেকে প্রাপ্ত প্রধান উপাদান হলো কাঠ। আমাদের দেশের বনভূমি থেকে মেহগনি, সেগুন, গজারি, শাল, কাঁঠাল, কড়ই, সুন্দরী গেওয়া, শিশু প্রভৃতি উন্নতমানের কাঠ পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের সেগুন (Tick), বার্মা থেকে প্রাপ্ত সেগুন (Burma

tick) কাঠের বেশ সুনাম রয়েছে। মধুপুরের শাল ও সেগুন কাঠ বেশ বিখ্যাত। সুন্দরবনের সুন্দরী, গেওয়া কাঠ দিয়েও ভালো ভালো আসবাবপত্র প্রস্তুত হয়। কাঠ দিয়ে নৌকা, বাস ও ট্রাকের বডি, গরুর গাড়ি, রেল লাইনের স্লিপার (rail line sleeper), লঞ্চ, কৃষি যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ির খুঁটি ও আসবাবপত্র ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। হার্ডবোর্ড মিলে কাগজ ও হার্ডবোর্ড প্রস্তুতে নরম কাঠ ব্যবহার করা হয়। শিমুল ও আম কাঠ থেকে দিয়াশলাই কাঠি ও বাক্স তৈরি হয়। সুন্দরবনে হরিণ গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। ১৯৯১-৯৩ সালে কাঠ পাওয়া গেছে ৮.১২ মিলিয়ন ঘনফুট। গর্জন ও জারুল কাঠ রেলওয়ে স্লিপার এবং গামারি ও চাপালিশ কাঠ নৌকা ও সাম্পান প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। আসবাবপত্রের জন্য সেগুন বৃক্ষ, কাঁঠাল কাঠ, শিশু কাঠ ইত্যাদি উত্তম। ঘরের খুঁটি ও কাঠামো প্রস্তুতে শাল ও জাম কাঠ ব্যবহারের জনপ্রিয়তা রয়েছে।

একটি পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশে সংগৃহীত হয় = ৩,৬১,৮৬০ ঘনমিটার কাঠ এবং ১৯৯১-৯৩ সালে কাঠ সংগৃহীত হয়েছে = ৮১.১২ মিলিয়ন ঘনমিটার।

(৪) **জ্বালানি কাঠ** (Fire Wood) : গাছের ডালপালা, নরম কাঠ, গাছের বাকল, করাতের গুঁড়া (কাঠের গুঁড়া), গাছের পাতা প্রভৃতি গ্রাম ও শহরে জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আজকাল ইটের ভাটায় প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি কাঠের ব্যবহার হচ্ছে এবং এজন্য গ্রামে-গঞ্জে মানুষ টাকার জন্য প্রয়োজনীয় গাছও বিক্রয় করে দিচ্ছে। জ্বালানি কাঠ হিসেবে গ্রামে-গঞ্জে গোবর এবং গাছের ঝরা পাতা জ্বালানি হিসেবে লোকে ব্যবহার করে। এতে অনেক জ্বালানি কাঠও সাশ্রয় হয়। বন বিভাগের এক পরিসংখ্যান মোতাবেক ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশে জ্বালানি কাঠ সংগৃহীত হয় = ৬,৭০,১১২ ঘনমিটার এবং ১৯৯১-৯৩ সালে দেশে জ্বালানি কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে = ১৯.৭০ মিলিয়ন ঘনমিটার।

(৫) **বাঁশ** (Bamboo) : গ্রাম-গঞ্জের ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র প্রস্তুতে কাঠের পরেই বাঁশের স্থান। ঘরের খুঁটি, পুল, সাঁকো, কাগজের কাঁচামাল, দালান-কোঠার সেন্টারিং, রেওন মিলের কাঁচামাল ইত্যাদি কাজে বাঁশ ও বাঁশের পাতা জনপ্রিয়তার সাথে ব্যবহার করা হয়। পূর্বে বনজঙ্গল বেশি থাকার কারণে কাঠ ও বাঁশ উভয়ই প্রচুর পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে বনাঞ্চল অনেকটা কমে যাওয়ার কারণে এগুলোর উৎপাদন কমে গেছে। কাঠ ও বাঁশ বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিস্তীর্ণ বনভূমিতে বাঁশের উপর নির্ভর করে সুবৃহৎ কর্ণফুলী কাগজের কল স্থাপিত হয়েছে। এই বাঁশ নদীপথে দেশের অন্যত্র সরবরাহ করা হয়, যা দ্বারা ঘরের বেড়া প্রস্তুত করা হয়।

বাংলাদেশে বগুড়া, যশোহর, পাবনা, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়। বাঁশ প্রধান তিন প্রকার, যথা : (ক) বড় বাঁশ, (খ) জাওয়া বাঁশ এবং (গ) মূলীবাঁশ। ঘরের খুঁটি হিসেবে বড় বাঁশ, বেড়া তৈরির কাজে জাওয়া বাঁশ এবং বেড়া, কাগজ প্রভৃতি তৈরির কাজে মূলীবাঁশ ব্যবহৃত হয়। সিলেটে নল খাগড়া ও বাঁশের উপর ভিত্তি করে সেখানে কাগজের মণ্ড তৈরির একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। বন বিভাগের এক পরিসংখ্যানে ১৯৯১-৯৩ সালে দেশে বাঁশ উৎপাদিত হয়েছে = ১৫৯.২০ মিলিয়ন, এটি ১৯৯০-৯১ এর তুলনায় অনেক কম। সুতরাং দেশে কাঠ ও বাঁশ পরিপক্ক হবার আগেই কেটে ফেলা হচ্ছে, যা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর। কারণ একটি কাঁচা কাঠ ও বাঁশ পরিপক্ক হলে তার মূল্য অনেকগুণে বেড়ে যায়। গ্রামে-গঞ্জে জনগণ দরিদ্রতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাঁচা বা অপরিপক্ক কাঠ, বাঁশ বিক্রয় করে থাকে।

(৬) বেত (Cane) : পূর্বে দেশে বেত শিল্পের বেশ কদর ছিল। বেত দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হয়, যেমন : ধামা, সোফা সেট, মোড়া, বুকশেলফ, দোলনা, খেলনা, কৃষকের মাথাল ইত্যাদি। পূর্বে আমাদের দেশে বন বেশি ছিল, বেতও ছিল প্রচুর। বন কমে যাওয়ায় এবং বেতের তৈরি জিনিসের ব্যবহার সেকেলে হওয়ায়, বেতের উৎপাদনও কমে গেছে। বেতের পরিপূরক আরেকটি গাছ আছে, তার নাম সোঁদা। এটি দ্বারা শীতল পাটি, মাদুর ইত্যাদি তৈরি হয়।

সিলেট, পাবনা, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, যশোহর প্রভৃতি এলাকায় বেত পাওয়া যায়।

(৭) পশুপাখি (Animals and Birds) : পশুপাখির মূল আবাসস্থল হচ্ছে বনজঙ্গল। পশু বা পাখি কেউই খাঁচায় বা দড়ি বাঁধা অবস্থায় থাকতে চায় না। সেজন্য কথায় বলে "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"। বর্তমানে বন জঙ্গল কমে যাওয়ায় তাই আমাদের দেশে পশু সম্পদও হ্রাস পাচ্ছে। বন্য পশুর মধ্যে বাঘ, ভল্লুক, হাতি, শুকর, শৃগাল, সাপ, বনবিড়াল এবং পাখির মধ্যে ঘুঘু, চড়াই, কোকিল, শালিক, কুটুম পাখি, চিল, মাছরাঙ্গা, প্যাঁচা, বক, কবুতর প্রভৃতি।

আমাদের দেশে বন-জঙ্গল, জলাশয় এবং গাছপালায় ভরা বাড়ির আঙ্গিনায় বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখা যায়। এখনও গ্রামে-গঞ্জে পাখির ডাকে সকালে ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তখনই অনুভব করা যায়, প্রকৃতি কত সুন্দর। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, সুন্দরবনে প্রায় ৪ শত বাঘ, ১ লক্ষ ২০ হাজার হরিণ, ৪০ হাজার বানর, ৪৩ হাজার বন্য শুকর এবং বিভিন্ন রকমের পাখি রয়েছে।

(৮) মধু ও মোম (Honey and Waxes) : মধু দেখতে অনেকটা আধা তরল একটি সুস্বাদু খাবার। মৌমাছি কষ্ট করে ফুল থেকে মধু আহরণ করে মৌমাছির চাকের ফাঁকে ফাঁকে মধু জমা করে। মধুর চাক বড় এবং পরিপূর্ণ হলে অভিজ্ঞতানুযায়ী বাওয়ালীরা চাক কেটে মধু আহরণ করে। খাঁটি মধু বেশ মূল্যবান এবং এটি দিয়ে সর্দি, কাশি নিরোধক ওষুধ বা সিরাপ প্রস্তুত হয়। এটি ধর্মীয় ও বিবাহ কার্যের একটি উপাদান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনে প্রচুর মধুর চাক পড়ে। তাই, মধু আহরণের আকর্ষণে বাওয়ালীরা সুন্দরবনে গমন করে এবং কেউ কেউ বাঘের আক্রমণে আহত হয়ে থাকে। রবি শস্যের সময়ে গ্রামে-গঞ্জে অনেক মৌমাছির চাক পড়ে। মৌমাছির চাক থেকে মধু আহরণের পরে মৌচাক থেকে মোম পাওয়া যায়। এই মোম দিয়ে মোমবাতি প্রস্তুত এবং স্বর্ণকারগণ এই মোমবাতিকে জ্বালিয়ে অলংকার প্রস্তুতের কাজ করে থাকে। মোমবাতির আলো চোখের জন্য ভালো।

বন বিভাগের এক তথ্য বিবরণী মোতাবেক জানা যায় যে, ১৯৯১-৯২ সালে দেশে ৪৪ মেট্রিক টন এবং ১৯৯২-৯৩ সালে ৩৬ মেট্রিক টন মোম বন জঙ্গল হতে পাওয়া গেছে।

(৯) ওষুধি গাছ-গাছড়া (Medicinal trees and plants) : ওষুধ প্রস্তুতের মূল কাঁচামাল বলতে গাছ এবং লতাপাতাকেই বুঝায়। মানুষ কোনো রোগ হলে পূর্বে এই গাছ এবং ঝাড় ফোঁকই ব্যবহার করতো। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে হোমিওপ্যাথি এবং পরে এলোপ্যাথি ওষুধের আবিষ্কার হয়েছে এবং লোকে এগুলোর উপর অধিক নির্ভর করছে। তবে, ইউনানী, আয়ুর্বেদী, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজি, এলোপ্যাথিক সব চিকিৎসায় এই গাছপালা ব্যবহৃত হয়। গাছের লতাপাতা, শিকড়, কাণ্ড, বাকল, ফুল ও ফল ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। উদাহরণস্বরূপ, নিমগাছ, কালকেশুর প্রভৃতির পাতা ও কাণ্ড যথাক্রমে দাঁতের মাজন, কীটনাশক, মাথা ঠাণ্ডার তেল প্রস্তুতের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে, বনে জঙ্গলে এ ধরনের হাজারো ওষুধি গাছ পাওয়া যায়।

(১০) রাবার (Rubber) : মোটরযান, সাইকেল, রিক্সা, ভ্যান, উড়োজাহাজ প্রভৃতির টায়ার-টিউব, উন্নত ক্রীড়া মাঠের পিচ ইত্যাদি তৈরিতে রাবার ব্যবহৃত হয়। এই রাবারও বন-জঙ্গলেই উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে পূর্বে রাবার উৎপন্ন হতো না, অল্প কয়েক বছর হতে সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে রাবার চাষ করা হচ্ছে। রাবার গাছের রস নির্গত হলে তা সংগ্রহ করেই রাবার তৈরি করা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ৩,০০০ টন কাঁচা রাবার (raw rubber) উৎপন্ন হচ্ছে।

২.১৪ দেশের জীব-বৈচিত্র্য (Bio-diversity of the Country)

যার প্রাণ আছে, সেটিই জীবের আওতায় পড়ে। বিশ্বে তথা আমাদের দেশে বিভিন্ন জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা প্রভৃতি রয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে এই বিভিন্ন ধরনের জীব বসবাস করে, সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিবেশকে বৈচিত্র্য দান করে। সেজন্য এই পরিবেশকে জীব বৈচিত্র্য বলে।

একটি বাড়িতে জীব-বৈচিত্র্য চিন্তা করলে মানুষ, হাঁস, মুরগি, গরু-ছাগল, গাছপালা, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায়। একটি ক্ষেতের জীববৈচিত্র্য দেখলে দেখা যায় ধান গাছ, কীটপতঙ্গ, পাখি প্রভৃতি। একটি বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্যে বিভিন্ন গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু প্রভৃতি দেখা যায়। আবার একটি পুকুর অথবা নদীর জীববৈচিত্র্যে বিভিন্ন ধরনের মাছ, ব্যাঙ, সাপ, কীটপতঙ্গ, শৈবাল, কচুরিপানা, কাঁকড়া, কচ্ছপ ইত্যাদি দেখা যায়। এই জীবকুল আন্তঃজৈবিক পদ্ধতির কাঠামোতে প্রকৃতিতে বেঁচে থাকে, বংশবৃদ্ধি করে এবং বয়স হলে মারা যায়।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর তারতম্যভেদে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, জীবজন্তু এবং গাছপালা দেখা যায়। পূর্বে আমাদের দেশে যেসব জীবজন্তু, গাছপালা দেখা গেছে, আজকাল তা আর দেখা যায় না। দেশে প্রতিনিয়ত বনজঙ্গল কমে যাওয়ায় পশুপাখির সংখ্যাও দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহপালিত পশুপাখির পরিমাণও হ্রাস পাচ্ছে। নদী ও পুকুরে পূর্বে যত প্রকার মৎস্য সম্পদ দেখা যেত, বর্তমানে তা আর দেখা যায় না। সুতরাং, অধিক জনসংখ্যার চাপ, বন-জঙ্গল নিধন, শিল্প ও কৃষি দূষণ, পাহাড় কর্তন, নদীনালা ভরাট হওয়া ইত্যাদি কারণে প্রতিনিয়ত জীব-বৈচিত্র্যের মাত্রা হ্রাস পাচ্ছে।

জীব বৈচিত্র্যকে মূলত দুভাগে ভাগ করা হয়, যেমন :

(ক) প্রাণী বৈচিত্র্য (Animal diversity) এবং (খ) উদ্ভিদ বৈচিত্র্য (Plant diversity)।

এই জীববৈচিত্র্যসমূহের বর্ণনা নিচে দেয়া হয়েছে।

(ক) প্রাণী বৈচিত্র্য (Animal diversity) : জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীকুলের আওতাভুক্ত। ১৯৮৮ সালের এক তথ্য বিবরণী মোতাবেক আমাদের দেশে ১৫০০ প্রজাতির বিশেষ প্রাণী বা জন্তু রয়েছে। তন্মধ্যে ২৬০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ৫৬ প্রজাতির চিংড়ি মাছ, ৪৭৫ সামুদ্রিক মাছ, ১২৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ১৫৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৩ প্রজাতির উভচর প্রাণী এবং ৬৩২ প্রজাতির পাখি রয়েছে। গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে ৮৫০ থেকে ৯০১ প্রজাতির সন্ধান মেলে। সুতরাং প্রাণীকুলকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, যেমন :

(অ) স্তন্যপায়ী (Mammals) **প্রাণী** : যেসব প্রাণীর বাচ্চা হয় এবং বাচ্চা প্রথমে মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচে, তাকে স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে। যেমন : মানুষ, বানর, হাতী, ঘোড়া, জিরাফ, বাঘ প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদাহরণ।

(আ) সরীসৃপ প্রাণী : যেসব প্রাণী দেখতে আকারে লম্বা এবং ভূমি ও পানির উপর দিয়ে চলে, তাকে সরীসৃপ প্রাণী বলে। যেমন : সাপ, গুইসাপ, গিরিগিটি, টিকটিকি প্রভৃতি সরীসৃপ প্রাণীর উদাহরণ।

(ই) উভচর প্রাণী : যেসব প্রাণী জলভাগ এবং স্থলভাগ উভয় স্থানেই অনায়াসে চলাচল ও বসবাস করতে পারে তাকে উভচর প্রাণী বলে। যেমন : ব্যাঙ।

প্রাণীকুলের কমে যাওয়া প্রজাতি (Endangered Species of Fauna) : গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে ৮৫০ থেকে ৯০১ প্রজাতির সন্ধান মেলে। কিন্তু ঠিকমতো পরিবেশ না পাওয়ায় এর মধ্যে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ২০ ভাগ প্রজাতির স্তন্যপায়ীর মধ্যে গন্ডার, বন্য মহিষ (Wild Buffalo), নেকড়ে (Wolf) এবং জলাভূমির হরিণ বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

গত ৫০ বছরের তথ্য বিবরণীতে দেখা গেছে যে, মিঠা পানিতে প্রায় মোট ২৬০ প্রজাতির মৎস্য সম্পদ আছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশে ৫৫ প্রজাতির মাছ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে এবং ৫৬ প্রজাতির গলদা চিংড়ি (Prawn) রয়েছে বিভিন্ন মিঠা ও সামুদ্রিক পানিতে। চট্টগ্রামে বায়েজীদ বোস্তামির পুকুরে এক বিশেষ প্রজাতির কাছিম আছে, যা দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আনন্দ দান করে।

১৯৯০ সনের IUCN RED DATA BOOK তথ্য বিবরণী মোতাবেক ১৩৩ প্রজাতির জীবজন্তু ও গৃহপালিত জীবজন্তু নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। এর মধ্যে ৩৭ ভাগ স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ২১ ভাগ, ২ ভাগ উভচর প্রাণী এবং ৬৯ প্রজাতির পাখি। ঘড়িয়াল প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এবং এই প্রজাতি ১৯৫০ সালের আগে সারা দেশেই মোটামুটি ছিল। দেশের অনেক নদী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে এসব প্রাণীও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। দেশের নদী ও বনজ সম্পদ কমে যাওয়ার জন্য অনেক প্রজাতির মাছ ও পাখি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী কমে যাওয়ার কারণ ও প্রতিকার (Causes and remedies of Endangered Fauna in Bangladesh) : বাংলাদেশে কতিপয় বন্যপ্রাণী কমে যাওয়ার উপসর্গ, সম্ভাব্য কারণ ও প্রতিকার নিম্নরূপ :

উপসর্গ (Symptoms)	কারণ (Causes)	প্রতিকার (Remedies)
১. স্থলভাগ থেকে প্রাণীকুল শূন্য হওয়া বা কমে যাওয়া	ক. দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনজঙ্গল কর্তন	ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো এবং বনজঙ্গল কর্তন বন্ধ ও বৃদ্ধিকরণ।
	খ. বন্যপ্রাণীর খাদ্যের অভাব	খ. প্রাণী বৈচিত্র্যের সমাহার ঘটানো যেখানে সব ধরনের অসংখ্য প্রাণী থাকতে পারে এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে বাঁচতে পারে।
	গ. নির্বিচারে পশু নিধন করা	গ. আইন করে পশু শিকার বন্ধ কর করতে হবে।

	ঘ. পরিবেশ দূষণ ঘটানো	ঘ. যে প্রাণীর যে পরিবেশ, প্রাণী বিজ্ঞানীর দ্বারা সেই পরিবেশ তৈরি করা এবং পচা দ্রব্যাদি মাটিতে পুঁতে দেয়া।
	ঙ. পানীয় জলের অভাব	ঙ. বনজঙ্গলের মধ্যে সুপেয় পানির পুকুর, খাল-বিল থাকা আবশ্যক।
২. জলভাগ থেকে প্রাণীকুল শূন্য হওয়া বা কমে যাওয়া।	ক. জলজ প্রাণীর জন্য আবাসস্থল কমে যাওয়া, ভরাট হওয়া ইত্যাদি।	ক. জলজ প্রাণীকুলের জন্য ভরাটকৃত ডোবা, নালা-পুকুর, নদী প্রভৃতি পুনঃখনন করা।
	খ. জলজ প্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের ঘাটতি, শৈবাল প্রভৃতির সংখ্যা কম।	খ. জলজ প্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ এবং প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
	গ. কারেন্ট জাল ব্যবহারে এবং পানি সেচে পুকুর, খাল-বিল থেকে জলজ প্রাণী মেরে ফেলা।	গ. কারেন্ট জাল ব্যবহার রোধ এবং পানি সেচ না করে মাছ ধরার ব্যবস্থা করা।
	ঘ. পানি দূষণ ঘটানো	ঘ. জলাশয়ের মধ্যে বর্জ্য, ময়লা ও বিষাক্ত পানি না ফেলা এবং পুকুরের মধ্যে চুন ও কলাগাছ ফেলে পানি বিশুদ্ধ করা।
	ঙ. রাক্ষুসে মাছ কর্তৃক অন্যান্য জলজ প্রাণীকে ভক্ষণ।	ঙ. পুকুর ও খাল-বিল থেকে রাক্ষুসে ও ক্ষতিকর মাছ মেরে ফেলা।

(খ) উদ্ভিদ বৈচিত্র্য (Plant diversity) : এক তথ্যে জানা গেছে যে, আমাদের দেশে প্রায় ৫,০০০ প্রজাতির ফুলের গাছ রয়েছে। ফ্লোরা অব বাংলাদেশ (Flora of Bangladesh) এর তথ্য জাতীয় নমুনা সংগ্রহ সংস্থা (National Herbarium)-এর মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে এবং এই সংস্থা ১৯৯৩ সাল থেকে অদ্যাবধি মাত্র ৫৬ পরিবারের ৩০৬ প্রজাতির ফুলের সন্ধান লাভ করেছে। বাংলাদেশে ভালো ফলনশীল গাছের প্রাচুর্যতা আছে, যেমন—কলা (Bananas), কল্পিত পুষ্পবিশেষ, পাট (Jute), তুলা (cotton) এবং চা (tea)। এদেশে প্রায় ৮০০ প্রকার ধান এবং প্রায় ৩,০০০ প্রকার অন্যান্য শস্য রয়েছে।

উদ্ভিদকুলের কমে যাওয়া প্রজাতি (Endangered species of flora) : আমাদের দেশে স্থান বা কাল বিশেষ জন্মে এমন উদ্ভিদ বিভিন্ন কারণে যেমন—বন উজাড়, জলাভূমিকে কৃষিক্ষেতে রূপান্তর এবং অতি বন্যা প্রভৃতিতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। মিঠা পানি এলাকায় লোনা পানি ঢুকে সে এলাকার গাছপালা নষ্ট করে ফেলে। তবে, ১৯৯০ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সমুদ্র উপকূলের জলাভূমিতে ২৯টি প্রজাতির বিশেষ ধরনের সুদৃশ্য বৃক্ষ রয়েছে। পাহাড় কেটে ফসলের জমি ও বাড়িঘর তৈরিতেও অনেক উদ্ভিদ কাটা পড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অনেক সুদৃশ্য ও ফলজ গাছ কাটা পড়ছে। ১৯৯৪ সালের বাংলাদেশ জাতীয় নমুনা সংস্থার তথ্য বিবরণী মোতাবেক ৩৭টি প্রজাতির গাছ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। সমুদ্রের লবণাক্ততার জন্য কিছু প্রজাতির গাছের অবশ্য ক্ষতি হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং সুন্দরবনের গভীর বনে গাছের প্রজাতিগুলো জীবিত বা অক্ষুণ্ন আছে। সিলেটের জলাভূমির কিছু প্রজাতির গাছপালাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আমাদের দেশে উদ্ভিদ ও জীববিজ্ঞানসম্মত বিশেষ সার্ভে সংস্থা (Botanical and Zoological Survey Organization) না থাকায় এই অবস্থা বিরাজ করছে। ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতেও বহু ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল, যা এখন নেই। বাংলাদেশ জাতীয় জন্তু আশ্রয়কেন্দ্র (Bangladesh National Herbarium) চেষ্টা করছে বিশেষ প্রজাতির গাছ ও জন্তু সংগ্রহ করতে। কিন্তু পূর্বের চেয়ে বনজঙ্গল কমে যাবার কারণে তা কাজে রূপান্তরিত হচ্ছে না।

অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, ১৯৮০-১৯৯০ সালের মধ্যে ৩৭,৬০০ হেক্টর বন সম্পদের মধ্যে বছরে ৮,০০০ হেক্টর জমির বনজ সম্পদ উজাড় হয়েছে। ফলে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ এবং জীবজন্তু অনেকাংশে নির্মূল হয়েছে। যে এলাকাগুলো সবার নজরে আছে যেমন : চট্টগ্রাম, সুন্দরবন এবং কক্সবাজার বনজ সম্পদ মোটামুটি ঠিকই আছে। জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে—তার সাথে গাছপালা ও বনের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। দেশে ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছে না বলেই বনজঙ্গলের স্থানকে অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে কৃষিভূমি এবং শিল্প কারখানা দূষিত হচ্ছে, বন্যার প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে, জলাভূমির সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং পাহাড় টিলাসমূহে গাছ কেটে ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে বিধায় বন এলাকা সঙ্কুচিত হচ্ছে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। সম্পদ (Resource) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : মানুষের কল্যাণ বিধানের অবলম্বনকেই সম্পদ বলে। যেমন : ঘরবাড়ি, জমিজমা, টাকা পয়সা, গাছপালা, পানি, বায়ু, প্রভৃতি সম্পদের উদাহরণ।

২। সম্পদ প্রধানত কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : সম্পদ প্রধানত দুই প্রকার, যথা :

(ক) অর্জিত সম্পদ (Earned resources), যেমন : মানব ও সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং

(খ) অনার্জিত সম্পদ (Unearned resources), যেমন : জৈব ও অজৈব সম্পদ।

৩। ভূ-সম্পত্তি (Land Resources) থেকে আমরা কি কি ধরনের সুবিধা পাই?

উত্তর : ভূ-সম্পত্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত প্রভৃতি তৈরি করে বসবাস করতে পারি এবং ভূমি চাষ করে খাবারের জন্য ফসল পাই।

৪। মানব সম্পদ (Human resources) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : মানুষ যখন লেখাপড়া এবং নির্দিষ্ট কাজ শিখে নিজেকে দেশ উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারে, তখন তাকে মানব সম্পদ বলে।

৫। কৃষি প্রতিবেশীক অঞ্চল (Agro-ecological Zone) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যে এলাকায় কৃষিজাত পণ্য ভালো জন্মে, তাকে কৃষি সম্পদ বা কৃষি প্রতিবেশীক এলাকা বলে।

৬। আমাদের দেশে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে কেন?

উত্তর : আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু জমি বাড়ছে না। সে কারণে দেশে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে।

৭। আমাদের দেশে কোন ধরনের ধানের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হয়?

উত্তর : আমাদের দেশে সবচেয়ে আমন ধানের উৎপাদন বেশি হয়, যার পরিমাণ সমস্ত ধানের উৎপাদনের ৪৯%।

৮। ক্ষেতে অধিক সার দিলে কি হয়?

উত্তর : ক্ষেতে অধিক পরিমাণে সার দিলে ফসলের ফলন ভালো হয়। এটি অতীতের ধারণার বিপরীত।

৯। আমাদের দেশে কি পরিমাণ সমুদ্র সৈকত রয়েছে এবং তা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : আমাদের দেশের কক্সবাজারে ১৫৫ কিলোমিটার সমুদ্র সৈকত রয়েছে এবং এটি পর্যটকদের জন্য বিরাট আকর্ষণ।

১০। পানি সম্পদ (Water resources) কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : পানি সম্পদকে দুভাগে ভাগ করা হয়, যেমন :

(ক) ভূ-উপরিস্থ পানি (Surface water) এবং

(খ) ভূ-গর্ভস্থ পানি (Under ground water)।

১১। পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Hydro-electric power plant) কি?

উত্তর : খর স্রোতা পানির ধাক্কায় বৈদ্যুতিক জেনারেটর সংলগ্ন পানি টারবাইন ঘূর্ণন গতিপ্রাপ্ত হলে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। এ ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বলে।

১২। বাংলাদেশে ব্যবহৃত শক্তি সম্পদের তালিকা দাও।

উত্তর : বাংলাদেশে ব্যবহৃত শক্তি সম্পদ হলো :

(১) জ্বালানি (Fuels)– কঠিন, তরল ও বায়বীয় জ্বালানি,

(২) সৌর শক্তি (Solar energy) এবং

(৩) ধাবমান জলস্রোত (Flowing streams of water) প্রভৃতি।

১৩। বাংলাদেশে প্রাপ্ত তিনটি খনিজ সম্পদের নাম লিখ।

উত্তর : বাংলাদেশে প্রাপ্ত তিনটি খনিজ সম্পদ হলো :

(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস, (খ) কয়লা ও (গ) চুনাপাথর।

১৪। বাংলাদেশের বনজ সম্পদ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : বাংলাদেশের বনজ সম্পদ প্রধানত তিন প্রকার, যথা—

(ক) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি,

(খ) ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি এবং

(গ) স্রোতজ বনভূমি প্রভৃতি।

১৫। জীব-বৈচিত্র্য (Bio-diversity) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : পৃথিবীতে প্রকৃতিগতভাবে মানুষজন, পশুপাখি, গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতি একই আকাশের নিচে বসবাস করে এবং প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করে, তাকে জীব-বৈচিত্র্য বলে।

১৬। আমাদের দেশে কত প্রজাতির প্রাণী, পশুপাখি ও গাছপালা রয়েছে?

উত্তর : আমাদের দেশে ১৫০০ প্রজাতির প্রাণী ও পশুপাখি এবং ৫,০০০ প্রজাতির গাছপালা রয়েছে।

১৭। এদেশে প্রাণী, পশুপাখি ও বনজ সম্পদ কমে যাওয়ার প্রধান কারণ কি?

উত্তর : আমাদের দেশে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বনজ সম্পদ উজাড় প্রভৃতি কারণে প্রাণী, পশুপাখি ও বনজ সম্পদ কমে যাচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। সম্পদ কত প্রকার ও কি কি? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : সম্পদ প্রধানত দুই প্রকার, যথা :

(১) অর্জিত সম্পদ ও (২) অনার্জিত সম্পদ।

অর্জিত সম্পদ আবার দুই প্রকার, যথা :

(ক) মানব সম্পদ (Human resources) এবং

(খ) সাংস্কৃতিক সম্পদ (Cultural resources)।

অনার্জিত সম্পদ দুই প্রকার, যথা :

(অ) অজৈব সম্পদ (Inorganic resources) এবং

(আ) জৈব সম্পদ (Organic resources)।

অর্জিত সম্পদ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এবং অনার্জিত সম্পদ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত।

২। নদী পদ্ধতি ও নদী শাসন (River system and river management) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : আমাদের দেশের অধিকাংশ নদী মধ্য হিমালয়ের গাংগোত্রী হিমবাহ হতে উৎপন্ন হয়েছে। উৎপত্তিস্থল হতে এই নদী গঙ্গা নামে চীন, নেপাল, ভারত হয়ে পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করে গোয়ালন্দের কাছে যমুনা এবং চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সাথে মিলেছে। অতঃপর তিস্তা নদীর মিলিত স্রোতধারা মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে নদী পদ্ধতি বা ব্যবস্থা বলে। আর বিভিন্ন শহর, নদীর পাড় প্রভৃতি ভাঙ্গা রোধ করতে নদীতে বাঁধ দিয়ে স্রোতের গতি ধারার দিক পরিবর্তন করাকে নদী শাসন বলে।

৩। বাংলাদেশে বনজ সম্পদের ভূমিকা বর্ণনা কর।

উত্তর : বাংলাদেশে ৩,২৫,০০০ একর জায়গায় বনভূমি আছে। এক তথ্য বিবরণী মোতাবেক জানা গেছে যে, ১৯৮৮–৮৯ সালে এই বনভূমি থেকে প্রায় ২৪.১৯ কোটি, ১৯৮৯–৯০ সালে ২৮.৬৪ কোটি টাকা এবং ১৯৯৪–৯৫ সালে শুধু সুন্দরবন থেকেই ২২.৭৭ কোটি টাকা আয় হয়েছে। এদেশের বনজঙ্গল থেকে ১৯৯১–৯৩ সালে ৮.১২ মিলিয়ন ঘনফুট কাঠ, ১৫৯.২০ মিলিয়ন পিস বাঁশ, ১৯.৭০ মিলিয়ন ঘনফুট জ্বালানি কাঠ এবং ৩৪.১ মেট্রিক টন মধু পাওয়া গেছে। তদুপরি, বনজ সম্পদ থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, ফলমূল, ওষুধি বৃক্ষ, তরুলতা, রাবার প্রভৃতি পেয়ে থাকি। তাই, বাংলাদেশে বনজ সম্পদের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

৪। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীব–বৈচিত্র্যের (Bio-diversity) ভূমিকা লিখ।

উত্তর : আমাদের দেশে ১৫০০ প্রজাতির প্রাণী ও পশুপাখি রয়েছে। এখানে ২৬০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ৫৬ প্রজাতির চিংড়ি মাছ, ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৫০০০ প্রজাতির গাছপালা, ৮৩০ প্রকারের ধান এবং ৩০০০ প্রকার ফসল রয়েছে। এগুলো জীবজন্তু ও মানুষের জন্য খাবার, অক্সিজেন, বসবাসে আনন্দদান প্রভৃতি কার্য পালন করে। তাই, এগুলোকে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। বিশ্বের এই জীব বৈচিত্র্য রক্ষা পাওয়া মানেই পৃথিবীর সভ্যতা ও অস্তিত্ব রক্ষা পাওয়া। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীব–বৈচিত্র্যের ভূমিকা অপরিসীম।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। (ক) সম্পদ (Resources) বলতে কি বুঝ?

(খ) এটি সাধারণত কত প্রকার ও কি কি?

(গ) ভূ-সম্পত্তি (Land resources) সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।

২। (ক) কৃষি সম্পদ এলাকা বলতে কি বুঝ?

(খ) বাংলাদেশে কোন বছরের কৃষি জমি ও উৎপাদনের পরিমাণের জরিপ ছক প্রদর্শন ।

৩। (ক) বাংলাদেশের জলাভূমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(খ) দেশের নদী পদ্ধতি (River system) চিত্রায়িত কর।

(গ) দেশের ৫টি বৃহৎ ও ছোট নদীর নাম লিখ।

৪। (ক) 'বাংলাদেশ একটি বড় আকারের ব-দ্বীপ' এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

(খ) দেশের পানি সম্পদের বর্ণনা দাও।

(গ) কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ কত?

৫। (ক) গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প (G.K. Project) এর ইতিবৃত্ত লিখ।

(খ) দেশে ব্যবহৃত শক্তি সম্পদ (energy resources of Bangladesh) এর তালিকা ও।

(গ) পারমাণবিক জ্বালানি (Nuclear fuel) এর উপকারিতা লিখ।

৬। (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস কি ধরনের সম্পদ? ব্যাখ্যা কর।

(খ) ৫ (পাঁচ)টি খনিজ সম্পদের নাম লিখ।

(গ) খনিজ সম্পদগুলো কোথায় পাওয়া যায় লিখ।

৭। (ক) বাংলাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের তালিকা দাও।

(খ) ৫টি খাদ্যশস্য ও ৫টি অর্থকরী ফসলের তালিকা দাও এবং এগুলোর সংক্ষিপ্ত র্ণনা দাও।

৮। বাংলাদেশের বনজ সম্পদের শ্রেণীভেদের বর্ণনা দাও।

৯। পরিবেশ রক্ষার্থে জীব-বৈচিত্র্যের অবদান উল্লেখ কর। কিছু কিছু জীবজন্তু ও ছপালা নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণ কি?

তৃতীয় অধ্যায়

প্রধান পরিবেশগত বিষয়

৩.১ পরিবেশগত বিষয়

বায়ুমণ্ডল, জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবেশের ধারক ও বাহক। বায়ুমণ্ডল প্রধানত কতকগুলো গ্যাসের সংমিশ্রণে গঠিত। মেঘ (cloud) এবং কুজ্ঝটিকা (fog) বায়ুমণ্ডলের নিম্নাংশে পৃথিবী জুড়ে ভেসে বেড়ায়।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে উপস্থিত উপাদানসমূহ হচ্ছে—নাইট্রোজেন (৭৮.১%), অক্সিজেন (২০.৯%) এবং অবশিষ্ট ১% এর মধ্যে আর্গন (০.৯%), হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন (০.০৭%) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ থাকে নগণ্য (০.০৩%)।

বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অতি নগণ্য হলেও এটি জীবনধারণ এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এ গ্যাস তাপ শোষণ করে নেয় এবং উত্তাপ পরিবহণ না করায় ভূপৃষ্ঠের বাতাসের উত্তাপকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাস ব্যতীত দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো জলীয় বাষ্প (water vapour)। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঋতু অনুসারে এবং অঞ্চল হিসেবে কমবেশি হয়ে থাকে। এই জলীয় বাষ্প থেকেই বিভিন্ন মেঘ ও বৃষ্টির (rain) সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা (dust) যথেষ্ট পরিমাণ ভেসে বেড়ায়। এসব ধূলিকণা বাতাসে ও ধূলিঝড়ে বিশেষত শুষ্ক মরুঅঞ্চল ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হতে বায়ুমণ্ডলে আসে। জলীয়বাষ্প এ ধূলিকণাকে আশ্রয় করেই মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা প্রভৃতির সৃষ্টি করে। বায়ুমণ্ডলের দুটি স্তর (layer) থাকে, যেমন :

(১) হোমোস্ফেয়ার স্তর (Homosphere layer) এবং (২) হেটেরোস্ফেয়ার স্তর (Heterospher layer)।

(১) হোমোস্ফেয়ার (Homosphere) : বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরকে হোমোস্ফেয়ার বলে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের উচ্চতাকে হোমোস্ফেয়ার বলে। এর তিনটি উপরিভাগ আছে, যেমন :

(ক) ট্রপোস্ফেয়ার (Troposphere) : এটি বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তর যেখানে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে গড়ে প্রতি কিলোমিটারে ৬.৫° সেলসিয়াস হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ট্রপোস্ফেয়ারে বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ জলীয়বাষ্প থাকে। অর্থাৎ এ স্তরেই মেঘ, ঝড় ও বৃষ্টিপাত প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এ কারণে একে ক্ষুদ্রমণ্ডল বলে।

(খ) স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার (Stratosphere) : ট্রপোস্ফেয়ারের ঊর্ধ্বে এবং ৫০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশকে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার বলে। এ এলাকায় বায়ু নিশ্চল, মেঘশূন্য ও বৃষ্টিহীন। এ কারণে একে শান্তমণ্ডল বলে। জেট বিমানগুলো ট্রপোস্ফেয়ারের মেঘ ও ঝড়বৃষ্টি এড়াতে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারের মধ্য দিয়ে প্রায় ২৫–৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় যাতায়াত করে। স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার গঠনকারী অন্যতম উপাদান ওজোন স্তর (ozone layer) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওজোন স্তর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি (Ultra Violet rays) কে শোষণ করে পৃথিবীর জীবকুলকে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব থেকে রক্ষা করে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সাধারণত ২৫–৩০ কিলোমিটারের মধ্যে ওজোন স্তর থাকে।

(গ) মেসোস্ফেয়ার (Mesosphere) : স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারের ঊর্ধ্বে বায়ুর উত্তাপ পুনরায় ক্রমশ কমতে থাকে, একে বায়ুমণ্ডলের মেসোস্ফেয়ার স্তর বলে। ভূপৃষ্ঠ থেকে এ স্তরের উচ্চতা ৮৫ কিলোমিটারের উপর এবং বাতাসের তাপমাত্রা ৮০° সে.।

(২) হেটেরোস্ফেয়ার (Heterosphere) : হোমোস্ফেয়ারের ঊর্ধ্বে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উপরে বায়ুমণ্ডলের এ অংশ রয়েছে। এ স্তরকে হেটেরোস্ফেয়ার বলে। এ স্তর প্রায় ১০০ থেকে ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এর উপরের দিকে ক্রমশ পর পর চারটি স্তর আছে। প্রথমটি আণবিক নাইট্রোজেন স্তর (molecular nitrogen layer), তার উপরে পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর (atomic oxygen layer), তার উপরে হিলিয়াম স্তর (helium layer) এবং এ স্তরটির ঊর্ধ্বে রয়েছে হাইড্রোজেন স্তর (hydrogen layer)।

আয়নোস্ফেয়ার স্তরে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি তড়িতাহত হয়ে ইলেকট্রনে ভেঙ্গে যায়। ফলে, ধনাত্মক (positive) ও ঋণাত্মক (negative) দু ধরনের আয়নেরই প্রাচুর্যতা ঘটে। এ কারণে, বেতার তরঙ্গ এ স্তরে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে।

বায়ুমণ্ডলের তিনটি উপাদান আছে, যেমন : (অ) বায়ুর উত্তাপ, (আ) বায়ুচাপ ও বায়ু প্রবাহ এবং (ই) বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত।

বায়ুমণ্ডলের বাতাসের উত্তাপ, বায়ুচাপ এবং বায়ুর আর্দ্রতার কমবেশির উপর জলবায়ুর (climate) তারতম্য ঘটে। আবার, জলবায়ুর তারতম্যতা ও বায়ুমণ্ডলের বাতাসের উত্তাপ ও চাপজনিত কারণে পৃথিবীতে গ্রীষ্মকালে ঝড়, বৃষ্টিপাত ও বন্যা হয় এবং শীতকালে আবহাওয়া শুষ্ক থাকে ও শীত-গ্রীষ্মের মধ্যে টর্নেডো, সাইক্লোন ইত্যাদি ঘটতে দেখা যায়।

আবহাওয়া উত্তপ্ত হলে বা গরম পড়লে মশা, মাছিরও উপদ্রব ঘটে। বর্ষাকালে খাবার পানির সংকট হয় বলে এ সময় জনগণের কলেরা, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। শীত আগমনের শুরুতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে মানুষের সর্দি, কাশি, জ্বর, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখীর ঝড়ে এবং বর্ষাকালে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ও জলোচ্ছ্বাসে জানমালের ক্ষতি এবং বাড়িঘর ভেসে যায়। সুতরাং উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত বিষয়ের নাম নিচে দেয়া হলো : (১) বন্যা (flood), (২) ঘূর্ণিঝড় (cyclone), (৩) খরা (draught), (৪) মরুময়তা (desertification), (৫) ভূমিক্ষয় (soil erosion), (৬) নদী ভাঙ্গন (river bank erosion), (৭) লবণাক্ততা (salinity), (৮) ভূমিকম্প (earth quake) প্রভৃতি।

৩.২ বন্যার কারণ (Causes of flood)

সমুদ্র উপকূল, নদীর পাড় এবং অন্যান্য নিম্নাঞ্চলে সারা বছর যে অবস্থা বিরাজ করে, অতিরিক্ত বৃষ্টি হতে থাকলে এবং পাহাড় থেকে পানি গড়িয়ে আসতে থাকলে এসব এলাকায় পূর্বাবস্থা থাকে না। যখন নদীর পানি দুইকূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম, নগর, বন্দর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বাড়িঘর ও ফসল বিনষ্ট করে তখন বন্যা হয়।

বন্যা চার প্রকার, যথা :

(১) নদী কর্তৃক সৃষ্ট বন্যা (riverine flood), (২) আকস্মিক বন্যা (flash flood), (৩) জোয়ার-ভাটাজনিত বন্যা (tidal flood) এবং (৪) শহুরে বন্যা (urban flood)। আমাদের দেশে নিম্নবর্ণিত কারণে বন্যা দেখা দেয়। যেমন : (১) প্রাকৃতিক কারণে বন্যা এবং (২) কৃত্রিম কারণে বন্যা।

(১) প্রাকৃতিক কারণে বন্যা : বাংলাদেশের পাহাড়ি খরস্রোতা নদী কর্ণফুলী বাদে সব নদীতেই বন্যার সময় প্রচণ্ড স্রোত থাকে। কিন্তু বন্যার পানি নেমে গেলে স্রোতের বেগ কমে যায়। অধিক স্রোতের ধাক্কায় নদীর পাড়, ঘরবাড়ি ভেঙ্গে একাকার হয়ে যায় ফলে চর পড়ে। পূর্বে নদীতে পানি ধারণ ক্ষমতা যতটুক ছিল, বর্তমানে তা না থাকার দরুন পরিমাণের কিছু অতিরিক্ত পানি এলেই সেটি বন্যার আকার ধারণ করে। ৫০ বা ১০০ বছর পূর্বে দেশের ছোটবড় নদীতে যেরূপ পানি ধারণ ক্ষমতা ছিল, বর্তমানে তা নেই বিধায় বন্যা দেখা দেয়। ৩.১ চিত্রে বাংলাদেশের মানচিত্রে দেশের বন্যা প্লাবিত এলাকা দেখানো হয়েছে।

(ক) সমুদ্র ও সমুদ্র সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী বড় ও শাখা নদীতে জোয়ার হয়। এ পানি উপকূলে উপচে পড়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রবেশ করে। ফলে, নদীতে বন্যা দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী প্রভৃতি এলাকার সমুদ্র উপকূলে ও ছোটবড় নদীতে জোয়ারের ফলে বন্যা হয়। জোয়ার নেমে গেলে অনেক এলাকায় পানি জমে থাকে। ফলে, সে এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণে জনজীবন বিপন্ন হয়।

(খ) ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির কারণে সমুদ্র ও নদীর পানি ফুলে ফেঁপে চর উপচে পড়ে। এ কারণে সমুদ্রকূল এলাকা এবং বড় বড় নদীর পাড়ে অবস্থিত বাড়িঘরে পানি ঢুকে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ সন্দ্বীপ, মহেশখালি, কুলিয়ারচর, দুবলারচর, নোয়াখালী, ফেনী, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি এলাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। ফলে এই আকস্মিক বন্যায় জনজীবন বিপন্ন হয় এবং জানমালের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। উপকূলের নিকটে ১.৫ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় জোয়ারের ফলে বন্যা দেখা দেয়।

(গ) বর্ষা ঋতুতে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাতের পানি উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে নিম্নাঞ্চলে ধাবিত হয়। ফলে উঁচু জায়গা এবং যেখানে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে সেখানে পানি দেখা যায় না। কিন্তু, নিম্নাঞ্চলে বন্যা হয়। সাধারণত শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চল নিচু থাকে। ফলে গ্রামাঞ্চলে অধিকহারে বন্যা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে না। যে এলাকায় হাওড়, বিল, ডোবা প্রভৃতি থাকে না, সে এলাকাতেই বৃষ্টির পানি জমে বন্যার সৃষ্টি হয়।

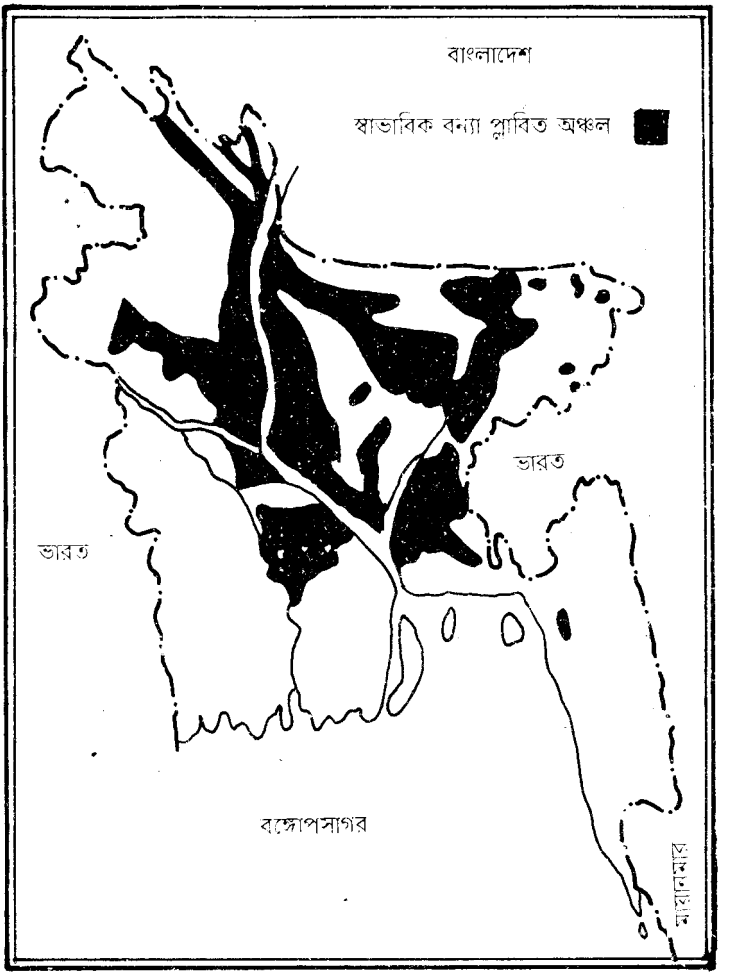

চিত্র ৩.১ : বাংলাদেশের বন্যা প্লাবিত এলাকা।

(ঘ) বরফাচ্ছন্ন এলাকা থেকে যখন গ্রীষ্মকালে বরফ গলতে থাকে তখন সে বরফ গলা পানির ধারা যেদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়, সে দিকের নদী অথবা খালের পানি ধারণ করতে না পারলে পার্শ্ববর্তী এলাকা উপচে পড়ে। ফলে সে এলাকায় বন্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের সিলেট এলাকা এবং ভারতীয় পাহাড়ি নদী থেকে বরফ গলা পানি গ্রীষ্মের রৌদ্র তাপে গলে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে আসা নদীসমূহে পতিত হলে বন্যার সৃষ্টি হয়।

(ঙ) পাহাড়ি এলাকায় অতিবর্ষণ হলে সে এলাকার নিম্নাঞ্চল ও নদীসমূহে বন্যার সৃষ্টি হয়। কারণ, পাহাড়ি এলাকায় পানি ধারণের তেমন হ্রদ থাকে না। দেশের সিলেট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পাহাড়ি এলাকায় অতিবর্ষণের ফলে এ ধরনের বন্যা হয়।

(২) কৃত্রিম কারণে বন্যা : প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও কৃত্রিম কারণে বন্যা সৃষ্টি হয়। যেসব কারণে কৃত্রিম উপায়ে বন্যা সৃষ্টি হয় সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

(ক) পানির স্রোতে বাধা সৃষ্টি হলে সে পানি উপচে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঢুকে পড়ে। যেমন : পদ্মা, যমুনা, মেঘনা নদীতে বড় বড় চর পড়ায় বাড়তি পানি এলে ধারণ করতে পারে না ফলে বন্যা হয়। আবার, কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি স্রোতকে আটকে রাখা হয়েছে এবং সে পানি ক্যাচমেন্ট এলাকায় বণ্টন করা হয়েছে। এতে বন্যা হয় না বলে ধরে নেয়া হয়। ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে যে দুবার প্রবল বন্যা হয়, এতে প্রচুর ফসল, বাড়িঘর, গাছপালা, পশুসম্পদ এবং সর্বোপরি ৩ হাজারেরও বেশি লোকের প্রাণহানী ঘটে।

(খ) প্রধান নদীতে বন্যার ফলে এর শাখা ও উপশাখা নদীতে বন্যা দেখা দেয়। সাধারণত প্রধান নদী গভীর এবং এতে পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি থাকে। কিন্তু শাখা ও উপশাখা নদীসমূহ অগভীর ও সেগুলোর পানি ধারণক্ষমতা কম। তাই, প্রধান নদীর পানি উপচে শাখা নদীতে এলে সে অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়।

(গ) দেশের পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলে অধিক পানির উৎসস্থল রয়েছে। যেমন : পূর্বাঞ্চলে রয়েছে বঙ্গোপসাগর, মেঘনা ও যমুনা নদী এবং উত্তরাঞ্চলে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা নদী। বঙ্গোপসাগর এবং ভারতের গঙ্গা থেকে অধিক পানির ধারা যখন দেশের বিভিন্ন নদীতে উপচে পড়ে তখন নদীসমূহে প্লাবন দেখা দেয়।

(ঘ) নদীর পানির গতির পরিবর্তন ঘটলে বন্যা হয়। সব সময় নদীর পানি উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানে ধাবিত হওয়ার সময় নদীতে স্রোতের উদ্ভব ঘটে। যদি এমন হয়, শাখা নদীতে একদিকে স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু প্রধান নদীতে জোয়ারের ফলে তীব্র বেগে ছোট নদীর পানির বিপরীত দিক থেকে স্রোত আসে তাহলে বন্যার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, তখন ছোট বা শাখা নদী পানি নিষ্কাশনের সুযোগ পায় না। তবে, যেসব নদীর সন্নিকটে সমুদ্র আছে, সে নদীতে বা এরূপ কোনো নদীতে যেখানে হঠাৎ করে জোয়ারের পানি আসে সেসব নদীর পানিতে বন্যা হতে পারে।

(ঙ) ভূমিকম্পের ফলে নতুন চর সৃষ্টি হলে আশেপাশে নিম্নাঞ্চলে বন্যা হতে পারে। যেমন বঙ্গোপসাগর উপকূলের সন্নিকটে অনেকগুলো চর জেগেছে, এ কারণে পার্শ্ববর্তী নিম্নাঞ্চলে অল্পতেই বন্যা হতে পারে। কারণ, জোয়ারের পানি আগে যেখানে দাঁড়াতো, চর জাগার কারণে সেখানে আর পানি দাঁড়াতে পারে না। সে কারণেই সেখানে বন্যা হয়।

(চ) বন্যা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে তৈরি বাঁধ ভেঙ্গে গেলে সেখানে বন্যা হতে পারে। অনেক সময় কোনো কোনো এলাকাকে বন্যার পানি থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁধ দেয়া হয়। কিন্তু বন্যার পানি বাড়তে থাকে এবং বাঁধের উপর চাপ পড়তে থাকে। এ সময় পানির চাপে বাঁধ ভেঙ্গে যায় বিধায় নিম্নাঞ্চলগুলো পানিতে ডুবে বন্যার আকার ধারণ করে।

বাংলাদেশে বন্যার প্রকৃতি অভিনব। কারণ, বন্যার সময় নদীনালা, খালবিল, নিম্নাঞ্চল প্রভৃতি প্লাবিত হয় এবং বন্যার পানি নেমে গেলেই শুষ্ক মৌসুমে অনেক জায়গায় পানি শূন্যতা বা খরা (draught) বিরাজ করে। সে কারণে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের বা পানি সেচের পাশাপাশি খাল খননের কাজটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু, আমাদের দেশে কৃষি উন্নয়নের ধারা খুব ক্ষীণ (yield rate)। পানি সম্পদের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ থাকলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনই শুধু বাড়বে না, এতে বন্যার প্রকোপ কমবে এবং সমুদ্র উপকূলের পানিতেও লবণাক্ততা কমবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকাতে বাংলাদেশের ১/৩ অংশ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১/৪ থেকে ১/৩ ভাগ এলাকা পানির নিচে চলে যায়। এতে প্রচুর জানমালেরও ক্ষতিসাধন হয়। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য জনগণকে কোটি কোটি টাকার ত্রাণ সামগ্রী দিতে হয়েছে এবং দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে। বন্যা পরবর্তী অবস্থা পর্যবেক্ষণের কার্যকর কমিটি গঠন করে সঠিক বন্যা নীতি (flood policy) নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৩.৩ বাংলাদেশে আকস্মিক বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতি (Sudden Flood in Bangladesh and Damages)

বাংলাদেশ পরিবেশ পরিক্রম (জুন, ১৯৯৫) মোতাবেক জানা গেছে যে, অতিমাত্রায় পাহাড়ি জলধারা এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাতের কারণে নদীর আয়তন বৃদ্ধি, উজান দেশের বৃষ্টির পানি দ্রুতবেগে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি ১৯৯৫ সালে দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী আকস্মিক বন্যার কারণ। এ বন্যার পানি দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যাপক এলাকা নিমজ্জিত করেছে, অসংখ্য বাঁধ ধ্বংস করেছে, আবাসভূমি ও শস্যক্ষেত বিধ্বস্ত করেছে। বৃহত্তর চট্টগ্রামের পাহাড়ি সীমান্ত এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকায় ১৯৯৫ সালের জুন মাসে অতিমাত্রায় দ্রুতগতিতে নিম্নাভিমুখী জলপ্রবাহের ফলে আকস্মিক বন্যা হয়েছিল। এই বন্যার তীব্রতা অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশি ছিল।

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স এর তথ্য অনুযায়ী জমিতে ফসল বিনষ্ট হওয়ার কারণে এবং উৎপাদন হ্রাসের কারণে পরবর্তীতে খাদ্যঘাটতি দেখা দিয়েছে। ফলে দেশে দারিদ্র্য ও সামাজিক অসাম্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জনগোষ্ঠীর উপর বন্যার বিরূপ প্রভাব : বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো মাঝারি ধরনের বন্যায় বাংলাদেশে ৭ কোটির অধিক মানুষ যা মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত প্লাবনের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিপন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়বে। সমীক্ষার হিসাব অনুযায়ী গতানুগতিক উন্নয়নধারায় উজান অঞ্চলের দেশসমূহের সাথে অভিন্ন নদ-নদীর পানির প্রাপ্যতা বিষয়ে সহযোগিতা সত্ত্বেও দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে। আর পানি বিনিময়ের ক্ষেত্রে অসহযোগিতা দেখা দিলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে এবং সেক্ষেত্রে ২ কোটি মানুষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জনগোষ্ঠী ও কৃষির উপর লোনা পানির অনুপ্রবেশ, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব : বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে দেশের ১৫ শতাংশ লোকের বসবাস। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি ১০০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পায়, তবে ২৫,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে যা আনুমানিক ৩ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের জীবন ও জীবিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অধিকন্তু, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বেড়ে যাবে, যার প্রভাব পড়বে দেশে অস্থানান্তরযোগ্য ভৌত অবকাঠামো ও জনজীবনের উপর।

৩.৪ ঘূর্ণিঝড়ের কারণ (Causes of Cyclones)

নিম্নচাপ বিশিষ্ট ঝড়কে এক কথায় ঘূর্ণিবাত বলা হয়। একে অন্য কথায় ঘূর্ণিঝড় বা নিম্নচাপজনিত ঝড়ও বলা হয়। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। চাপের সমতা রক্ষার জন্য চতুর্দিকের উচ্চচাপের শীতল বায়ু ঐ কেন্দ্রের দিকে প্রবল বেগে ধাবিত হয় এবং কেন্দ্রে প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে উষ্ণ ও ঊর্ধ্বগামী হয়। এই কেন্দ্রমুখী ঊর্ধ্বগামী বায়ুকে ঘূর্ণিবাত্যা বলা হয়।

উত্তর গোলার্ধে এই বায়ু ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (anti clockwise) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে (clockwise) ঘুরতে থাকে।

ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে সর্বনিম্নচাপ থাকে এবং বাইরের দিকে এই চাপ ক্রমশ বর্ধিত হয়। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের উচ্চতা কখনও কখনও প্রায় ৯.৬ কিলোমিটার এবং ব্যাস ১৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। ঘূর্ণিঝড়ের বায়ু ঘণ্টায় ৪৮ থেকে ১০৮ কিলোমিটার হয়। ৩.১ চিত্রে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ঘূর্ণিঝড়ের প্রকৃতি দেখানো হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় অঞ্চলভেদে দুই প্রকার হয়। যেমন :

(১) ক্রান্তীয় মণ্ডলের ঘূর্ণিঝড় (Tropical cyclone) এবং

(২) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় (Temperate cyclone)।

(১) ক্রান্তীয় মণ্ডলের ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি : এই ঘূর্ণিঝড় সাধারণত ৫ ডিগ্রি হতে ২০ ডিগ্রি উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে উৎপন্ন হয়। এরূপ ঘূর্ণিঝড়ে চারদিক থেকে বায়ু শক্তিশালী নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে অধিক বেগে ধাবিত হয়। বজ্রবিদ্যুৎসহ মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হওয়া এই ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্য। শক্তিশালী একটি ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসসাধন ক্ষমতা ব্যাপক হতে পারে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসও এ ঘূর্ণিঝড়ের সময় ঘটে। ফলে, এতে উপকূলভাগ ও দ্বীপসমূহে প্রচুর জীবন ও সম্পদহানির সম্ভাবনা থাকে। ঝড়ের তীব্রতাভেদে একে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন :

(ক) শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (Strong type of tropical cyclone) : নিরক্ষরেখা হতে প্রায় ৫° উত্তর ও ৫° দক্ষিণ অক্ষাংশে সামুদ্রিক এলাকায় এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় ঘটে। এ ঘূর্ণিঝড় উৎপত্তির কারণ নিম্নরূপ :

(i) সূর্যরশ্মির অতিরিক্ত তাপে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

(ii) তখন বাইরের পার্শ্বদেশের অঞ্চল হতে বাতাস প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হয়।

এ ঝড়ের চতুর্দিকে বায়ু প্রচণ্ড গতিতে (ঘণ্টায় ১০০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার) ঝড়ের সৃষ্টি করে এবং বজ্রসহ মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হয়। ৩.২ চিত্রে বায়ুমণ্ডলের শীতল বায়ু ও উষ্ণ বায়ুর সমন্বয়ে ঘটা ঘূর্ণিঝড়ের জীবনচক্রের ছয়টি ধাপ দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শীতল ও উষ্ণ বায়ুর ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াতেই উভয় প্রকার বায়ুর মধ্যে ঘূর্ণিপাক ঘটে।

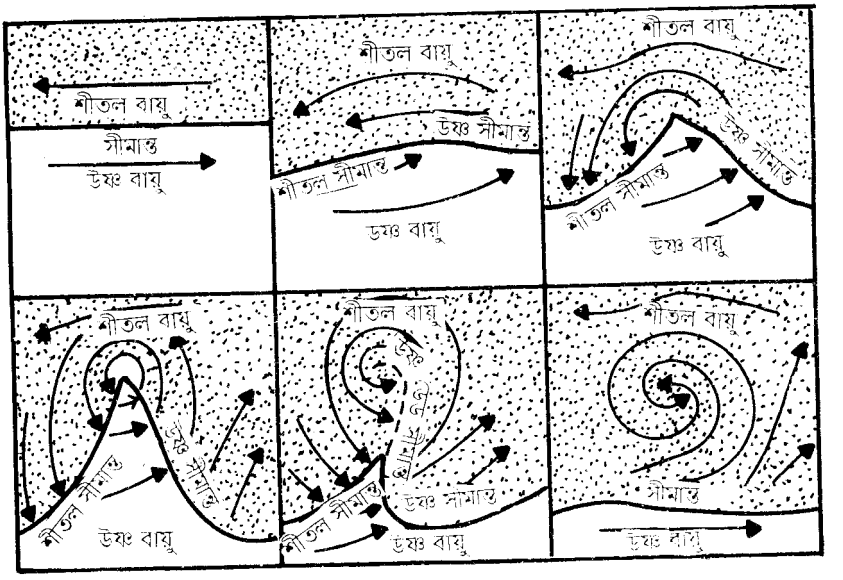

চিত্র ৩.২ : ঘূর্ণিঝড়ের জীবনচক্রের ছয়টি ধাপ।

শীতল বায়ু স্বভাবতই নিচের দিকে নামতে চায় এবং উষ্ণ বায়ু হালকা হয় বলে সেটি উপরের দিকে উঠতে চায়। ফলে বায়ুমণ্ডলে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে বৈশাখ এবং কার্তিক মাসে এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় হতে দেখা যায়।

(খ) দুর্বল ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (Weak Tropical Cyclone) : মৌসুমী বায়ুর আগমনে বঙ্গোপসাগরে এ ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যখন অগ্রসরমান মৌসুমী বায়ু শীতল জলবায়ুর সংস্পর্শে আসে, তখন এই ঘূর্ণিবাতের সৃষ্টি হয়। এ ঘূর্ণিবাত দুর্বল প্রকৃতির এবং ঝড়ের গতিও কম থাকে। কখনও কখনও এটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান করে এবং কয়েকদিন ধরে অনবরত বৃষ্টিপাত ঘটায়। বাংলাদেশে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় দেখা যায়।

(২) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় (Temperate cyclone) : নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উত্তর পূর্ব হতে আগত উষ্ণ ও শীতল বায়ু দক্ষিণ পশ্চিম হতে আগত আর্দ্র ও উষ্ণ বায়ুর সাথে মিলিত হয়। এই বায়ুপুঞ্জের মিলনস্থলে একটি সীমান্ত পৃষ্ঠের (frontal surface) সূচনা হয়। বায়ুপুঞ্জ পরস্পরের বিপরীত দিকে অবস্থান করে বলে এদের সীমান্তে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তখন শীতল বায়ু নিচের দিকে এবং উষ্ণ বায়ু উপরের দিকে উঠতে থাকলে তা

ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই দুই ভিন্নধর্মী বায়ুপুঞ্জের উষ্ণ বায়ু যেখানে শীতল বায়ুর মধ্যে ঢুকে যায়, সে সীমান্তকে উষ্ণ সীমান্ত (warm front) এবং উষ্ণ বায়ুরাশির পশ্চাতে যেখানে শীতল বায়ু এসে উষ্ণ বায়ুকে আঘাত করে, সে সীমান্তকে শীতল সীমান্ত (cold front) বলে। এতে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়।

এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ তেমন বেশি শক্তিশালী বা মারাত্মক নয়। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাতে এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় হতে দেখা যায়। এ ধরনের হালকা ঘূর্ণিঝড় আমাদের দেশেও হয়। বায়ুমণ্ডলীয় বাতাস একবার উত্তপ্ত এবং পরক্ষণেই ঠাণ্ডা অনুভূত হলে সেটি হালকা ঘূর্ণিঝড় বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়।

৩.৫ অনাবৃষ্টি বা খরার কারণ

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণের উপর স্থানীয় আবহাওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে। মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনা বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফল। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকলে সে বায়ুকে আর্দ্র বায়ু বলে এবং বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকলে তাকে শুষ্ক বায়ু বলে। আর্দ্র বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয় এবং শুষ্ক বায়ুর প্রভাবে অনাবৃষ্টি বা খরা হয়।

সুতরাং কোনো এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে এবং স্থানীয় বিচারে বৃষ্টিপাত সমভাবে বণ্টিত না হলে খরা দেখা দেয়। কোনো অঞ্চলের মাটিতে আর্দ্রতার অভাবে দেখা দেয় খরা। এতে ফসল কম হয় এবং উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও পানির অভাবে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে রোপা আমন আবাদের অসুবিধা হয় এবং ধানের ফলনও কমে যায়। আবার শীত মৌসুমে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তুলনায় অধিকমাত্রায় বাষ্পীভবনের কারণে মাটির আর্দ্রতা কমে যায় এবং রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এভাবে খরার কারণে সামগ্রিকভাবে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দেখা দেয় খাদ্যাভাব, বাড়ে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভূমিহীনতা এবং নানা প্রকার সামাজিক সঙ্কটের উদ্ভব হয়।

জনগোষ্ঠী ও প্রকৃতির উপর খরার প্রভাব : বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিম দক্ষিণাঞ্চলে খরার প্রকোপ চলছে। জলবায়ুর মৃদু পরিবর্তনে খরার ব্যাপ্তি আরও বাড়তে পারে এবং বর্তমানের শীত মৌসুমে রবিশস্যের ৩,৬০০ বর্গকিলোমিটার খরা কবলিত এলাকা ভবিষ্যতে ১২,০০০ বর্গকিলোমিটার সম্প্রসারিত হবে। অন্যদিকে, আমন মৌসুমে খরার তীব্রতা বেড়ে যাওয়ার ফলে মধ্যম ধরনের খরা কবলিত এলাকা চরম খরা কবলিত এলাকায় পরিণত হবে।

বাংলাদেশে বর্তমান ৭ কোটি ৩০ লক্ষ লোক খরা কবলিত এলাকায় বসবাস করে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৬৭ শতাংশ। এদের মধ্যে ২৫ শতাংশ চরম খরা কবলিত এলাকায় বসবাস করে। জলবায়ু পরিবর্তন হলে চরম খরা কবলিত এলাকা সম্প্রসারিত হবে এবং মাঝারি খরা কবলিত এলাকা চরম খরা কবলিত এলাকায় পরিণত হবে। বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষা মৌসুমের ফসলের উপর খরার প্রতিকূল প্রভাব

পরিলক্ষিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন হলে দেশের মধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গমের আবাদ অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং আলুর চাষেও ক্ষতি হবে। খরার কারণে ফসলে প্রয়োজনীয় সেচের অভাব দেখা দিবে এবং দেশের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে চাষাবাদ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন হলে দেশে ধান উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় ২৫ শতাংশ হ্রাস পাবে। ফলে, খাদ্যাভাব, গ্রামীণ দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সমস্যাসহ নানাবিধ সামাজিক সঙ্কট দেখা দেবে।

বায়ুর আর্দ্রতা বা শুষ্কতার অনুভূতি দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন :

(১) বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ (Quantity percentage of humidity) এবং

(২) এ অবস্থায় বায়ুকে সংপৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ (Quantity percentage required for saturation)।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, নির্দিষ্ট পাত্রে রক্ষিত বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প থাকে, তাতে এ বায়ু ৩০° সেলসিয়াস উষ্ণতায় শুষ্ক বোধ হবে। কিন্তু বায়ু ২০° সেলসিয়াস উষ্ণতায় আর্দ্র বোধ হবে। বায়ু পুর্নমাত্রায় আর্দ্র হলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকে ১০০ এবং সম্পূর্ণ শুষ্ক থাকলে তার আপেক্ষিক আর্দ্রতা ধরা হয় ০ (শূন্য)। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় বাতাস আর্দ্র বা ভেজা থাকে। তখন বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Specific humidity) থাকে ৯০% এর কম। আমাদের দেশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সে সময়ে বাতাসের আর্দ্রতা ৮০ থেকে ৯২ শতাংশ থাকে এবং শুষ্কতা বিরাজ করে ৮ থেকে ২০%। আবার, যখন অনাবৃষ্টি হয় তখন বায়ুতে শুষ্কতার ভাগ থাকে বেশি। এ সময়ে বায়ুতে শুষ্কতা থাকে ৮০ থেকে ৯২% এবং আর্দ্রতা থাকে ৮ থেকে ২০%। আমাদের দেশে শীতের মৌসুমে এ ধরনের আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়। সে কারণে, বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি এবং খরা মৌসুমে অনাবৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের রাজশাহী এলাকায় বর্ষা ও খরা মৌসুমেও বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকে এবং শুষ্কতার পরিমাণ বেশি থাকে। ফলে, সে এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম হয়। এ কারণে এ এলাকাকে শুষ্ক এলাকা বা বৃষ্টি শূন্য অথবা কম বৃষ্টিপাত এলাকা বলে। বায়ুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির কণা বা তুষার কণা যখন ভেসে বেড়ায় তখন তাকে আমরা মেঘ বলি। অনাবৃষ্টি অঞ্চলে বড় বড় জলাশয় থাকে না বলে সে এলাকায় জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হতে পারে না। ফলে, সেখানে বৃষ্টিপাতও ঘটে না বা ঘটলে তার পরিমাণ থাকে একেবারে নগণ্য।

সুতরাং কোনো এলাকায় অনাবৃষ্টি বা খরার কারণ নিম্নরূপ :

(১) অনাবৃষ্টি এলাকায় বড় আকৃতির জলাশয় থাকে না এবং বন্যার সময় পানি কিছু থাকলেও খরা মৌসুমে তা শুকিয়ে যায়।

(২) জলাশয় না থাকায় পানি রৌদ্রতাপে বাষ্পীভূত ও ঘনীভূত হয়ে মেঘ, কুয়াশা ও শিশিরে উৎপন্ন হয় না।

(৩) বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকে ৮ থেকে ২০%। ফলে, তা দ্বারা মেঘ উৎপন্ন হয় না।

(৪) বছরের পর বছর অনাবৃষ্টি থাকাতে সে এলাকার মাটিতে পানির স্তর নিচে নেমে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি নদী ও জলাধারের প্রবাহ কমে যায়। ফলে বায়ুতে আর্দ্রতার পরিবর্তে অধিক শুষ্কতা বিরাজ করে।

(৫) যে এলাকায় অধিক গাছপালা ও আকাশচুম্বী দালানকোঠা থাকে, সে এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়। কিন্তু যে এলাকায় গাছপালা ও জলাশয় কম থাকে এবং আকাশচুম্বী দালানকোঠা থাকে না, সে এলাকাতে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়।

(৬) বায়ু ভাসমান ধূলিকণা, লবণ কণা, ধোঁয়া, কয়লা চূর্ণ, তড়িতাহত গ্যাসের অণু প্রভৃতিকে আশ্রয় করলে তাতে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়। বায়ুতে এ জাতীয় পদার্থের কণা অধিক থাকলে ৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতার জলীয়বাষ্প কমে যায়। এতে অনাবৃষ্টির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

(৭) সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদ-নদী, হ্রদ, পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ের পানি বাষ্পীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। এই মেঘ অনুকূল অবস্থায় অধিক শীতল হলে তাতে বৃষ্টিপাত ঘটে। এ সময় যদি বায়ুমণ্ডল শীতল না হয়, তাহলে সে মেঘে বৃষ্টিপাত ঘটে না।

৩.৬ ভূমিক্ষয়ের কারণ (Causes of Soil Erosion)

পৃথিবীতে দৃশ্যমান সব কিছুই প্রতিনিয়ত ক্ষয় হচ্ছে, তা আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না। তবে, নদীর পাড়ে যখন পানির ধাক্কায় ভাঙ্গন ধরে, বড় বড় মাটির ঢিবি যখন বিকট শব্দ করে নদীর মধ্যে পতিত হয় তখন আমরা প্রাকৃতিক ক্ষয়ের নমুনা বুঝতে পারি। আবার, প্রচণ্ড বাতাস বা ঝড়ো হাওয়া যখন ধূলিকণা, খড়কুটা, বালি, গাছের ডালপালা প্রভৃতি একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যায় তখনও আমরা প্রাকৃতিক ক্ষয়ের নমুনা বুঝতে পারি। প্রাকৃতিক ক্ষয়কার্যকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়, যেমন :

১। বায়ুর ক্ষয়সাধনকার্য (Wind Erosion),

এই ক্ষয়কার্য নিম্নবর্ণিত তিনটি প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়—

(ক) সংঘর্ষজনিত ক্ষয়কার্য (Abrasion erosion),

(খ) অপসারণজনিত ক্ষয়কার্য (Deflation erosion) এবং

(গ) ঘর্ষণজনিত ক্ষয়কার্য (Friction erosion)।

২। পানির ক্ষয়সাধন কার্য (Marine Erosion)।

প্রাকৃতিক ক্ষয়সাধনকার্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো।

১। (ক) সংঘর্ষজনিত ক্ষয়কার্য (Abrasion erosion) : মরুভূমি অঞ্চলে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, মাটির ঢিবি ইত্যাদি এলোপাতাড়িভাবে অবস্থান করায় প্রচণ্ড বেগে প্রবাহমান বাতাস বা ঝড়ো হাওয়ার আঘাতে সেগুলো ভেঙ্গে যায়। ফলে, এগুলো কালক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ও বালুকণায় পরিণত হতে থাকে। বহু বছর ধরে এ প্রস্তরখণ্ড ও বালুকণাযুক্ত বাতাসের ঘর্ষণে শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

বালুকার মধ্যে কঠিন কোয়ার্টজ (quartz) থাকায় এরই ঘর্ষণে ক্ষয়কার্য দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। এই কোয়ার্টজ এর ঘর্ষণে শিলাখণ্ডের কোথাও আঁচড়কাটা দাগের মতো

(scratching), কোথাও গভীর ক্ষতের মতো দাগ (grooving), আবার কোথাও বা মৌচাকের মতো (honey combing) অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। বাতাসের গতি কম অথবা বেশির কারণে অবঘর্ষ বা সংঘর্ষজনিত ক্ষয়কার্যের পরিমাণ ক্ষেত্রবিশেষে কম অথবা বেশি হতে পারে।

৩.৩ চিত্রে বায়ুতাড়িত বালি দ্বারা অবঘর্ষজনিত ক্ষয়প্রাপ্ত শিলার দুটি আকৃতি দেখানো হয়েছে। এ দুটির মধ্যে উপরের ক্ষয়জনিত প্রস্তরখণ্ডের নাম দেয়া হয়েছে জিউগেন (Zeugen) এবং নিচে প্রদর্শিত শিলাখণ্ডের নাম ইয়ার্দাং (Yardangs)।

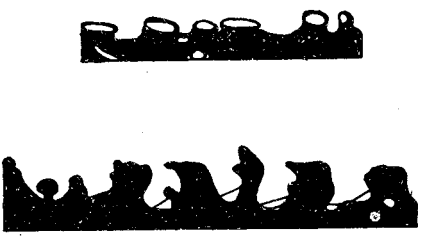

চিত্র ৩.৩ : বায়ুর অবঘর্ষজনিত ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা।

ঘর্ষণ বা সংঘর্ষজনিত কারণে ক্ষয়ের তারতম্যভেদে মৃত্তিকা বিজ্ঞানীগণ চিহ্নিতকরণের জন্য এই নাম দিয়ে থাকেন। জিউগেন দেখতে ব্যাঙের ছাতার ন্যায়, যার উপরের অংশ চওড়া ও চ্যাপ্টা এবং নিচের দিক সরু হয়।

অনেক সময় বাতাসের ঘর্ষণে ভূমি ও প্রস্তর খণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গর্তের সৃষ্টি করে একটি অংশকে অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এমতাবস্থায় যে মৃত্তিকা অথবা প্রস্তর খণ্ডের মূর্তি প্রস্তুত হয় তাকে বলে ইয়ার্দাং।

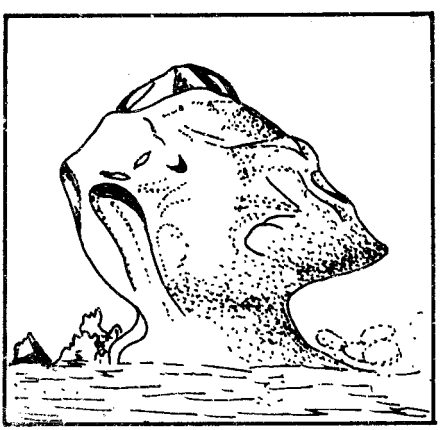

চিত্র ৩.৪ : বায়ুতাড়িত বালি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা গৌর।

সাহারা মরুভূমিতে বায়ুতাড়িত বালি দ্বারা শিলাখণ্ড অসমানভাবে ক্ষয় হয়ে নিচের অংশ অনেক সরু হয় এবং উপরের দিকে সে তুলনায় বিস্তৃত থাকে। এমতাবস্থায় সেটিকে একটি মানুষের মূর্তির মতো বলে মনে হয়।

এ ধরনের ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখণ্ডকে গৌর (gour) (চিত্র ৩.৪) বলে। বিরাট এলাকা জুড়ে দণ্ডায়মান এ ধরনের মূর্তি মরুভূমির অনেক স্থানেই দৃশ্যমান হয়।

(খ) অপসারণজনিত ক্ষয়কার্য (Deflation erosion) : প্রচণ্ডবেগে প্রবাহমান বায়ু সূক্ষ্ম বালুকণাকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এর ফলে যে ধরনের ক্ষয় হয় তাকে অপসারণজনিত ক্ষয়কার্য বলে। এই প্রক্রিয়ায় ভূ-ভাগের কোথাও নিচু এবং কোথাও উঁচু হয়ে যায়। আবার এতে কোথাও কোথাও বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়।

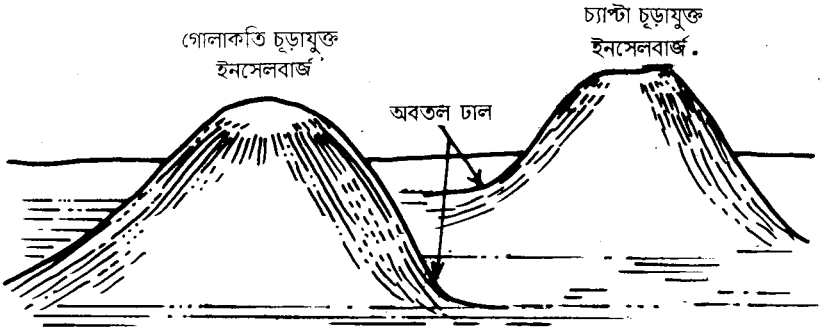

চিত্র ৩.৫ : মরু অঞ্চলে বায়ুতাড়িত ক্ষয়কৃত অবশিষ্ট পর্বত।

অবঘর্ষ ও অপসারণজনিত কারণে মরু অঞ্চল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং বালু, মৃত্তিকা প্রভৃতি অপসারণের ফলে বহু অবনমিত (depression) অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। এতে অপেক্ষাকৃত কঠিন শিলাখণ্ড ক্ষয়কার্য প্রতিরোধ করে ভূমিতল হতে উচ্চ পর্বতরূপে অবস্থান করে। এ ধরনের আকৃতিবিশিষ্ট প্রস্তর খণ্ডের পর্বতকে ভূ-তত্ত্ববিদগণের মতে ইনসেলবার্জ (inselberg) বলা হয়। কালাহারি মরুভূমিতে এ ধরনের ক্ষয়িষ্ণু পর্বতের অবশিষ্টাংশ দৃষ্টিগোচর হয় (চিত্র ৩.৫)।

বালুকারাশি অপসৃত হওয়ায় অবনমিত অঞ্চলটি যখন ভূমিস্থ পানির স্তরের সীমানায় পৌঁছে তখন, ভূ-পৃষ্ঠের পানি বের হয়ে এসে লবণ হ্রদ (salt lake) এবং কখনও কখনও এতে গাছপালা জন্মে মরুদ্যান সৃষ্টি করে। মরুদ্যান মরু অঞ্চলের অর্থনীতিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) ঘর্ষণজনিত ক্ষয়কার্য (Friction erosion) : বায়ুপ্রবাহের ঘর্ষণে যেমন মৃত্তিকা ও শিলাখণ্ড ক্ষয় হয়, সেরূপ প্রস্তর খণ্ডের পরস্পর ঘর্ষণের ফলে প্রতিটিতেই ক্ষয় হয়। আবার, কোনো কোনো প্রস্তর ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে ক্ষুদ্র বালুকণায় পরিণত হয়। বালুকণাই হলো মরু অঞ্চলের ক্ষয়সাধন কার্যের শেষ পর্যায় এবং পরস্পর ঘর্ষণ প্রক্রিয়া এই অঞ্চলের বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডগুলোকে এ ধরনের বালুকণায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

২। **পানির ক্ষয়সাধন কার্য** (Marine erosion) : বন্যার সময় নদীর পাড় পানির স্রোত ও ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। একই সময়ে নদীর অপরকূলে ভাঙ্গনের লেশমাত্র থাকে না, বরং সেই পাড় গড়ে। প্রকৃতপক্ষে, পানির ক্ষয়সাধন কার্য সংঘটিত হয় সমুদ্র তরঙ্গ এবং সমুদ্রস্রোত দ্বারা। পৃথিবীর সব সমুদ্র উপকূলভাগের ক্ষয় ও ভাঙ্গন লক্ষ্য করলেই তা অনুমান করা যায়। সামুদ্রিক ক্ষয় প্রধানত সমুদ্র তরঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে।

সমুদ্র তরঙ্গ যখন অগভীর পানিতে এসে মিলিত হয় তখন তরঙ্গের চূড়া (crest of waves) ক্রমশ খাড়া ও কুণ্ডলিত হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। এভাবে ভগ্ন জলরাশি সজোরে সৈকতের (beach) উপর আছড়ে পড়ে। এই জলরাশি পরে সৈকতের ঢাল বরাবর পুনরায় সমুদ্রে ফিরে আসে।

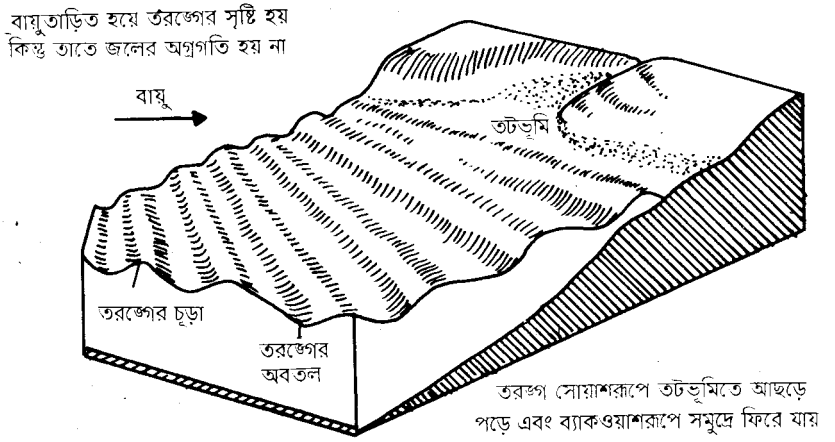

চিত্র ৩.৬ : সমুদ্র উপকূলে মূল ভূ-খণ্ড ও শিলা খণ্ডে ক্ষয়ের পার্থক্য প্রদর্শন।

সমুদ্র তরঙ্গের উচ্চতা ও শক্তি নির্ভর করে বায়ুপ্রবাহের শক্তির উপর। বায়ুপ্রবাহের এই শক্তি আবার উন্মুক্ত জলরাশি বা সমুদ্রের গভীরতার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহ কি পরিমাণ উন্মুক্ত সমুদ্র অতিক্রম করে এসেছে, তার দূরত্বের উপর বায়ুপ্রবাহের আঘাত প্রয়োগের শক্তি নির্ভর করে। উন্মুক্ত সমুদ্রের এই দূরত্বকে ফেচ (fetch) বলে। এ কারণে, উন্মুক্ত সমুদ্রের উপকূলভাগ বায়ুপ্রবাহের সর্বাধিক "ফেচ" বলে বৃহদাকার তরঙ্গের আঘাতে পাড় দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রের বিনাশ তরঙ্গ (destructive wave) দ্বারা উপকূলভাগে শিলা ক্ষয় হয়। সমুদ্র যেখানে মূল ভূ-খণ্ডের সাথে মিলেছে, সেখানে ক্ষয়ের মাত্রা সমান থাকে এবং এরপর ক্রমশ ঢালু থাকে। তরঙ্গের আঘাতে পাড়ের শিলাখণ্ড ক্ষয় হয়ে খাঁজের (notch) সৃষ্টি এবং তটভূমিতে শিলা সঞ্চিত হয়। খাঁজটি বড় হলে মোটা খাড়া পাড়রূপে সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে এবং তার তলদেশে শিলামঞ্চের সৃষ্টি হয়। শিলামঞ্চের সম্মুখভাগে সমুদ্র সৈকতের সৃষ্টি হয়। ৩.৬ চিত্রে সামুদ্রিক তরঙ্গজনিত ক্ষয়প্রক্রিয়া এবং ৩.৭ চিত্রে বিভিন্ন ধরনের পাড়ে সমুদ্র তরঙ্গ কর্তৃক ক্ষয় প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রের উপর ঝুঁকে পড়া উঁচু খাড়া পাড় দুই প্রকার মূর্তির সৃষ্টি করে। যেমন :

(ক) উঁচু খাড়া পাড় বা ভূখণ্ড এবং (খ) তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চ (wave-cut platform)।

সমুদ্র উপকূলের ভূ-খণ্ড ক্রমশ ঢালু হয়ে সমুদ্রে এসে মিশলে সেখানে উচ্চ ভূমি ভাগের উপর তরঙ্গ এসে আঘাত করে। ফলে, এ ঢালু মসৃণ ভূমি ভাগের উপর একটি খাঁজের সৃষ্টি হয়। এই খাঁজ কালক্রমে তরঙ্গের আঘাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেখানে তরঙ্গের আঘাত বেশি পড়ে সেখানকার প্রস্তর ক্ষয় হয়ে উঠে যায়। আবার, যেখানে তরঙ্গের আঘাত কম লাগে সেখানকার প্রস্তর খণ্ড অবিকৃত অবস্থায় খাড়া থাকে।

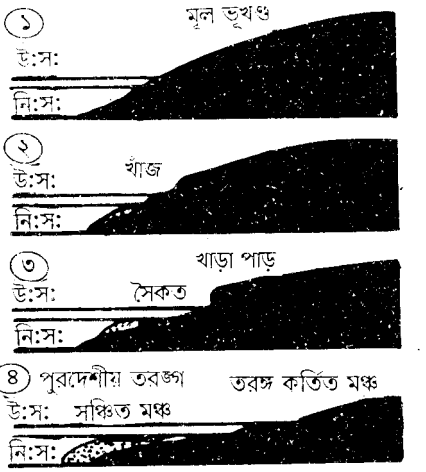

চিত্র ৩.৭ : সমুদ্র তরঙ্গের পাড়ে আঘাত করার ফলে সৃষ্ট মূর্তিসমূহ।

৩.৭ চিত্রে সমুদ্র তরঙ্গ পাড়ে আঘাত করার ফলে সৃষ্ট ভূ-খণ্ড, স্ট্যাক, গুহা ইত্যাদি মূর্তি দেখানো হয়েছে।

৩.৭ লবণাক্ততার কারণ (Causes of Salinity)

কথিত আছে যে, জেলে অথবা নাবিক সমুদ্রের পানিতে চলার সময় যে খাবার তৈরি করে, সে খাবারে অতিরিক্ত লবণ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। সমুদ্রের পানিতে লবণ থাকে এবং লবণ থাকার এই গুণাগুণকে লবণাক্ততা বলে। সমুদ্রের পানিতে অনেক ধরনের লবণ থাকে। এতে শতকরা ২.৭৫% সাধারণ লবণ বা ভোজ্য লবণ থাকে এবং সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হলে এই লবণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশের খুলনা জেলায় বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। সেখানে মাটির নিচে থেকে সংগৃহীত পানিতে লবণাক্ততার প্রমাণ মেলে। সমুদ্রের পানিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা ভোজ্য লবণ, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ক্যালসিয়াম সালফেট থাকে। এতে ৩.৫% দ্রবীভূত লবণ থাকে, তার মধ্যে ভোজ্য লবণের পরিমাণ ২.৭৫%। তবে, এ লবণের পরিমাপ সর্বত্র সমান নয়।

সমুদ্রের তলদেশে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত লাভার সাথে যে লবণ সঞ্চিত ও দ্রবীভূত তা সমুদ্রের পানিকে লবণাক্ত করে। সমুদ্রের পানিতে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে ণাক্ততার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ : খুলনাতে ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে ণাক্ততার স্বাভাবিক গড় প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ৫০০–১০০০ মাইক্রোম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ,৬০০ মাইক্রোম-এ উন্নীত হয়েছে। ভৈরব নদীর লবণাক্ততা ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে ০০ পিপিএম ছিল, পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২০০ পিপিএম-এ দাঁড়িয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলো বঙ্গোপসাগরে মিশে যাবার ফলে সে নদীর পানিতে লবণাক্ততার া বেড়ে চলেছে। এ অবস্থা উদ্বেগজনক।

লবণাক্ততা বেশি বা কম হওয়ার কারণ নিম্নরূপ :

১। **বাষ্পীভবন** (Evaporation) : বাষ্পীভবনের উপর মুদ্রের পানির লবণাক্ততার া বা পরিমাণ নির্ভরশীল। অধিক বাষ্পীভবনের ফলে পানির পরিমাণ হ্রাস পেলে লবণের িমাণ তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। তাই বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বরিশাল ও খুলনা লার উপকূলভাগে যেখানে পানির লবণাক্ততার পরিমাণ বেশি, সেখানে সমুদ্রের পানিকে ীভবনের মাধ্যমে লবণ উৎপন্ন করা হয়।

২। **বৃষ্টির পানি** (Precipitation water) : বৃষ্টির পানিতে কোনো লবণ থাকে না এবং ট সর্বদাই সুপেয়। বৃষ্টিপাত অধিক হলে সে এলাকায় সুপেয় পানির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় নির লবণাক্ততা হ্রাস পায়। অথচ শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় বলে সে এলাকায় দ্রের পানিতে লবণাক্ততা বেশি থাকে। এজন্য বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের পানি শুষ্ক অঞ্চলের নি অপেক্ষা কম লবণাক্ত হতে দেখা যায়। বৃষ্টির পানিতে লবণাক্ততা থাকে না ল আজকাল দেশের বিভিন্ন এলাকায় অনেক লোকই বৃষ্টির পানি বড় আধারে ধরে খ। ভারি বর্ষণের সময় ৫ মিনিট পরেই আধারের ঢাকনা খুলে এই বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা ।

৩। **নদীবাহিত পানির পরিমাণ** : দেখা গেছে যে, শুধু বৃষ্টির পানি নয়, অধিক িমাণ নদীর পানি সমুদ্রে পতিত হলে সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ হ্রাস পায়। লাদেশে অধিক সংখ্যক নদী রয়েছে এবং নদীগুলো সমুদ্রের সাথে মিশে গেছে বলে দেশের কূলভাগে প্রাপ্ত পানির মধ্যে লবণের পরিমাণ কম পাওয়া যায়। যে কারণে, আমাদের তা নদীবহুল দেশে লবণ তৈরির কারখানাগুলো লাভজনক অবস্থায় যেতে পারছে না। যে শ নদীর সংখ্যা কম এবং কম নদীই সমুদ্রের সাথে মিশেছে, সে দেশের সমুদ্রের পানিতে ণাক্ততার পরিমাণ বেশি।

৪। **সমুদ্রের পানির অবাধ সঞ্চালন** (Free movement of Ocean water) : সমুদ্র উন্মুক্ত হবে, এর পানি সমুদ্র স্রোতের ধাক্কা ও টানে তত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ান্তরিত হবে। ফলে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের পানি থেকে কম অথবা বেশি লবণাক্ততার নিতে মিশ্রিত হবার সুযোগ হবে। আবার আবদ্ধ পানির লবণাক্ততা বেশি থাকে। এই পানির থ সমুদ্র তরঙ্গের সংযোগ ঘটলে পানি অধিকহারে লবণাক্ত হয়। তবে, খাবার ও ফসলের ্য লবণাক্ততা ক্ষতিকর।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা কম অথবা বেশির পরিমাণ নিম্নরূপ :

ক. নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের উপর দিয়ে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, বড় নদীসমূহ সমুদ্রে মিশে যায় বলে এ এলাকায় সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ থাকে ৩.৫%।

খ. কর্কট ক্রান্তীয় ও মকর ক্রান্তীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয়। সেখানে লবণাক্ততার পরিমাণ থাকে ৩.৭%।

গ. মরু অঞ্চলের বরফ গলা পানি সমুদ্রে মিশে যায়। এ এলাকায় সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততা থাকে ৩.৪%।

ঘ. ভূ-মধ্যসাগর আংশিকভাবে স্থলবেষ্টিত থ.কে এবং উন্মুক্ত সাগরের ন্যায় এর পানি সঞ্চালিত হয় না। ফলে, এ সাগরে পানির লবণাক্ততা বেশি (৪.০%) পাওয়া যায়।

ঙ. লোহিত সাগরের পানিতেও লবণাক্ততার পরিমাণ ৩.৬ – ৪.০% পাওয়া যায়।

চ. কৃষ্ণ সাগরে বহু বৃহৎ নদী (ডন, নিপার, নিস্টার প্রভৃতি) পতিত হওয়ায় এর পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ কম (১.৪%)।

ছ. কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরাংশে ভল্গা, ইউরল প্রভৃতি নদী মিলিত হয়েছে বিধায় এর লবণাক্ততার পরিমাণ ১৩% পাওয়া যায়।

জ. দক্ষিণ পূর্বে কারাবোগাজ (Kara Bogaz) উপসাগর প্রধান হ্রদ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এর লবণাক্ততার পরিমাণ অধিক (১৭%)।

ঝ. মরুসাগরে অধিক বাষ্পীভবন এবং অল্প সংখ্যক নদীর পানি পতিত হওয়ার জন্য এর পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ অধিক (২৩.৮%) পাওয়া যায়।

ঞ. যুক্তরাষ্ট্রের উটা প্রদেশের লবণ হ্রদের পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ ২২.০% পাওয়া যায়।

ট. মাইনরের ভ্যান হ্রদের পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, যার পরিমাণ ৩৩.০%।

লবণাক্ততার প্রভাব (Effect of Salinity) : মিঠা পানি এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রভাব নিম্নরূপ :

১. লবণাক্ত পানি বিস্বাদ হয় এবং এই পানি খেলে পেটের পীড়া হয়।

২. মিঠা পানি এলাকায় লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়লে সেখানকার মাছের প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

৩. কৃষিক্ষেতে লবণাক্ত পানি প্রবেশের ফলে ফসলের গোড়া পচে যায় এবং ফলন বহুলাংশে কমে যায়।

৪. লবণাক্ত এলাকায় খাবার পানির জন্য মিঠা পানি সংগ্রহ করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

৫. লবণাক্ত পানি বয়লার, পানির পাইপ, টারবাইন, ব্লেড প্রভৃতির জন্য ক্ষতিকর। তাই, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল বা এই এলাকায় মিঠা পানি সংগ্রহের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়।

৬. পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের অনেক গাছপালাতেই মড়ক ধরে।

৭. লবণাক্ত পানি ক্ষারকীয়, তাই এই পানিতে বিভিন্ন ধরনের জলজ প্রাণীও বাঁচতে পারে না। তবে, সামুদ্রিক মাছের জন্য এই পানি ক্ষতিকর নয়।

৮. লবণাক্ত পানির এলাকায় মাটিও এই গুণাগুণ পেয়ে যায়। সেজন্য লবণাক্ত এলাকার মাটিতে মিঠা পানির এলাকার ফুল-ফল ও অন্যান্য গাছপালা জন্মাতে পারে না।

৩.৮ বন্যা ব্যবস্থাপনা (Flood management)

যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোনো দেশের সমুদ্র ও নদ-নদীর অবস্থান, প্রবাহিত নদ-নদীর উৎস, ভূ-প্রকৃতি, মাটির অবস্থা ও গুণাগুণ ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রাকৃতিক পানির নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই পানি সম্পদকে ব্যবহারের পথ দেখানো হয়, তাকে বন্যা ব্যবস্থাপনা বলে। বন্যা কোনো দেশের জন্য বিপদ আবার কোনো দেশের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। বন্যার পানিকে কোনো প্রকাণ্ড জলাধারে জমা করে সেখান থেকে পানি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় এবং খরা মৌসুমে এই পানি নদীতে সরবরাহ করে নদীর প্রয়োজনীয় নাব্যতা বজায় রাখা যায়।

বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় বিশেষজ্ঞ এবং বিদেশ থেকে আগত বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত দলের যৌথ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এগারোটি সাহায্যকারী নীতি (eleven guiding principles) গঠিত হয়। এ নীতিগুলো নিম্নরূপ :

১. খাদ্য পরিকল্পনার (Food plan) ক্রমোন্নতি ঘটার বাস্তবায়ন। এটি যাদের উদ্দেশ্যে করা হয়—

ক. গ্রামাঞ্চলের অবকাঠামো রক্ষা করা (protecting rural infrastructure),

খ. কৃষিকার্য (Agriculture), মৎস্য বিভাগ (Fisheries), নৌবাহ- বিজ্ঞান (Navigation), শহর এলাকায় পানি সরবরাহ এবং ভূ-উপরিভাগ ও ভূ-মধ্যকার পানি সম্পদের পুনঃখননকরণ।

২. বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রিত বন্যার পানি প্রবাহের (controlled flooding) মাধ্যমে সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত এলাকাগুলোয় কার্যকর ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা (effective land and water management) বাস্তবায়ন।

৩. বন্যাপূর্ব সতর্কীকরণ মজবুত এবং বন্যা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যবস্থাপনা।

৪. বন্যার খবর পূর্বে প্রচার এবং সতর্কীকরণ কাজের অগ্রগতি (Improvement of flood forecasting and early warning)।

৫. নদী প্রবাহিত হবার পথে দুই বা ততোধিক বড় নদীর আড়াআড়ি মিলনের সঙ্গমস্থল, উভয় নদীর পাড় উঁচু করে বাঁধাই করা এবং উভয় নদীর পানির প্রবাহ পথে খাল খননের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে পানি গড়িয়ে যাবার ব্যবস্থা করা।

৬. নদীর পানি প্রবাহের দিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তার পাড় এবং শহর রক্ষাকরণ বাঁধ নির্মাণ।

৭. পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, পানির সংরক্ষণাগার প্রস্তুতে উৎসাহিত করা, খালসমূহ উন্নত করা এবং কার্যকর পানি নিষ্কাশন কাঠামো অন্তর্ভুক্তকরণ।

৮. বিভিন্ন এলাকা বন্যামুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয়তা যাচাই এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া।

৯. যেসব রেলওয়ে রাস্তা থেকে পানি নিষ্কাশনে সমস্যা হয়, তা অগ্রাধিকারভিত্তিতে চিহ্নিত করা, বড় রাস্তা (highway) এবং গ্রামের রাস্তাগুলো নির্মাণ ও যথাযথ সময়ে পরিকল্পনা গ্রহণ (co-ordinated planning)।

বন্যা সম্পর্কে কার্যকর পরিকল্পনা : ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা ব্যবস্থাপনা, কৃষি উন্নয়ন, পানি সেচ, বন্যা পূর্ব প্রচার, বন্যা সতর্কীকরণ (flood warning), বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া লোকদের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কাজের জন্য ১৯৯০ থেকে একটি কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৩.৯ পরিবেশ দূষণ (Environment Pollution)

কোনো বস্তু অথবা দ্রব্য যখন স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়,পরিবেশ বিনষ্ট করে তখন তাকে দূষিত দ্রব্য বলে। আর যে অবস্থার প্রেক্ষিতে সে দ্রব্য স্বাস্থ্যহানিকর কাজ করে, সে অবস্থাকে দূষিত অবস্থা বলে। একটি ফলে যখন পচন ধরে, তখন সেটি দেখতে কুৎসিত হয়, তা দিয়ে দুর্গন্ধ বেরোয়, তাতে মাছি বসে ডিম পাড়ে এবং রোগজীবাণু ছড়ায়। সে ফল কেউ ভক্ষণ করলে তার পেটের রোগ দেখা দেয়। যদি এ ফল খেয়ে কারো কলেরা রোগ হয় তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। যার কারণে একাধিক ব্যক্তি সংক্রমিত হতে পারে। সুতরাং দূষিত কোনো জিনিস দ্বারা সমগ্র পরিবেশ দূষিত হতে পারে।

যে বস্তু দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয় তাকে দূষক বলে। পরিবেশ দূষককে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন :

(১) শক্তি বিষয়ক দূষক : আলো, তাপ, শব্দ, তেজস্ক্রিয়তা, প্রভৃতি।

(২) রাসায়নিক দূষক : (ক) জৈব : প্রস্রাব, গরুর জাবরকাটা থেকে সৃষ্ট মিথেন।

(খ) অজৈব : ফসফেট, নাইট্রেট, CO_2, H_2S প্রভৃতি।

(গ) প্রাকৃতিক : CO, CO_2, SO_2

(ঘ) কৃত্রিম : পি. ভি. সি (PVC), বি.এইচ.এম (BHM) প্রভৃতি।

(৩) জীব জাতীয় দূষক : ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রভৃতি।

পরিবেশ দূষণ দুটি কারণে ঘটে থাকে, যেমন :

১। প্রাকৃতিক কারণ (Natural causes) এবং

২। মানুষ সৃষ্ট বা কৃত্রিম কারণ (Man made or Artificial causes)। উভয় প্রকার কারণের বর্ণনা নিচে দেয়া হয়েছে।

১। প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes) : পরিবেশ দূষণের প্রাকৃতিক কারণ এবং তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :

(ক) খরা : অনাবৃষ্টি বা খরার কারণে খাল-বিলের মাছ, জলজ প্রাণী এবং জীবজন্তু মরে পচে পরিবেশের দূষণ ঘটায়।

(খ) বন্যা : বন্যার পানি গ্রামের পায়খানা, প্রস্রাবখানা, মরা জীবজন্তু একাকার করে পানি এবং পরিবেশ দূষণ ঘটায়।

(গ) ভূমিকম্প : ভূমিকম্পের কারণে বিভিন্ন এলাকায় মানুষজন, জীবজন্তু মাটি ও গাছপালা চাপা পড়ে মারা যায় ফলে পরিবেশ দূষণ ঘটে। এটির উদাহরণ জাপান ও ভারতের কিছু এলাকার ঘটনা।

(ঘ) ঘূর্ণিঝড় : সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন প্রভৃতি ঘটলে সে এলাকার মানুষজন, জীবজন্তু, পশুপাখি মারা যায় এবং পানি পচে পরিবেশ দূষণ ঘটে।

(ঙ) মহামারি : বন্যার পরে খরা, অতিবর্ষণ ইত্যাদির কারণে কলেরা, আমাশয়, বসন্ত ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং পরিবেশের দূষণ ঘটে। কারণ, এই রোগ ভাইরাস দ্বারা ছড়ায়।

(চ) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত : আগ্নেয়গিরির লাভা উদগিরণের সময় বিস্তীর্ণ এলাকা কলুষিত হয়, পুড়ে যায়, ভূমি ধ্বংস হয় এবং এতে মানুষজন, পশুপাখি প্রভৃতি মারাও যায়। এতে পরিবেশ দূষণ ঘটে।

(ছ) জলোচ্ছ্বাস : সমুদ্র উপকূল এলাকায় পানি বেড়ে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ঢুকে পড়লে অনেক প্রাণহানি ঘটে। এতে পরিবেশ দূষিত হয়।

২। কৃত্রিম কারণ (Artificial causes) : পরিবেশ দূষণে কৃত্রিম কারণ এবং তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :

(ক) যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ : অশিক্ষার কারণে গ্রামে-গঞ্জের কিছু কিছু মানুষ যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করলে পরিবেশ দূষিত হয়।

(খ) কাঁচা পায়খানা ব্যবহার : গ্রামেগঞ্জে অধিকাংশ পায়খানা কাঁচা, ফলে হাঁস-মুরগি, পাখি ইত্যাদি দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়। বন্যার সময় এগুলো পানিতে মিশেও দূষণ ঘটায়।

(গ) শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি : শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থাকলে জমাকৃত পচা আবর্জনা পরিবেশের দূষণ ঘটায়।

(ঘ) অসঙ্গতিপূর্ণ নগরায়ণ : নগরায়ণের ফলে অনেক বেকার লোকই কাজের সন্ধানে শহরে বস্তিতে বাস করে এবং তাদের দ্বারা পরিবেশের দূষণ ঘটে।

(ঙ) কীটনাশক ব্যবহারে ত্রুটি : বন্যার সময় ফসলের ক্ষেতে অতিমাত্রায় কীটনাশক দিলে তা পানির সাথে পুকুর ও নদীতে মিশে পানির দূষণ ঘটায়। এতে মাছ মরে যায় এবং মানুষের গায়ে চর্মরোগ হয়, পেট খারাপ হয় ইত্যাদি।

(চ) শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য অপসারণ : শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে অপরিশোধিত বর্জ্য যত্রতত্র নিষ্কাশনের জন্য নদী ও খালবিলের পানি দূষিত হয় এবং এতে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় ঘটে।

(ছ) রাস্তাঘাট ও ইটভাটা এলাকার বৃক্ষ নিধন : মোটরগাড়ি ও ইটভাটা থেকে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গত হয়। গাছপালা থাকলে এ গ্যাস প্রশমিত হয়। অন্যথায়, পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে।

(জ) গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রকোপ বৃদ্ধি : শিল্প কারখানা, মোটরযান প্রভৃতি থেকে CO, CO_2 ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত হয়। এতে মানুষজন, পশুপাখি প্রভৃতির শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ও স্বাস্থ্যহানী ঘটে। ফলে, পরিবেশের বিপর্যয় হয়।

(ঞ) অধিকহারে ভূ-গর্ভস্থ পানি আহরণ : ভূ-গর্ভস্থ পানি অধিকহারে আহরণ করা বিপদজনক। এতে পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে এবং সে এলাকা ভবিষ্যতে মরুময়তার দিকে এগিয়ে যায়। ফলে পরিবেশ দূষণ ঘটে।

(ট) গাছপালা নিধন : বনজ সম্পদ দেশের আবহাওয়া স্বাভাবিক রাখে। গাছপালার কারণে সে এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়, ভূমি ধ্বস রোধ হয়। তাই, গাছপালা নিধন করলে সে এলাকায় খরা প্রবণতা বেড়ে যায় ও পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে।

(ঠ) জলাভূমি ভরাট : ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করলে পরিবেশ ভালো থাকে এবং জলাভূমি ভরাট করলে মাটি শুষ্ক হয়ে যায়, মরুময়তার সৃষ্টি হয়। এতে পরিবেশ নষ্ট হয়।

(ড) পাহাড় ও টিলা কর্তন : যে এলাকায় পাহাড় ও টিলা থাকে, তার অদূরেই সাগর ও জলাভূমি থাকে। পাহাড় ও টিলা কর্তন করলে এর ব্যতিক্রম ঘটে, পরিবেশ নষ্ট হয় এবং ঝড়ের প্রকোপ বেড়ে যায়।

(ঢ) শিল্প ও জ্ঞানের অভাব : অশিক্ষিত ও অজ্ঞ ব্যক্তি পরিবেশ বিপর্যয় সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না। ফলে, তার দ্বারা ঘর, বাড়ি, সমাজ প্রভৃতির পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।

(ণ) অসামাজিক কাজকর্ম : সমাজে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস বেড়ে গেলে পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।

৩.১০ নগরায়ণ (Urbanization)

একটি এলাকায় যখন ব্যবসা-বাণিজ্য, লোক-বসতি, লোক-সমাগম, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সেখানে নগরায়ণ ঘটে। নগরায়ণের ফলে গ্রামের লোক শহরগামী হয়। গ্রামে যেসব ফসল উৎপন্ন হয়, উৎপন্নস্থলে মূল্য বেশি পায় না। সে কারণে তারা শহরের দিকে এসে বেশি মূল্য পাবার চেষ্টা করে। শহরের জনগণের আয় তুলনামূলকভাবে বেশি বিধায়, সেখানে দালান-কোঠা, রাস্তাঘাট, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি একটি নিয়ন্ত্রিত উপায়ে দ্রুত ঘটে থাকে। এ কাজের জন্য শহরের পৌর অঞ্চলে জনগণের ভোটে চেয়ারম্যান

নির্বাচিত হয় এবং বড় শহরে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন হয়। সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক ও বর্জ্য ব্যবস্থা দেখাশুনার দায়িত্ব থাকে সিটি কর্পোরেশন মেয়রের উপর।

শহরের শিল্প কারখানা বেড়ে যাওয়ায় সেখানে কর্মসংস্থানও বাড়তে থাকে। লোকজনের যাতায়াতের জন্য যে পরিবহণের দরকার হয়, তার জন্যও রিক্সা, ভ্যান, মোটরযান ইত্যাদির প্রয়োজন হয় এবং এতেও কিছু স্বল্প আয়ের লোকের কর্মসংস্থান হয়। স্বল্প আয়ের কর্মজীবীগণ একত্রে বসবাস শুরু করে। ফলে, সেখানে কালক্রমে বস্তির সৃষ্টি হয়। আর, এ কারণে শহরের পরিবেশ খারাপ হতে থাকে। সুতরাং গ্রামীণ জনসংখ্যা আয়-রোজগারের জন্য কর্মসংস্থান ও বসবাসের উদ্দেশ্যে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ভীড় জমালে যে প্রক্রিয়ায় শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাকে নগরায়ণ বলে।

পৌরকরণ ব্যবস্থা : পৌরবাসীদের নিকট হতে বাৎসরিক হারে কর (Tax) আদায় করা হয়, যাকে পৌরকর বলে। এই করের অর্থ দিয়ে কর্পোরেশনে কর্মরত চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনার, প্রকৌশলী, অফিসার, কর্মচারি, ময়লা পরিষ্কারক, ঝাড়ুদার ইত্যাদি পদে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন দেয়া হয়। পৌর এলাকা উন্নয়নের জন্য সরকারের তরফ থেকেও একটা অনুদান আসে প্রতি বছর। পৌর এলাকার উন্নয়ন কাজ টেণ্ডারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সুতরাং, পৌরকরণ ব্যবস্থার আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সংঘটিত হয়। যেমন :

১. শহর এলাকায় প্ল্যান (Plan) মোতাবেক রাস্তাঘাট নির্মাণ,

২. শহর এলাকায় পানি সরবরাহ,

৩. শহর এলাকায় রাস্তাঘাট, বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা এবং অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণের ব্যবস্থাকরণ,

৪. শহর এলাকার অধিবাসী ও পথচারীদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে পুলিশ, আনসার ও পাহারাদারের ব্যবস্থাকরণ,

৫. নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মোতাবেক পৌরবাসীদের বসতবাড়ি নির্মাণে সহযোগিতা, অফিস আদালত ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ব্যবস্থা ও সহায়তাকরণ,

৬. পয়ঃনিষ্কাশন এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে নর্দমা প্রস্তুতের ব্যবস্থাকরণ,

৭. অধিক জনগণ চলাচলের ক্ষেত্রে ডাস্টবিন ও শৌচাগার প্রস্তুতকরণ,

৮. রাস্তাঘাট এবং নর্দমা পরিষ্কারের ব্যবস্থাকরণ,

৯. রাস্তাঘাট পুনঃনির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণকরণ,

১০. শহরে খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ এবং নির্দিষ্ট স্থানে নলকূপ স্থাপনকরণ।

১১. শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পৌর এলাকা বর্ধিতকরণ এবং বর্জ্য পদার্থ পুড়িয়ে দেয়া ও স্থানান্তরের ব্যবস্থাকরণ,

১২. শহরস্থ নদী ও পুকুর সংস্কারের ব্যবস্থাকরণ,

১৩. খোলা ও অস্বাস্থ্যকর পায়খানার পরিবর্তে স্যানিটারি পায়খানা সরবরাহের ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়নের ব্যবস্থাকরণ,

১৪. শহরে মশামাছি, কীটপতঙ্গ দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ,

১৫. পৌর এলাকার অধিবাসীদের নিকট থেকে পৌরকর আদায়ের ব্যবস্থাকরণ প্রভৃতি।

পরিবেশের উপর নগরায়ণের প্রভাব (The effect of urbanization on Environment) : নগরায়ণ ব্যবস্থা দিনদিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে সন্দেহ নেই। তবে, পরিবেশের ভারসাম্যতার দিক থেকে বিচার করলে এই ব্যবস্থার বহুবিধ নেতিবাচক দিক লক্ষণীয়। যেমন :

১. বায়ু দূষণ : মোটরগাড়িতে অধিক পেট্রোল ও ডিজেল পোড়ানোর ফলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও কার্বন-মনোক্সাইড (CO)-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। আবার অধিক গাছপালা কর্তনের ফলে প্রয়োজনীয় O_2 এর ঘাটতি এবং ক্ষতিকর গ্যাস অধিক হারে নির্গত হয় বলে বায়ু দূষণ ঘটে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে কোনো শহরে প্রতিঘনমিটারে ২০০ মিলিগ্রাম এর বেশি ধুলাবালি থাকলে তা বিপদজনক। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধুলাবালি ভারতের মুম্বই এবং সবচেয়ে কম সিঙ্গাপুরে।

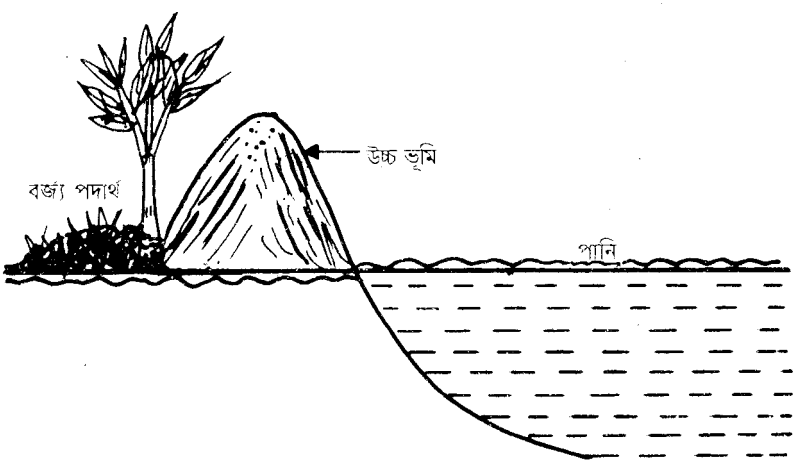

চিত্র ৩.৮ : নগরায়ণের ফলে জমাকৃত বর্জ্যের জন্য পরিবেশ দূষণ।

(২) ভূমি দূষণ : নগরায়ণ বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। অধিক হারে গাছপালা কর্তনের ফলে জমির মাটি আলাদা হয়ে যায়। আবার শহরের বর্জ্য পদার্থ ফেলার স্থান (dumping place) ধীরে ধীরে ক্ষতিকর জমিতে পরিণত হয়।

(৩) পানি দূষণ : ক্ষতিকারক পদার্থ মাটি শোষণের ফলে পানির আধার ও পার্শ্ববর্তী জমির উর্বরতা নষ্ট করে। দেশের প্রতিটি শহরে যদি এই অবস্থা ঘটে, তাহলে গোটা এলাকার পানি দূষিত হয়ে পড়বে। তদুপরি, শিল্প বর্জ্য, কসাইখানার বর্জ্য প্রভৃতি পুকুর ও জলাশয়ের পানি দূষিত করে।

(৪) ভূ-গর্ভস্থ পানি হ্রাস : শহরে পানি খরচ বেশি হয়। ফলে, সেখানে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পাম্পের সাহায্যে প্রতিদিন লক্ষ-কোটি গ্যালন পানি উত্তোলন ও সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে, পানির স্তর নিচে নেমে যায় এবং অধিক শোষণের ফলে ভূ-গর্ভস্থ থেকে পানির সাথে আর্সেনিক (Arsenic) চলে আসে। যা ব্যবহারের ফলে মানুষের হাতে পায়ের তালুতে ঘা হয় এবং অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধি হয়।**(৫) শব্দ দূষণ :** শহরে সর্বাধিক মোটরযান চলে এবং সেখানে স্কুল, কলেজ ও হাসপাতালের সংখ্যাও বেশি। গাড়ির আওয়াজে শব্দদূষণ ঘটে এবং এই দূষণের ফলে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও আবাসিক এলাকার শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। শহরে যন্ত্রপাতির শব্দ, রেলগাড়ি চলার কারণেও স্বাভাবিক পরিবেশের ক্ষতি হয়। পরীক্ষাগারে দেখা গেছে যে, উন্নয়ন কাজের যন্ত্রপাতি ও মোটরযানের শব্দ দ্বারা ৯০ থেকে ১০০ ডেসিবেল (decibel) পর্যন্ত শব্দ দূষণ ঘটে। তা ছাড়া শহরের জনবহুল এলাকায় একত্রে অনেক লোক বসবাসের জন্য তাদের মধ্যে মতবিরোধ ও ঝগড়া বিবাদের ফলেও শব্দ দূষণ ঘটে। এসব দূষণ অধিক ঘটে বস্তি এলাকায়।

(৬) অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি : কাজের জন্য গ্রামাঞ্চলের বেকার জনগণ শহরের দিকে ধাবিত হয়। এতে রেল লাইনের ধারে, ফাঁকা জায়গায়, বাজার সংলগ্ন প্রভৃতি স্থানে বস্তি গড়ে ওঠে। ফলে এসব স্থানে মদ, গাঁজা, হেরোইন, ফেনসিডিল এবং অন্যান্য দ্রব্য কেনা-বেচা হয়। চুরি, ডাকাতি, পকেটমার প্রভৃতি কার্যকলাপের লোকজনও এসব জায়গায় আস্তানা গড়ার সুযোগ পায়।

(৭) গাছপালা নিধন : নগরায়ণের ফলে শহরের পরিধি বাড়তে থাকলে গাছপালা কর্তনের পরিমাণও বেড়ে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাদের দ্বারা অক্সিজেনের চাহিদা বাড়ে এবং অধিক হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। গাছপালা নিধনের ফলে পরিবেশ ভয়াবহ রূপ নেয়ায় অক্সিজেনের অভাবে পরিবেশ বসবাসের অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষ বুক ভরে শ্বাস (অক্সিজেন) নিতে পারে না এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড অধিক হওয়ার ফলে শিশু ও রোগীদের কষ্ট হয়।

(৮) কৃষি জমি ও জলাভূমি হ্রাস : শহরের পরিধি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকলে কৃষি জমিতে ঘরবাড়ি উঠতে থাকে। ব্যবসায়ীবৃন্দ পতিত ও জলাভূমি কম দামে কিনে নিয়ে সেটি ভরাট করে গৃহ-নির্মাণের প্রকল্প করে। এতে কিছু লোক অর্থের মালিক হয়, কিছু লোক বাড়ি করার জায়গা পেলেও ফসলের জমি কমে যাচ্ছে এবং জলাভূমি, গাছপালা প্রভৃতি কমে যাবার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। নগরায়ণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে হলে আলোচিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিশ্ব পরিবেশ ও নগরায়ণের তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৬০ সালে বিশ্বে নগরবাসীর সংখ্যা ছিল ২২%, ১৯৯০ সালে হয়েছে ৩৪% এবং আগামী ২০২০ সালের দিকে তা বেড়ে ৫০% হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিকল্পিত উপায়ে নগরায়ণ বৃদ্ধি পেলে তা মারাত্মক আকার

ধারণ করতে পারে না। নগরের মেয়র এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং শহরবাসীরও তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করা উচিত।

(৯) জনসংখ্যা বৃদ্ধি : শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে বিধায় গ্রাম ও শহরতলী থেকে জনগণ মূল শহরের দিকে ধাবিত হয়। ফলে সেখানে তারা আয়ের সাথে সাথে বসবাসের সুবিধা করে নেয়। ফলে, শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা শহরে ১৯৮৭ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.২০%, ১৯৮৯ সালে ৫.০%, ১৯৯৬ সালে ৯.০% এবং ২০০০ সালে এ হার ১১.৫ এ দাঁড়ায়। এ সময়ে নগরায়ণের হার পরিলক্ষিত হয়েছে ৭%।

নিচে বিশ্বের ছয়টি বৃহত্তম মেগাসিটিতে ১৯৯২ এবং ২০০০ সালের জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে।

ক্রমিক নং	১৯৯২ সাল		২০০০ সাল	
	শহরের নাম	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	শহরের নাম	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
১.	সাতপাগুলো	১৯.২	সাতপাগুলো	২২.১
২.	নিউইয়র্ক জার্সি	১৬.২	নিউইয়র্ক জার্সি	১৬.৮
৩.	সাংহাই	১৪.১	সাংহাই	১৭.০
৪.	বোম্বে	১৩.৩	বোম্বে	১৫.৪
৫.	লসএঞ্জেলস	১১.৯	লসএঞ্জেলস	১৩.৯
৬.	বেজিং	১১.৪	বেজিং	১৩.৯

৩.১১ স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রভাব (Health impacts)

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল (health is wealth)। একজন স্বাস্থ্যবান মায়ের গর্ভে স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং সে সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেড়ে উঠে ভবিষ্যতে সঠিকভাবে দেশের উন্নয়নের কাজে ব্রতী হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো রেখে চলতে হলে নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

১। স্বাস্থ্য রক্ষার উপাদান :

(১) পরিচ্ছন্ন পরিবেশ : পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস করলে সবাইর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এজন্য বসতবাড়ি, কাজের পরিবেশ, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি পরিষ্কার রাখতে হয়।

(২) পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য : স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে বয়স অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। যেমন : আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন প্রভৃতি খাবার গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে প্রতিদিন ২৩০০ থেকে ২৫০০ ক্যালরি তাপের সমান খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে হয়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে সকালে কিছু কিছু ফলমূল

খাওয়া প্রয়োজন। ফলমূলে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে, যা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়। ঠাণ্ডা খাবারে রোগজীবাণু থাকতে পারে, তাই এটি পরিহার করতে হবে।

(৩) **নিরাপদ পানি :** পানির অপর নাম জীবন। আবার, ময়লা ও জীবাণুযুক্ত পানি বিষ তুল্য। অপরিষ্কার পানিতে কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস প্রভৃতি রোগের জীবাণু থাকে। টিউবওয়েলের পানি, বৃষ্টির পানি, ফুটানো পানি প্রভৃতিতে রোগ জীবাণু থাকে না। একে নিরাপদ পানি বলে এবং এটি গ্রহণ করা স্বাস্থ্যকর। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে প্রতিদিন প্রায় চার লিটার বা আট থেকে ষোল গ্লাস পানি পান করতে হয়।

(৪) **দূষণমুক্ত বায়ু :** শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য দূষণমুক্ত বাতাসের প্রয়োজন হয়। ধুলাবালি, কালো ধোঁয়া, পচা-দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু অস্বাস্থ্যকর। এজন্য রাস্তায় চলার সময় নাকে রুমাল ব্যবহার করা প্রয়োজন। ঢাকার রাস্তাঘাট ধূলিময়। তবে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে মুম্বাই শহর অধিক এবং হ্যানয় কম ধূলিময় শহর, যেখানে যথাক্রমে বাতাসে দূষণকারী পদার্থের পরিমাণ ৫০০ মিলিগ্রাম এবং ৩০ মিলিগ্রাম। লেক, নদীনালা, গাছপালা, প্রভৃতি স্থানের বাতাস দূষণমুক্ত থাকে। প্রাতঃকালে বাতাস দূষণমুক্ত থাকে। এজন্য প্রাতঃভ্রমণ স্বাস্থ্যকর।

(৫) **স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান :** বাসস্থান হতে হবে খোলামেলা, যাতে ঘরের জানালা দিয়ে দক্ষিণা বাতাস ঢুকে বেরিয়ে যেতে পারে। বসবাসের ঘর থেকে টয়লেট কিছুটা হলেও দূরত্বে থাকতে হবে। কাঁচা পায়খানা হলে তা শোবার ঘর থেকে অন্ততপক্ষে ৫০ ফুট দূরে থাকতে হবে এবং সেখান থেকে নলকূপের দূরত্বও কমপক্ষে ৫০ফুট থাকা বাঞ্ছনীয়। নদী, সমুদ্র উপকূল, পাহাড় বা টিলার উপর বসবাস করা স্বাস্থ্যকর। বস্তি মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নয়, তাই এটি পরিহারযোগ্য। ইঁট ভাটা, বস্তি, চামড়া শিল্প, ধূলিময় রাস্তা, হোটেল বা বাণিজ্যিক এলাকার নিকটবর্তী বাসস্থান স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

(৬) **উপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা :** বসবাসের স্থানে ময়লা জমে থাকা, দুর্গন্ধযুক্ত কোনো জিনিস খোলা আকাশে থাকা, খোলা জায়গায় পায়খানা-প্রস্রাব করা ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। কাঁচা পায়খানা অস্বাস্থ্যকর, সেফটি ট্যাংক বিশিষ্ট পায়খানা স্বাস্থ্যকর। বাড়িঘর, হাট বাজার, অফিস আদালত, পায়খানা ও প্রস্রাবখানা প্রভৃতি থেকে নিঃসৃত পানি ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ ড্রেন বা নল দ্বারা একটি জলাশয়ে স্থানান্তর করা প্রয়োজন। জার্মানিসহ বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে পয়ঃনিষ্কাশন ভূ-গর্ভস্থ নালা দ্বারা সম্পন্ন হয়। সে কারণে উন্নত বিশ্বে বসবাসের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর থাকে।

(৭) **কায়িক পরিশ্রম :** উপরিউক্ত উপাদানের পর্যাপ্ততা থাকলেও যে কোনো বয়সের মানুষকে সকালে বিকালে হাটা, সাইকেল চালানো, মাঠে খেলাধুলা করা স্বাস্থ্যকর। ভালো পরিবেশে বসবাস ও ভালো খাবার অত্যধিক খেলে শরীর মুটিয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষকে তার বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ওজন থাকতে হয়। অধিক ওজন থাকলে তা ভবিষ্যতের জন্য স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রূপ নেয়। এতে অধিক রক্তচাপ (blood pressure), হৃদরোগ (heart disease), বহুমূত্র (diabetics) ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৮) নিয়মিত আহার, ঘুম ও বিশ্রাম গ্রহণ : আমাদের মনে রাখা দরকার যে, দিন কাজের জন্য এবং রাত্রি বিশ্রামের জন্য। জার্মানির লোকেরা দিন রাতে ১৫ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করে, ফাঁকে বিশ্রাম নেয়, নিয়মিত আহার গ্রহণ করে এবং কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা ঘুমায়। এজন্য তারা স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী ও ধনী। অধিক আরামপ্রিয় জাতির অনটন কাটে না এবং তাদেরকে সারা জীবন কষ্ট করেই চলতে হয়।

২। স্বাস্থ্য বা পুষ্টিহীনতার উপাদান :

(১) অধিক জনসংখ্যা : কথায় বলে একটি মুখ সোনা দিয়ে ভরানো যায়, অসংখ্য মুখ ছাই দিয়েও ভরানো যায় না। সীমিত ভূমি ও সম্পদের দেশে অধিক জনসংখ্যা একটি বিরাট সমস্যা। একটি পরিবারে একজন আয় করে দশজন লোকের ভরণপোষণ করতে পারে না। আর, যদি সে সামান্য শ্রমিক হয়, তাহলে তো কথাই নেই। সে সংসারে প্রায়শই নুন আনতে পানতা ফুরানোর অবস্থা হয়. বাংলাদেশে এরকম পরিবারের সংখ্যা হাজার/লক্ষটি রয়েছে। এসব পরিবারের লোকেরা ঠিকমত খাবার পায় না বলে তারা পুষ্টিহীনতার শিকার হয় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করে।

(২) অশিক্ষা ও কুশিক্ষা : অশিক্ষিত লোকজন স্বাস্থ্য কি তা অনেকাংশে বোঝে না, কোন খাবার খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে, পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচা যায়, তেমন বোঝে না। শাকসবজিতে প্রচুর ভিটামিন আছে, যা বনে বাদাড়ে জন্মে। শিক্ষিত লোক এগুলো বোঝে এবং সংগ্রহ করে খাবার কাজে লাগায়। হেরোইন, মদ, গাঁজা এবং অন্যান্য ধূমপান স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। খাবার কম খেয়ে অনেকে এগুলো খায়, পানের সাথে তামাক পাতার জর্দা খায়। এগুলো কুশিক্ষার ফল।

(৩) দরিদ্রতা : দরিদ্রতা হলো অক্ষম লোকের কর্মফল এবং সক্ষম লোকের অলসতার ফসল। দরিদ্রতার জন্য ভুক্তভোগীরা সঠিক মানের খাবার খেতে পারে না। তার জন্য এরা অপুষ্টির শিকার হয়।

(৪) হিসাবের জ্ঞানশূন্যতা : অনেকে দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করে। সঞ্চয় করতে হলে বর্তমানে কিছুটা কষ্ট শিকার করতে হয়, কিন্তু তা ভবিষ্যতের জন্য সুখকর। কৃষক ধান রেখে দেয় দুর্দিনের সময় ব্যবহারের জন্য। আর যারা বাহুল্য খরচ করে সম্পদ নষ্ট করে এবং দুর্দিনে না খেয়ে বা আধা-পেটা খেয়ে দিন কাটায়, তারাই পুষ্টিহীনতার শিকার হয়।

(৫) সম্পদের অসম বণ্টন : দেশের সব এলাকায় সব ফসল ভালো জন্মায় না। তাই, একটি এলাকার বাড়তি ফসল অন্য এলাকায় সরবরাহ করা হলে বা ব্যবস্থা থাকলে দেশের সব লোকই সমভাবে পুষ্টি পেতে পারে। অনেক সময় দেশে কোনো পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকলে তা বিদেশ থেকেও আমদানি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আঙ্গুর, আপেল প্রভৃতির ঘাটতি রয়েছে, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে এগুলো আমদানি করে এই ঘাটতি পূরণ করা হয়।

(৬) সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব : যে ঘরে বসে থাকে, দুনিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে খবর রাখে না, সে পরিকল্পনা করতেও পারে না। ক্ষেতে বছরে কয়টি ফসল হয়, কোন ফসল কোন সময় বুনতে বা রোপণ করতে হয়, কোন সময় সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে

হয়, এগুলো কৃষকের পরিকল্পনার অংশবিশেষ। যে পরিকল্পনা জানে না, সে উন্নয়ন ও উন্নতির মুখদর্শন করতে পারে না। ফলে কালক্রমে সে দরিদ্র এবং অপুষ্টির শিকার হয়।

(৭) সদিচ্ছার অভাব : লেখকের সন্তান লেখক হয়, কৃষকের সন্তান ব্যারিস্টারও হয়। আর, এগুলো হয় ব্যক্তির সদিচ্ছার জন্য। যে পৈতৃক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে চায়, সে সমাজে ভাল কর্মী হতে পারে। অন্যথায়, বিপথগামী জনগণ মান-সম্মানকে তুচ্ছ মনে করে অপকর্ম করে, জেল জুলুম খাটে। তখন তার পরিবার অভাবগ্রস্ত হয় এবং সে নিজে ও পরিবারের সবাই অপুষ্টির শিকার হয়। এ ধরনের অনেক পরিবারই অভাবের তাড়নায় অনেক সময় আত্মহননের পথও বেছে নেয়।

(৮) অসচেতনতা : গ্রামে কিছু কিছু নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। নদী ও খালের পানিতে রোগজীবাণু থাকে। পচা খাবার খেলে কলেরা, আমাশয় রোগ হয়। পরিবেশে বসবাস করে অভিজ্ঞতার আলোকে এগুলো জানতে ও বুঝতে হয়। যেখানে সেখানে থু থু-কফ ফেললে তা অন্যদেরকেও হাঁচি-কাশি, সর্দি ও জ্বরে আক্রমণ করতে পারে। খোলা জায়গায় পায়খানা প্রস্রাব করলে মাছি তা থেকে জীবাণু নিয়ে মানুষের খাবার নোংরা করতে পারে। আর, এসব কারণেই এই অসচেতন মানুষকে আমাশয়, ডায়রিয়া, কলেরা, কৃমিরোগ, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হতে হয়। এইডস রোগও নারী পুরুষের অবৈধ মেলামেশার কারণে ঘটে থাকে। এসব রোগের জন্য মানুষ অপুষ্টির শিকার হয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে জন্মহার ৩.০০% এবং মৃত্যু হার ১.০৮% এবং প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৬৬ বছর। দেশের ০৮% শিশু-কিশোর অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে এবং ২৫% সামগ্রিক অপুষ্টির শিকার হয়। তবে, এদেশে শিক্ষিতের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবার দরুন এবং সচেতনতাও বৃদ্ধি পাওয়ায় এ দেশের লোকে পূর্বের তুলনায় রোগে কম আক্রান্ত ও কমহারে অপুষ্টির শিকার হচ্ছে।

এদেশের মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করা গেলে তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অগ্রগামী হবে। আর তখনই আমাদের দেশ থেকে রোগ বালাই কমতে থাকবে এবং মানুষকে আর অপুষ্টির শিকার হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে না। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে উন্নত কাজ ও উন্নত চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ থাকে। যে দেশের জনগণ যত বেশি সুশৃঙ্খল, স্বাস্থ্যবান এবং শিক্ষিত, তারা দুনিয়ায় ততবেশি আবিষ্কার করছে, দেশকে উন্নত করছে এবং পৃথিবীর কর্ণধার হিসেবে গর্ববোধ করছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, জাপান, চীন বৃটেন প্রভৃতি দেশ সব দিকেই অগ্রগামী। জার্মানিতে জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে কম। সে কারণে, সে দেশে ১০ বা ২০ বছর আগে যে জনসংখ্যা ছিল, বর্তমানে তার চেয়ে কম। সে দেশে বছরে ৪/৫ মাস বরফে ঢেকে থাকে, ক্ষেতে বছরে একটি ফসল হয়, প্রচুর শিল্প কারখানা রয়েছে। সেখানকার নারী-পুরুষ সবাই কাজ করে রাষ্ট্রীয় খরচে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। ১৮ বছর বয়স হলেই সবাই স্বাবলম্বী হয়। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা এবং বেকার লোকজন যথাক্রমে বৃত্তি ও বেকার ভাতা পায়। তাই, উন্নত বিশ্বে প্রায় সবাই সুখী, সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং কেউ অপুষ্টির শিকার হয় না। কারণ সবাই প্রচুর পরিশ্রম করে এবং স্বাস্থ্য সচেতন।

৩.১২ সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Resource management)

যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে সঞ্চিত বা আহরিত সম্পদের সুষ্ঠু প্রয়োগ, উন্নয়নে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন এবং দেশ গড়ার কাজে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা হয়, তাকে সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলে। পূর্বে প্রথম অধ্যায়ে সম্পদ এবং তার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশকে কিভাবে উন্নতির দিকে নেয়া যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। যেমন :

১। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Natural resources management) :

(ক) অজৈব সম্পদ : পানি, বায়ু, সূর্যালোক প্রভৃতিকে আমরা অজৈব সম্পদ বলি। ভূ-গর্ভস্থ পানি স্বাস্থ্যকর। কিন্তু তা বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ, শিল্প কারখানার নিষ্কাশিত দ্রব্য, বিষ প্রভৃতি দ্বারা ধীরে ধীরে দূষিত হয়। আর ভূ-উপরিভাগের পানি অল্পতেই দূষিত হয়ে যায়। পানির দূষণ রোধ করলে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে, ভালো ফসল পেতে পারি এবং আবহাওয়া ভালো থাকতে পারে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বর্জ্য পদার্থ ফেললে তা মানুষের ক্ষতি করতে পারে না।

পানির মতো বায়ুও প্রাকৃতিক সম্পদ। সুষ্ঠু আবহাওয়ায় মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, প্রভৃতি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু কলকারখানার ধোঁয়া, গাড়ির ধোঁয়া, বর্জ্য পদার্থ প্রভৃতি দ্বারা বাতাস দূষিত হয়। যদি এই ধোঁয়া ও বর্জ্য পদার্থ একটি নির্দিষ্ট যন্ত্র দ্বারা বাতাস থেকে দূরীভূত করা হয়, তাহলে তা বায়ুমণ্ডল দূষিত করতে পারে না।

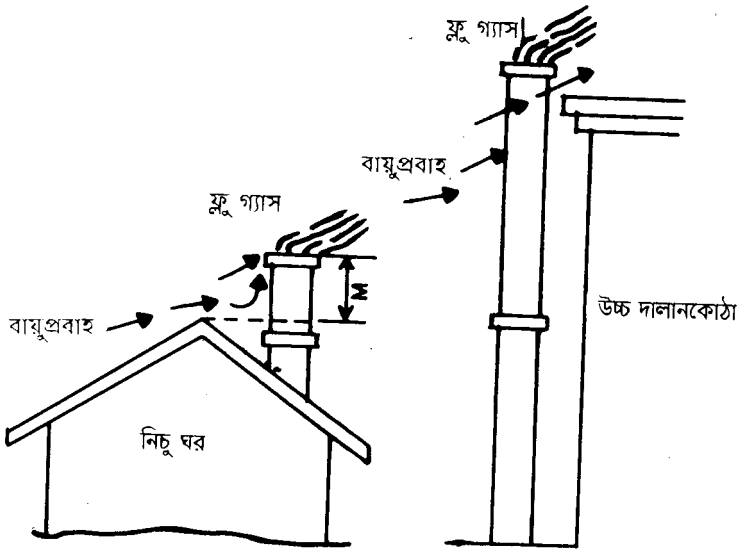

চিত্র ৩.৯ : বায়ুদূষণ রোধ ব্যবস্থা।

যেমন কোনো শহরে যদি সর্বাধিক তিন তলা দালানকোঠা থাকে, তাহলে সেখানকার কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া সেই দালানকোঠার চেয়ে বড় চিমনির মধ্য দিয়ে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দিলে বাতাস দূষিত হতে পারে না। ফলে, সেখানকার আবহাওয়া ভালো থাকে। ৩.৯ চিত্রে এভাবে বায়ু দূষণ রোধ করার প্রক্রিয়া দেখানো হলো। পরিবেশ আলো-বাতাসে পূর্ণ থাকলে স্বাস্থ্যকর থাকে। আমরা সৌরচুল্লি তৈরি করে তা দ্বারা রান্নাবান্না এবং অন্যান্য কাজে প্রয়োগ করতে পারি।

সূর্য তাপকে শুঁটকি প্রকল্প, ওষুধ তৈরির কারখানা, ধান সিদ্ধ ও শুকানো প্রকল্প ইত্যাদি কাজে লাগানো হয়।

(খ) জৈব সম্পদ : প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে উদ্ভিদ, তৃণ, বিভিন্ন জীবজ, মৎস্য প্রভৃতি জৈব সম্পদের আওতাভুক্ত। এ সম্পদগুলো অজৈব সম্পদের মতো অফুরন্ত নয়। নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উদ্ভিদ ও তৃণ উৎপাদন, তাতে সার, পানি ও কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে তা অর্থকরী সম্পদে পরিণত হতে পারে। বিভিন্ন জীবজন্তু পালনের জন্য তাদের বসবাস উপযোগী পরিবেশ গড়তে হবে। সঠিক খাবার প্রয়োগ, রোগ দূরীকরণে পশু চিকিৎসক কর্তৃক ওষুধ প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবজন্তুর বংশবৃদ্ধি হয় এবং তা কার্যকর সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

মৎস্য সম্পদ একটি আশাপ্রদ সম্পদ হিসেবে আমাদের দেশে পরিগণিত। অসংখ্য নদনদী ও নদীনালার গভীরতা বৃদ্ধি করে পোনা উৎপাদন ও রাক্ষুসে মাছ স্থানান্তর করা, পানির বিশুদ্ধতা বজায় রাখা প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে তা অর্থকরী সম্পদে পরিণত হতে পারে।

২। মানবিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human resource management) : কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিপদজনক কারণ, যে হারে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, জনসংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে, ভকেশনাল কাজে ট্রেনিং দিয়ে, কলকারখানা বৃদ্ধি করে, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বা ঋণদান করে এবং বেকারের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করলে মানুষ বা জনসংখ্যা সম্পদে পরিণত হয়। জনগণকে বিভিন্ন পেশায় দক্ষ করে তুললে, সে মানব সম্পদ দেশে রেখে বা বিদেশে পাঠিয়ে অধিক সম্পদ আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যার হার নগণ্য নয়, কিন্তু সেখানে শিক্ষিতের হার বেশি এবং অধিকাংশ লোক কর্মী। ফলে, সে দেশের জনগোষ্ঠী সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। কারণ, কর্মী হলো কোনো কিছুর উৎপাদক (producer) এবং অলস ও অদক্ষ লোক ভোগকারী (consumer) হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩। সাংস্কৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Cultural resources management) : জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ও প্রয়োগ প্রভৃতিকে সাংস্কৃতিক সম্পদ বলে। আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশ সাংস্কৃতিক সম্পদে ভরপুর। সেসব দেশে উৎপন্ন দ্রব্য অনুন্নত দেশ ভোগ করে থাকে। দেশে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়ন, কলকারখানার সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, উৎপাদন দ্রব্যের মান উন্নয়ন,উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে একটি দেশ সাংস্কৃতিক সম্পদে

স্বাবলম্বী হতে পারে। দেশে উপযোগী শিল্প কারখানার প্রসারণ এবং দেশী সম্পদ ব্যবহার করে তা নিজের দেশের চাহিদা পূরণ ও উক্ত দ্রব্য বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করলে দেশ উন্নতির দিকে ধাবিত হতে পারে।

সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Needs for resources conservation) : সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

১. সম্পদ সংরক্ষণের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা হলো সম্পদের ঘাটতি এড়ানো এবং ভবিষ্যতের জন্য সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখা।

২. সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

৩. সম্পদের যুক্তিসঙ্গত বা বিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা।

৪. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করা।

সম্পদ সংরক্ষণের উপায় (Means of Resources Conservation) : সম্পদ উপার্জন এবং সংগ্রহ যেমন কষ্টসাধ্য সেটি সংরক্ষণ করে প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানোও কঠিন ব্যাপার। সম্পদ সংরক্ষণের বহুবিধ উপায় রয়েছে। যেমন :

১. সম্পদ ব্যবহারের বাহুল্য কমানো, সম্পদ অতিমাত্রায় এবং যথেচ্ছ ব্যবহার করলে শীঘ্রই তা শেষ হয়। তাই, ন্যূনতম প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পদের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের সহায়ক হয়।

২. **পরিবর্তনযোগ্য দ্রব্যের ব্যবহার :** যে সম্পদ ক্ষয় বা নিঃশেষ হয়ে গেলে আর তা পাওয়া যাবে না, সে ক্ষয়িষ্ণু সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে প্রবাহমান বা অহরহ উৎপাদনশীল সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি করলে সম্পদ সংরক্ষিত হবে। যেমন : বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে কয়লা অথবা প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কমিয়ে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। বন্যার সময় পানি অনায়াসে পাওয়া যায় তাই অন্ততপক্ষে বন্যার সময় অধিক হারে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানির উপর চাপ কমানো এবং তা সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

৩. **অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্যবহার :** বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত খনিজ তৈল ব্যবহার না করে পরিবহন পরিচালনায় তা ব্যবহার করলে খনিজ তেলের সাশ্রয় হয়। এক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে। এতে দেশের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও স্বাবলম্বিতা বৃদ্ধি পায়।

৪. **প্রযুক্তির সাহায্য ব্যবহার :** কোনো সম্পদ সরাসরি ব্যবহার না করে তা প্রযুক্তিগত সাহায্য নিয়ে ব্যবহার করলে তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদ সংরক্ষণেও সহজ হয়। যেমন : জ্বালানি হিসেবে সরাসরি কাঠ, কয়লা বা খনিজ তেল ব্যবহার না করে তা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কাজে ব্যবহার করলে এবং পরে বিদ্যুৎ শক্তিকে তাপ উৎপাদক যন্ত্রে ব্যবহার করলে এর উৎকর্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। কারণ, কাঠ ও তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলে ঘর নোংরা হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তি বা গ্যাসের চুল্লিতে রান্না করলে ঘরবাড়ি নোংরা হয় না।

৫. অপচয় বন্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার : সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহারের সময় যাতে অপচয় বন্ধ হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন : বিদ্যুৎ শক্তিকে (বেশিক্ষণ) সঞ্চয় করে রাখা যায় না। কিন্তু কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চয় করে রাখা যায়। তাই, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালিয়ে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করলে অপচয়ের কারণ হয়। আমাদের দেশে গ্যাস কোম্পানি যে গ্যাস সরবরাহ করে, তার প্রতি গ্যাস বার্নারের উপর মূল্য ধরা হয়। যেমন : মাসিক প্রতি চুল্লি ১১৫ টাকা। কেউ যদি চুল্লি জ্বালানোর জন্য ম্যাচ বাঁচাতে গিয়ে ৬ ঘণ্টা চুল্লি জ্বালিয়ে রাখে তা অপচয়ের কারণ হয়। এভাবে যদি অধিকাংশ লোক অযথা চুল্লি জ্বালিয়ে রাখে তাহলে যেখানে গ্যাস আরও ১৮০ বছর যাবার কথা, সেখানে ১০০ বছর যাবে। অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও চাহিদার অতিরিক্ত সরবরাহে প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাস পায়।

আবার, বিজ্ঞানসম্মতভাবে খনিজ দ্রব্য উত্তোলনকালে অপচয় বন্ধ হয়। যেমন : অভ্র উত্তোলনের সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, যাতে সেটি ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে না যায়। গ্যাস উত্তোলনে যদি লিকেজ রোধ না করা যায়, তাহলে সে লিকেজ দ্বারাই গ্যাস নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। অন্যান্য খনিজ সম্পদ সংগ্রহের সময়ও একইভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

৬. সম্পদের পুনর্ব্যবহার : একই বস্তু যদি প্রযুক্তিগত উন্নতির সাহায্যে বারবার ব্যবহার করা যায় তবে সম্পদের সাশ্রয় ঘটে। যেমন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে লোহার স্ক্র্যাপ (iron scrap) ব্যবহার করা হয় তবে সম্পদের সাশ্রয় হয় এবং ক্ষতিকারক জঞ্জালও বিনষ্ট হয়। এভাবে অ্যালুমিনিয়াম, তামা, সীসা, দস্তা ইত্যাদি ধাতব দ্রব্যগুলোর পুনর্ব্যবহার সম্ভব হয়।

৭. প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি : কারিগরি উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেলে অপেক্ষাকৃত অল্প কাঁচামালে (raw materials) অধিক পরিমাণ শিল্প দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব। যেমন : পূর্বে প্রযুক্তিগত ঘাটতির কারণে যেখানে প্রায় ৬ টন কাঁচামাল হতে মাত্র ১ টন লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হতো সেখানে বর্তমানে মাত্র ৩ বা ৪ টন কাঁচামাল হতেই ১ টন লৌহ ও ইস্পাত পাওয়া যায়। ফলে, অবশিষ্ট কাঁচামালের সাশ্রয় হয়। আবার, ক্ষেতখামারে পূর্বে যেখানে বছরে ১টি বা ২টি ফসল হতো, বর্তমানে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বছরে ৩টি ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

৮. উৎপাদনে বিশেষীকরণ : উৎপাদনে বিশেষীকরণের মাধ্যমে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক দ্বারা প্রস্তুত বা উৎপাদিত সম্পদের গুণগত বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। যেমন : আমাদের দেশে উৎপাদিত সোর্ড ব্লেড (sord blade) বিদেশে উৎপাদিত রেড সুপার ম্যাক্স (Super max), সেভেন আপ (7-up) প্রভৃতি ব্লেড অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ হলো, আমাদের দেশে উন্নত ব্লেড প্রস্তুতের উন্নত প্রযুক্তি নেই যা বিদেশে আছে।

৯. সম্পদের পুনঃস্থাপন : কিছু সম্পদ যেগুলো পূরণশীল, ভোগের সাথে সাথে পুনরায় উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন : কোনো গাছ পরিপক্ক হয়ে গেলে সেটি কর্তনের পরপরই অন্য একটি গাছ বপন করা যেতে পারে। পুকুর থেকে মৎস্য সংগ্রহের পূর্বে বা পরপরই যদি মৎস্য ছাড়া যায় তাহলে ঘাটতি পূরণ হয়ে যেতে পারে। মাংসের জন্য পশু

ব্যবহারের পূর্বে নতুন পশু প্রজননের ব্যবস্থা করলে, মুক্তা সংগ্রহের সাথে সাথে নতুন মুক্তার চাষ করলে সম্পদ সংরক্ষিত হতে পারে।

১০. সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি : সম্পদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তদুপরি সরকারি ও বেসরকারি সব স্তরেই যদি সম্পদ সচেতনতা, সম্পদ জ্ঞান লাভ প্রভৃতি দিকে সতর্ক দৃষ্টি আরোপ করা যায় তাহলে সম্পদ ধ্বংস কম হয়। যেমন : পারদের নিকট স্বর্ণ রাখলে সোনা নিঃশেষ হয়ে যায়। কাঁচা জিনিস বেশিদিন ঘরে রাখলে তার ভিটামিন ও প্রোটিন নষ্ট হয়ে যায়। অল্প অল্প কিনে খেলে স্বাস্থ্যও ভালো থাকে এবং অপচয় রোধ হয়।

১১. সামাজিক প্রকল্প গ্রহণ : সামাজিক প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে অরণ্য সৃষ্টি করলে একদিকে যেমন কাঠের যোগান বৃদ্ধি পাবে, অপরদিকে তেমন ভূমিক্ষয় রোধ হয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। উর্বরতা বৃদ্ধিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এ প্রকল্পের আওতায় রাস্তাঘাট নির্মাণ, মজা পুকুরে মাছের চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। এতে বেকার সমস্যা দূর হবে। বেকার জনগোষ্ঠীকে ব্যাংক ঋণদানের ব্যবস্থাসহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে (বেকার যুবক-যুবতীদেরকে) হাঁস-মুরগির খামার, দুগ্ধজাত গাভী পালন প্রভৃতি কার্যক্রমের ব্যবস্থা হাতে নেয়া হলে দেশে সম্পদ সৃষ্টি হবে।

এভাবে, নানাবিধ সামাজিক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যম একদিকে যেমন বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পদ সৃষ্টির পথ সুগম হবে, অপরদিকে ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানের সম্পদ সংরক্ষণে সহজ হবে।

দরিদ্রতার কারণ ও প্রতিকার (Causes and remedies of poverty) : কথায় বলে পরিশ্রম ধন আনে, পুণ্য আনে সুখ, আলস্য দারিদ্র্য আনে পাপ আনে দুঃখ। দরিদ্রতা মানুষের জন্য অভিশাপস্বরূপ। দরিদ্রতার সম্যক কারণসমূহ নিম্নরূপ :

(১) জনসংখ্যার আধিক্য : ভূখণ্ডের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য হলে সে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না। বাড়তি খাদ্যদ্রব্য ফলানোর জন্য অধিক জমির প্রয়োজন হয় এবং কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রসারের সুযোগ কম হলেই সেখানে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে সে অঞ্চলে দরিদ্রতা দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের অংশবিশেষ, শ্রীলংকা, মায়ানমারের উপকূলভাগ, থাইল্যান্ড, কম্পুচিয়া প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যার আধিক্য রয়েছে বলে কমবেশি হলেও এসব দেশে দরিদ্রতা রয়েছে। বাংলাদেশের অবস্থান দরিদ্রতার দিক থেকে অন্যতম হওয়ার কারণ হলো, এদেশের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ অদক্ষ।

(২) শিক্ষিতের হার কম : আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার ২৮% থেকে ইদানীং ৫০% এ উন্নীত হলেও ৫০ থেকে ৬৫% জনগোষ্ঠী অশিক্ষিত রয়েছে। যে দেশের জনগোষ্ঠী যত বেশি শিক্ষিত, সেখানে সম্পদ তত বেশি এবং দরিদ্রতা কম। যেমন : আমেরিকা, বৃটেন, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি দেশে শিক্ষিতের হার বেশি, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সম্পদের উৎপাদনও সেখানে বেশি হয়। সবাই পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করতে পারে, ফলে সেসব দেশে দরিদ্রতা নেই এবং কম শিক্ষিত দেশে যেমন : বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, ভারত,

সোমালিয়া, ভূটান প্রভৃতি দেশে শিক্ষিতের হার কম, ফলে এসব দেশে দরিদ্রতার হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

(৩) রাজনৈতিক অস্থিরতা : বাংলাদেশে যেমন রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায়, অন্যদেশে তেমনটা নয়। এদেশে কলকারখানা এমনিতেই কম। অধিকন্তু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দেশের উন্নয়নের জন্য যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তা সম্পূর্ণরূপে ব্যহত হচ্ছে। ফলে দেশে দরিদ্রতা দেখা দিচ্ছে। শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সোমালিয়া প্রভৃতি দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দরিদ্রতা দেখা যাচ্ছে।

(৪) প্রযুক্তি শিক্ষার অনগ্রসরতা : যে দেশের জনগোষ্ঠী যত বেশি প্রযুক্তি শিক্ষায় অগ্রগামী, সে দেশ তত বেশি উন্নত এবং সেখানে দরিদ্রতা কম। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশে ধার করা প্রযুক্তি এবং উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব রয়েছে বলে এদেশে কল-কারখানার প্রসার ঘটছে না। ফলে, দেশে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার রয়েছে এবং দরিদ্রতা বিরাজ করছে। খুচরা যন্ত্রপাতিসহ প্রায় সবপ্রকার যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে এবং দেশে যা উৎপন্ন হচ্ছে তার মান নিম্ন হওয়াতে শিল্প প্রতিষ্ঠান লাভজনক হচ্ছে না। ফলে দেশে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটছে না এবং এটি দারিদ্র্যের বিশেষ একটি কারণ।

(৫) খনিজ সম্পদের অভাব : যে দেশে যত বেশি খনিজ সম্পদ রয়েছে, সে দেশ তত বেশি উন্নত। পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম, টিন, অ্যালুমিনিয়াম, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, চুনাপাথর, কয়লা, গ্রাফাইট ইত্যাদি খনি থেকে পাওয়া যায়। আরব দেশসমূহে পেট্রোলিয়াম খনি অসংখ্য থাকাতে সে দেশ তেল বিক্রি করে খাদ্য ও অন্যান্য সম্পদ অন্য দেশ থেকে কিনতে পারে। আমেরিকা, বৃটেন, জাপান প্রভৃতি দেশেও প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে বিধায় সে দেশে দরিদ্রতা নেই। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কিছু কয়লা খনি পাওয়া গেলেও অন্যান্য খনিজ সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা আছে। সে কারণে, এ দেশে দরিদ্রতার একটি বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে খনিজ সম্পদের অভাব।

(৬) কর্মসংস্থানের অভাব : বাংলাদেশে চাকরির ক্ষেত্রে একটি পদে চাকরির জন্য ক্ষেত্রবিশেষে ১০, ১০০ বা ১০০০টি দরখাস্ত পড়ে। দেশে কলকারখানা কম এবং জনসংখ্যার হার বেশি হওয়ার কারণেই এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ফলে, দেশের জনগণের আয়ের সংস্থান কম হচ্ছে এবং এটি দরিদ্রতা বৃদ্ধির বিশেষ কারণ।

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক শিক্ষার অনগ্রসরতা : কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ভালো ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি এবং উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন প্রশিক্ষকের অভাব। শিক্ষার্থীরা পাস করার পর বেকার থাকছে বলে তাদের মধ্যেও শিক্ষা লাভের অনিচ্ছা থাকে। ফলে, শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক এবং সীমিত ব্যবহারিক জ্ঞান নিয়ে বেরিয়ে আসে। তারা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক, কারিগর, প্রকৌশলী, ডাক্তার, আইনজীবী প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যরত থাকলেও কাজে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে না, বিদেশে গিয়েও তারা দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে না। ফলে, তাদের আয় উন্নতিতে অনগ্রসরতা লক্ষণীয় হয়। এ কারণে দরিদ্রতা দেখা দেয়। অথচ, উন্নত দেশসমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে ব্যবহারিক জ্ঞানে পারদর্শী করা হয়। ফলে, তারা দক্ষ কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং দেশ উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে।

(৮) প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার অভাব : অনুন্নত দেশে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার অভাব থাকে বলে সেদেশে উৎপাদিত দ্রব্য নিজেরাই ব্যবহার করতে চায় না। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে শার্ট, প্যান্ট এবং অন্যান্য পোশাক–পরিচ্ছদের কাপড় প্রস্তুত হয়। কিন্তু এগুলোর মান তেমন উন্নত নয়। ফলে যাদের ভালো আয়ের সংস্থান আছে, তারা দেশী দ্রব্য ব্যবহার না করে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করছে। এটি দরিদ্রতার একটি কারণ।

(৯) প্রাকৃতিক দুর্যোগ : বাংলাদেশে প্রতিবছরই বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে লক্ষ লক্ষ একর জমির ফসল বিনষ্ট হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদির কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এটি দরিদ্রতার একটি অন্যতম কারণ।

(১০) সঞ্চয় সম্পর্কে অসচেতনতা : আয়ের অন্ততপক্ষে ১০–২৫% সঞ্চয় করা দরকার। যারা সঞ্চয় করতে পারে না তাদের সংসারে দরিদ্রতা দেখা দেয়। সম্পদ সংরক্ষণ জ্ঞানের অভাবে এ দরিদ্রতা দেখা দেয়। পুকুরে মাছের চাষ করলে মাঝে মধ্যে মাছের খাদ্য দেওয়া, পরিবারের সকলের পুষ্টিখাদ্য গ্রহণ করা প্রভৃতিতে অতিরিক্ত অর্থের ও সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং সঞ্চয় জ্ঞানের অভাব দরিদ্রতার একটি বিশেষ কারণ।

(১১) সামাজিক প্রকল্প গ্রহণে অদূরদর্শিতা : সমাজে অনেক বেকার লোক দেখা যায়। জনগোষ্ঠীকে যদি মেধা ও শিক্ষা, অভিজ্ঞতা মোতাবেক কাজে লাগানো যায় তাহলে সবাই উপার্জন করতে পারে। যেমন : ছোটবড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়া, হাঁস–মুরগির খামার করা, মাছের চাষ করা ইত্যাদি। এজন্য প্রতিবছর ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে। প্রকল্পের জন্য কিছু লোক ঋণ দিয়ে লাভবান, কিছু লোক অপরিকল্পিত টাকা খাটানোর কারণে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং সামাজিক প্রকল্প গ্রহণে অদূরদর্শিতা দরিদ্রতার একটি বিশেষ কারণ।

প্রতিকার : দরিদ্রতা নিরসনে সম্ভাব্য প্রতিকারসমূহ নিম্নরূপ :

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো,

(২) শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করা,

(৩) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করা,

(৪) প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার ঘটানো,

(৫) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকার সমস্যা দূর করা,

(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঠিক শিক্ষাদান (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) বাস্তবায়ন করা,

(৭) খনিজ সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা,

(৮) প্রযুক্তিগত কাজে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও বিদেশী বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভরশীলতা কমানো।

(৯) দেশের খালি জায়গায় বনায়ন ও ভূমি সংরক্ষণ।

(১০) সঞ্চয় সম্পর্কে সচেতনতা ও অলসতা হ্রাস

(১১) আত্মকর্ম সংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণদানের ব্যবস্থা,

(১২) চুরি, ডাকাতি ও সন্ত্রাস বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি।

BANSDOC Library
Accession No. 17785
Date 10-6-04
BANSDOC Library Dhaka

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। বায়ুমণ্ডলের গ্যাসের তিনটি উপাদানের নাম লিখ।

উত্তর : নাইট্রোজেন ৭৮.১%, (খ) অক্সিজেন ২০.৯% এবং (গ) অবশিষ্ট ১% হলো আর্গন, হিলিয়াম, ক্রিপ্টন ইত্যাদি।

২। বৃষ্টির উৎপত্তি কিভাবে হয়?

উত্তর : নদী ও সমুদ্র থেকে পানি তাপে বাষ্পীভূত হয়ে উপরে জলীয় কণা হিসেবে ভেসে বেড়ায়, মেঘে পরিণত হয় এবং জলীয় কণা ভারি হলে তা বৃষ্টি আকারে ঝরে পড়ে।

৩। বায়ুমণ্ডলের স্তর প্রধানত কয়টি ও কি কি?

উত্তর : বায়ুমণ্ডলের স্তর প্রধানত দুটি, যেমন :

(ক) হোমোস্ফেয়ার স্তর (homosphere layer) এবং (খ) হেটেরোস্ফেয়ার স্তর (heterosphere layer)।

৪। বায়ুমণ্ডলের উপাদান কয়টি ও কি কি?

উত্তর : বায়ুমণ্ডলের উপাদান তিনটি। যেমন, (ক) বায়ুর উত্তাপ, (খ) বায়ুচাপ ও বায়ু প্রবাহ এবং (গ) বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত।

৫। ঘূর্ণিঝড় (cyclone) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : নিম্নচাপ বিশিষ্ট ঝড়কে ঘূর্ণিবাত বলা হয়। একে অন্য কথায় ঘূর্ণিঝড় বা নিম্নচাপজনিত ঝড় বলা হয়।

৬। অনাবৃষ্টি বা খরা বলতে কি বুঝ?

উত্তর : বায়ুমণ্ডলে যখন জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায় এবং শুষ্ক বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, তখন এই অবস্থাকে অনাবৃষ্টি বা খরা বলে।

৭। ভূমি বা প্রাকৃতিক ক্ষয় সাধনের কারণ কি?

উত্তর : ভূমি বা প্রাকৃতিক ক্ষয় মূলত দুটি কারণে ঘটে, যেমন :

(ক) বায়ুর ক্ষয়সাধনকার্য (wind erosion) এবং

(খ) পানির ক্ষয়সাধনকার্য (marine erosion)।

৮। বন্যা ব্যবস্থাপনা (flood management) কি?

উত্তর : যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদী, সমুদ্র ইত্যাদির পানিকে নিয়মিত উপায়ে পরিচালনা করে ক্ষয়ক্ষতি কমানো ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো হয়, তাকে বন্যা ব্যবস্থাপনা বলে।

-৯। পরিবেশ দূষণ কি?

উত্তর : বিভিন্ন দূষক দ্বারা পরিবেশ বসবাসের অনুপযোগী হলে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

১০। নগরায়ণ কি?

উত্তর : চাকরি, ব্যবসা ও কাজের জন্য মানুষ শহরের দিকে ধাবিত হলে আস্তে আস্তে শহরের আকৃতি ও জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তাকে নগরায়ণ বলে।

১১। স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রভাব (health impacts) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি প্রতিনিয়ত পুষ্টিকর খাদ্য খেলে, পরিশ্রম করলে এবং নিয়মিত চলার জন্য অসুখ-বিসুখ কম হলে, তাকে স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রভাব বলে।

১২। স্বাস্থ্য রক্ষার তিনটি উপাদানের নাম লিখ।

উত্তর : (১) পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, (২) পুষ্টিকর খাদ্য ও (৩) নিরাপদ পানি।

১৩। সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে রক্ষিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, প্রয়োগ ও বণ্টন হয় এবং তা দেশ গড়ার কাজে লাগে তাকে সম্পদ বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। পরিবেশগত বিষয় বলতে কি বুঝ?

উত্তর : পরিবেশগত বিষয় বলতে বুঝায় :

(১) বন্যা, (২) ঘূর্ণিঝড় (৩) খরা, (৪) মরুময়তা, (৫) ভূমিক্ষয়, (৬) নদী ভাঙ্গন, (৭) লবণাক্ততা, (৮) ভূমিকম্প প্রভৃতি।

২। টীকা লিখ (যে কোনো দুটি) :

(ক) খরার প্রভাব, (খ) অবঘর্ষজনিত ক্ষয় কার্য, (গ) অপসারণজনিত ক্ষয়কার্য।

উত্তর : (ক) খরার প্রভাব : খরার প্রভাব নিম্নরূপ :

(১) খরার প্রভাবে এলাকার খালবিল, নদীনালা শুকিয়ে বা পানি কমে যায়,

(২) বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যায়, ফলে এ সময় বৃষ্টি হতে পারে না,

(৩) গাছপালা পানি পায় না, ফলে কিছু কিছু গাছপালা মরে যায় প্রভৃতি।

(খ) অবঘর্ষজনিত ক্ষয়কার্য : মরুভূমি অঞ্চলে বা পাহাড়, টিলার প্রস্তর খণ্ড, মাটির ঢিবি বাতাস বা ঝড়ো হাওয়ায় ক্ষয় হতে হতে আকারে ছোট হয়ে যায়। এই ক্ষয়কার্যকে অবঘর্ষজনিত ক্ষয়কার্য বলে। বায়ুতাড়িত বালি দ্বারা ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত প্রস্তর খণ্ডের নাম জিউগেন।

(গ) অপসারণজনিত ক্ষয়কার্য : প্রচণ্ড বেগে প্রবাহমান বায়ু সূক্ষ্ম বালুকণাকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায়। একে অপসারণ বলে। ফলে ভূ-ভাগের কোথাও

নিচু এবং কোথাও উঁচু হয়ে যায়। এ ধরনের ক্ষয়কার্যকে অপসারণজনিত ক্ষয়কার্য বলে। মরুভূমিতে বালির ঝড় দ্বারা এ ধরনের ক্ষয়কার্য সাধিত হয়।

৩। লবণাক্ততার প্রভাব বর্ণনা কর :

উত্তর : মিঠাপানি এলাকায় লবণাক্ততার প্রভাব নিম্নরূপ :

(ক) লবণাক্ত পানি বিস্বাদ, এতে পেটের পীড়া হয়।

(খ) মিঠা পানির সাথে লবণাক্ত পানি মিশে গেলে মাছের প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

(গ) গাছ ও ফসলের গোড়া পচে যায়।

(ঘ) কিছু মাছ ও জলজ অন্যান্য প্রাণীও মারা যায়।

(ঙ) লবণাক্ত এলাকায় খাবার পানির জন্য মিঠা পানি সংগ্রহ করতে হয়।

৪। পৌরকরণ ব্যবস্থায় কি কি কাজ করা হয়।

উত্তর : পৌরবাসীদের নিকট থেকে বাৎসরিক হারে পৌরকর আদায় করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত কাজ করানো হয়, যেমন :

(১) পৌর এলাকায় প্ল্যান মোতাবেক রাস্তাঘাট নির্মাণ,

(২) পানি সরবরাহ ব্যবস্থা,

(৩) বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা,

(৪) ড্রেন পরিষ্কার, আগাছা ও বর্জ্য অপসারণ,

(৫) অধিবাসী ও পথচারীদের নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ, আনসার ও পাহারাদারের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৫। সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

উত্তর : সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীতা নিম্নরূপ :

(১) সম্পদ সংরক্ষণের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা হলো, সম্পদের ঘাটতি এড়ানো এবং ভবিষ্যতের জন্য সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখা,

(২) সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা,

(৩) সম্পদের যুক্তিসঙ্গত বা বিবেচনাপ্রসূত ব্যবহারের মাধ্যমে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা,

(৪) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করা।

৬। দরিদ্রতার পাঁচটি কারণ ও প্রতিকার লিখ।

উত্তর : দরিদ্রতার পাঁচটি কারণ ও প্রতিকার নিম্নরূপ :

দরিদ্রতার কারণ	দরিদ্রতার প্রতিকার
১। জনসংখ্যার আধিক্য	১। জনসংখ্যার হার কমানো
২। শিক্ষিতের হার কম	২। শিক্ষিতের হার বাড়ানো

৩। রাজনৈতিক অস্থিরতা	৩। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করা
৪। প্রযুক্তি শিক্ষার অনগ্রসরতা	৪। প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার ঘটানো
৫। কর্মসংস্থানের অভাব	৫। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকার সমস্যা দূর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিবেশগত বিষয় বলতে কি বুঝ? বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য কারণ বর্ণনা কর।

২। খরা-এর কারণ কি? বাংলাদেশে খরার প্রভাব বর্ণনা কর। বন্যা ব্যবস্থাপনার আওতায় কি কি কাজ আছে লিখ।

৩। নগরায়ণ বলতে কি বুঝ? পরিবেশের উপর নগরায়ণের প্রভাব বর্ণনা কর।

৪। স্বাস্থ্য পরিচর্যায় স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুষ্টিহীনতার উপাদানগুলো বর্ণনা কর।

৫। সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝ? এটির আওতায় কি কি সম্পদ পড়ে, তার ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি লিখ।

৬। দরিদ্রতার কারণ ও প্রতিকার লিখ।

৭। টীকা লিখ (যে কোন ৩টি) '

(ক) বন্যার কারণ,

(খ) ঘূর্ণিঝড়ের কারণ.

(গ) ভূমিক্ষয়,

(ঘ) পরিবেশ দূষণ,

(ঙ) নগরায়ণ।

চতুর্থ অধ্যায়

দূষণ ও ব্যবস্থাপনা

(Pollution and Management)

৪.১ দূষণ (Pollution)

প্রকৃতির হাজার উপাদান নিয়ে গঠিত এই পরিবেশ। পানি, বায়ু, গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু, মানুষজন, ঘরবাড়ি প্রভৃতি পরিবেশের উপাদান। পৃথিবীতে পানি ও বায়ু জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপাদান। এই উপাদানগুলোর সহনশীল গুণাগুণ যথাযথ আছে বলেই এই সুন্দর পৃথিবীতে জীবজন্তু, মানুষ, গাছপালা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করে বেঁচে আছে। ক্ষতিকর গ্যাস, পচা-দুর্গন্ধ ময়লা, জীবাণু প্রভৃতি পরিবেশের দূষণ ঘটায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে মুহূর্তের মধ্যে বিরাট এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। হাজার হাজার মানুষ পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার ফলে বিকলাঙ্গ ও অন্ধ হয় তাৎক্ষণিকভাবে, আবার কেউ ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করে। নাগাসাকি ও হিরোশিমার ধ্বংসযজ্ঞ আজও মানুষ ঘৃণার সাথে স্মরণ করে। পরিবেশ দূষণের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণেও পরিবেশ দূষণ ঘটে থাকে।

তদুপরি, আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত দেখতে পাই যে, বিভিন্ন কারণে পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে। দূষিত পরিবেশ জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এবং নানা রকম রোগজীবাণুও ছড়ায়। পচা দুর্গন্ধ এক মুহূর্তের মধ্যে গোটা পরিবেশকে নষ্ট করতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে পচা দ্রব্যগুলো সরিয়ে ফেললেই পরিবেশ ভালো হয়ে যায় না। সেজন্য নিয়মিত ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন। প্রতিকূল ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশের বাতাস, পানি, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বসতবাড়ির পরিবেশ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, হাটবাজার ইত্যাদির পরিবেশ দূষিত হতে পারে।

আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ঝুঁকির মুখে বাংলাদেশের এক কোটি লোক (Bangladeshi one crore people is in danger of arsenic poisonous reaction risk) : ১৯৯৫ সালে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিশেষ খবরে বলা হয়, দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী চারটি জেলা যেমন : সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের কয়েকটি নলকূপের পানিতে স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর জটিল রোগ সৃষ্টিকারী আর্সেনিক পাওয়া গেছে। জন্যস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। আর্সেনিকের বিষক্রিয়া যাতে ব্যাপকতা লাভ করতে না পারে, তার জন্য জরুরি ব্যবস্থা নেয়া দরকার বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

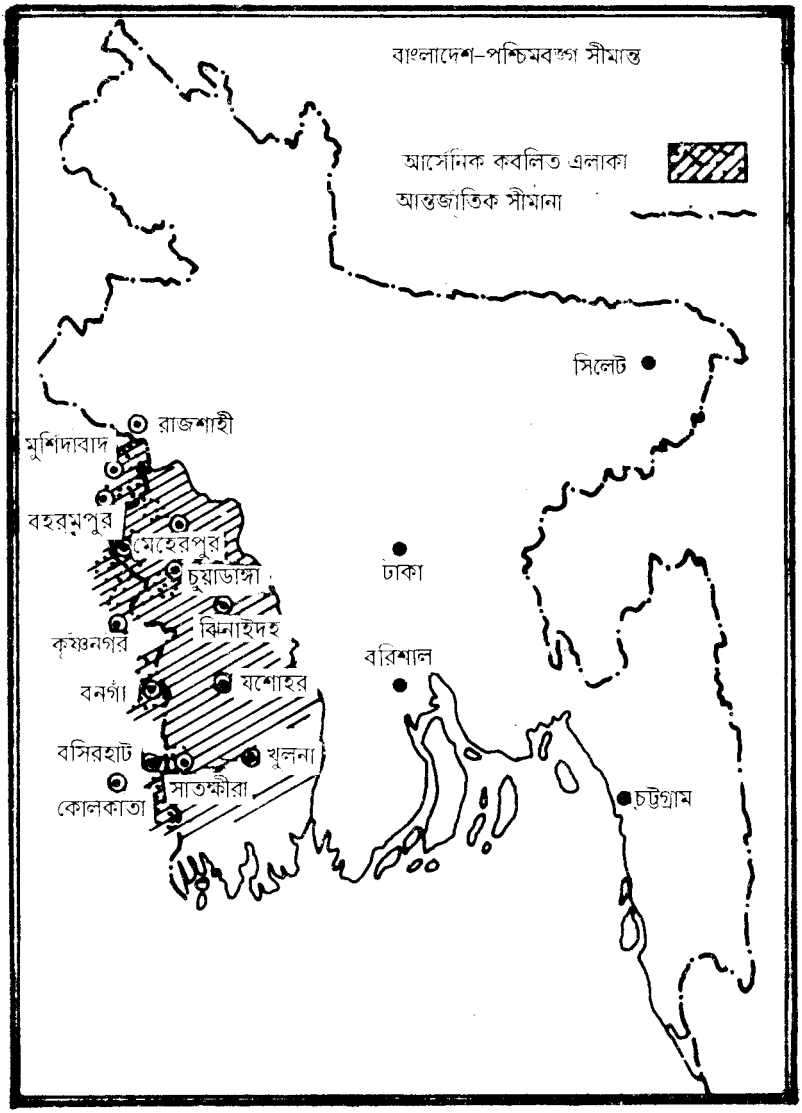

চিত্র ৪.১ : আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ঝুঁকির মুখে বাংলাদেশের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চল।

এদিকে সীমান্তের ওপারে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী ছয়টি জেলায় গঙ্গা নদীর পূর্ব দিক ধরে আর্সেনিকের ক্লোরাইড ও মিনি ওয়ার্মের মারাত্মক বিপদ দেখা দিয়েছে। আর্সেনিকের দূষণ কমাতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কয়েকশত নলকূপ সীল করে দিয়েছে এবং

টাস্কফোর্স গঠন করেছে। পত্রপত্রিকা এ খবর দিয়ে বলেছে বিজ্ঞানীরা বিপজ্জনক ভূগর্ভস্থ আর্সেনো পাইরাইযুক্ত পাথরের স্তরটির অবস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সূত্রে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক সংক্রমিত হবার পর সম্প্রতি দেশের অন্যান্য স্থানের মতো দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল সীমান্তবর্তী কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, খুলনা, ঝিনাইদহ ও যশোহরের মোট ৩২টি নলকূপের পানি আর্সেনিক পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে কুষ্টিয়ায় ২টি, চুয়াডাঙ্গায় ১টি, মেহেরপুরে ১টি ও সাতক্ষীরায় ১টি নলকূপের পানিতে গ্রহণযোগ্য পরিমাণের চেয়ে অধিক পরিমাণে বিষাক্ত আর্সেনিক পাওয়া গেছে। আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহারে চর্মরোগ থেকে শুরু করে জটিল রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিশেষজ্ঞগণ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের ৮টি জেলায় এক কোটি লোক আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ঝুঁকির মুখে রয়েছে বলে এক উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ করেন। বিশেষজ্ঞের মতে, অতিমাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে নলকূপে আর্সেনিক উঠে আসছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জেলাওয়ারি নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা, সেটি পরীক্ষা করছে। যেটিতে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে, সেটিতে লাল রঙ এবং যেটিতে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে না, সেটি সবুজ রঙ করে দিচ্ছে। আর্সেনিকযুক্ত পানি খাওয়া ও রান্নার জন্য ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু এই পানি দ্বারা অন্যান্য কাজ করা যায়। আর্সেনিক কমাতে এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এই বিষক্রিয়ায় জনস্বাস্থ্যে কি কি ক্ষতি হতে পারে, তা নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ জনসাধারণের মধ্যে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৪.১ চিত্রে বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে আর্সেনিক কবলিত এলাকা ও আন্তর্জাতিক সীমানা দেখানো হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ এবং উপাদান কিভাবে দূষণ হয়, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো :

৪.২ বায়ু দূষণ (Air pollution)

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বাতাস প্রথম স্থানটি অধিকার করে আছে। আজকাল পৃথিবীর সব চিন্তাবিদ বায়ু দূষণ এবং পানি দূষণ এর ব্যাপারটি নিয়ে বেশ চিন্তাভাবনা করছেন। তাঁদের মতে হাজার বছর আগে বাতাসের যে গুণাগুণ ছিল, এখন সে গুণাগুণে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। আর এ কারণেই প্রাণিজগতের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে হুমকি দেখা দিয়েছে।

বায়ু দূষণের উৎপত্তিস্থল

প্রতিনিয়ত কিভাবে বায়ু দূষণ হয় এবং এর জন্য কোন গ্যাস দায়ী তা নিচের ছকে দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	শ্রেণী	গ্যাস ও বাষ্প
১.	দহন (গৃহস্থালী, পাওয়ার প্লান্ট, মোটরযান, উড়োজাহাজ, রেলওয়ে এবং পরিত্যক্ত দ্রব্যের দহন)।	SO_2, NO_2, CO গন্ধযুক্ত জৈব বাষ্প।

২.	রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত শিল্প (কাগজের কল, সিমেন্ট ও সার কারখানা)	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর নির্ভর করে (SO, CO, NH_2, NO_2 গন্ধযুক্ত জৈব বাষ্প)
৩.	পেট্রোলিয়াম শিল্প প্রতিষ্ঠান	SO_2, H_2S, NH_2, CO, হাইড্রোজেন মারসেন্টানস।
৪.	ইস্পাত ও ধাতব শিল্প (অ্যালুমিনিয়াম শোধনাগার, ইস্পাত কারখানা)	SO_2, CO, ফ্লোরাইড, জৈব বাষ্প
৫.	সার কারখানা	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর নির্ভরশীল (SO_2, CO, ফ্লোরাইড, জৈব বাষ্প)
৬.	খাদ্য ও খাদ্যজাত প্রক্রিয়া	গন্ধযুক্ত দ্রব্য, জৈব ফসফেট
৭.	কৃষিকার্য : ১. শস্য ছিটানো ২. ভূমি দহন	ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন SO_x, জৈব বাষ্প
৮.	পারমাণবিক শক্তি : ১. জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার ২. কোর প্রস্তুতকরণ ৩. বোমা ফাটানো	 ফ্লোরাইড আয়োজিন – 131 এবং আর্গন – 40 তেজস্ক্রিয় গ্যাস

গাছপালার উপর ক্ষতিকারক গ্যাসের প্রভাব

গ্যাস	মাত্রা	প্রভাব
১. SO_2	সামান্য	পাতার শিরায় ক্লোরোটিক ব্লিচিং, শিরায় বেশি নিক্রোসিস হয় এবং পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে।
২. ওজোন	সামান্য বেশি	অকালপক্ক পাতা, পাতার উপরিভাগে দাগ এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। নিক্রোসিস, ব্লিচিংসহ পাতা ঝরে যায়
৩. ফ্লোরাইড	সার্বিক প্রভাব	পাতার অগ্রভাগে নিক্রোসিস।
৪. NO_2	সামান্য	উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত।
৫. ইমিলিন	সামান্য	ইপিন্যাসটি, পাতার abscission।
৬. PAN	সামান্য	নিম্নাংশের পাতা খয়েরি হয়ে যায়, সদ্যজাত পাতার উপর প্রভাব মারাত্মক।

বিভিন্ন পদার্থের উপর ক্ষতিকারক গ্যাসের প্রতিক্রিয়া

পদার্থ	বায়ু দূষক	প্রভাব
ধাতু	SO_2, এসিড গ্যাস	পুড়ে যাওয়া, ক্ষয় হওয়া, ধাতুক্ষয়, উপরিভাগ বিনষ্ট হয়।
বিল্ডিং তৈরির উপাদান	SO_2, এসিড গ্যাস ও কণা	রঙ বিনষ্ট হয়।
রঙ	SO_2, H_2S কণা	রঙ বিনষ্ট হয়।
টেক্সটাইল ও ডাই	SO_2, এসিড গ্যাস, NO_2, O_3	প্রসারণ ক্ষমতা বা শক্তি কমে যায়।
রবার	অক্সিডেন্টস, O_3	ফেটে যায়, শক্তি হ্রাস হয়।
চামড়া	SO_3, এসিড গ্যাস	উপরিভাগ পাউডারে পরিণত হয়।
পেপার	SO_3, এসিড গ্যাস	ভঙ্গুর হয়।
সিরামিক	এসিড গ্যাস	উপরিভাগের আমূল পরিবর্তন হয়।

বায়ু দূষিত হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. গাছপালা নিধন : পৃথিবীতে জীব বাতাস গ্রহণ করে শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে জীবনধারণ করে। বাতাসের মূল উপাদান অক্সিজেনের (O_2) সরবরাহকারী হলো গাছ। আবার আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ছেড়ে দেই তা গাছ শোষণ করে। সুতরাং গাছপালা আমাদের পরম বন্ধু। গাছপালা কর্তন করায় এই কাজগুলো করার আর কোনো মাধ্যম থাকছে না। তাই গাছপালা, বনরাজি নিধনের জন্য বাতাসে CO_2 মাত্রা বেড়ে গিয়ে বাতাস দূষিত হয়।

২. জ্বালানি দহনের ধোঁয়া পরিবেশে নির্গত হওয়া : আগুন আবিষ্কারের পর পরই পৃথিবীতে জ্বালানি পোড়ানোর অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করে। তখন থেকেই কাঠ, পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পারমাণবিক জ্বালানি (ইউরেনিয়াম-২৩৫) প্রভৃতি জ্বালিয়ে ক্ষতিকর গ্যাসের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। কলকারখানা, ইঞ্জিন, চুল্লি প্রভৃতি থেকে জ্বালানি দহনের যে ধোঁয়া নির্গত হয়, তাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং কার্বন মনোক্সাইড (CO) নামক ক্ষতিকর গ্যাস থাকে।

তদুপরি, জ্বালানি পোড়ালে সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), নাইট্রোজেন জমাকৃত পদার্থ নাইট্রাস অক্সাইড (NO), ওজোন (O_3) বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাসেরও উদ্ভব ঘটে। এই গ্যাসসমূহের মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড (CO) উৎপন্ন হয় জ্বালানির অপোড়া অবস্থায় দহন ঘটলে, সিগারেটের আগুন থেকে ও মোটরযানের আধাপোড়া জ্বালানি থেকে, কেরোসিনের স্টোভ থেকে, শিল্পকারখানার চিমনির ধোঁয়া থেকে। এর ক্ষতিকারক দিকগুলো হচ্ছে এটি

শরীরের রক্ত চলাচলের বিঘ্ন ঘটায়, সর্দিকাশির প্রকোপ বৃদ্ধি করে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটায়। বাতাসের মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড এর মাত্রা ৯ পি.পি.এম বা ১০ হাজার ভাগের নয় ভাগ এবং এর ক্ষতিকারক মাত্রা হলো ৫০ পি.পি.এম.।

নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড গ্যাস (NO_2) পাওয়ার প্ল্যান্ট বা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জ্বালানির দহন, বয়লার প্ল্যান্ট ও মোটরযানের জ্বালানি দহন থেকে উৎপন্ন হয়। এটিও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

ওজোন গ্যাস (O_3) বায়ুমণ্ডলের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু পরিমাণের তুলনায় বেশি এই গ্যাস মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। বাতাসের মধ্যে এই গ্যাসের মাত্রা ০.১২ পি.পি.এম. থাকা উচিত। এর অধিক থাকলে চোখ জ্বালা করা, সর্দি, কাশি, মাথা ব্যথা, গলায় ব্যাথা বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দেয়।

হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস (H_2S) পেপার ও পাল্প মিল, চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানা, সার কারখানা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নির্গত হয়। এই গ্যাস মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। এই গ্যাসের আরেকটি খারাপ দিক হলো, এটির আধিক্যের প্রভাবে ব্রেইন অকেজো (brain damage) হয়ে যায়। জীবজন্তুর শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য এ গ্যাস মারাত্মক ক্ষতিকারক। আবদ্ধ ঘরে এবং গাছপালাবিহীন পরিবেশে এই গ্যাস জীবজন্তুর মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

৩. শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থের নির্গমন : ছোট বড় শিল্প কারখানা, রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, তেল শোধনাগার, প্লাস্টিক ও সার কারখানা, সিমেন্ট কারখানা, ইস্পাত শিল্প, মেশিন শপ, পাওয়ার শপ, প্যাটার্ন শপ, চামড়া শিল্প প্রভৃতি থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়, সেটি দ্বারা বাতাস দূষিত হতে পারে।

৪. ডাস্টবিন ও আবর্জনা : ডাস্টবিনের ময়লা যদি প্রতিদিন পরিষ্কার করা না হয়, তা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয় এবং পচা আবর্জনা যত্রতত্র পড়ে থাকলেও তা দ্বারা বাতাস দূষিত হতে পারে।

৫. মলমূত্র যত্রতত্র ত্যাগ করা : সেফটি ট্যাংক যদি ভরে যায় এবং মলমূত্র যত্রতত্রভাবে ত্যাগ করা হয়, তাতে বাতাস দূষিত হয়।

৬. মোটরগাড়ি থেকে নির্গত গ্যাস : মোটরগাড়ি, স্কুটার প্রভৃতি থেকে যে গ্যাস নির্গত হয় তা বায়ু দূষণের মূল কারণ। তাই দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলের বায়ু অপেক্ষা শহরাঞ্চলের বায়ু অধিকতর দূষিত।

৪.৩ বায়ু দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা (Air Pollution Management)

দূষণরোধ করতে নিম্নবর্ণিত উপায়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন :

১. বৃক্ষরোপণ : গাছ তার নিজ খাদ্য তৈরির জন্য বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ঘাটতি গাছপালাই পূরণ করে থাকে। গাছপালা শুধু অক্সিজেন সরবরাহ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করেই

ক্ষান্ত হয় না। গাছ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে, বায়ু শোষণ করে এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

২. **অধিক ধোঁয়া উৎপাদক জ্বালানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ :** কাঠ, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি জ্বালানি দহনের সময় অধিক হারে ধোঁয়া নির্গত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের চুল্লিতে কাঠ অথবা বয়লার চুল্লির মতো ধোঁয়া নির্গত হয় না। ফলে, রান্নার কাজে বৈদ্যুতিক অথবা গ্যাসের চুল্লি ব্যবহার করলে বাতাস দূষণ রোধ হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রেসার কুকার ব্যবহারে ধোঁয়া নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু তা ব্যয়বহুল। মোটরযানের ইঞ্জিন অধিক পুরানো হলে এবং জ্বালানি দহন প্রকোষ্ঠে ত্রুটির কারণে ইঞ্জিন থেকে দূষিত ধোঁয়া নির্গত হয়। পুরাতন ইঞ্জিন মেরামত অথবা বাতিল এবং দহন প্রকোষ্ঠের ত্রুটি দূর করলে তা থেকে দূষিত গ্যাস নির্গত হবে না। ফলে, বাতাসের দূষণরোধ হবে।

৩. **পচনযোগ্য দ্রব্য দ্রুত অপসারণ :** বসতবাড়ি, দোকানপাট, বাজার প্রভৃতি থেকে পচা বা পচনশীল দ্রব্য অনেকে এলোপাতাড়িভাবে ফেলে দেয়। ডাস্টবিনে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ তা পচতে থাকে। ফলে যথাশীঘ্র এই পচনশীল ও দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য সরিয়ে শোধনাগারে পাঠানো অথবা মাটির নিচে পুঁতে ফেললে বাতাসের দূষণ রোধ হয়।

৪. **বায়ু দূষণ পদার্থকে মুক্ত আকাশে ছড়িয়ে দেয়া :** কলকারখানা হতে দূষিত গ্যাস যথাযথ পরিশোধনের পর চিমনির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়া হয়। অঞ্চল বিশেষে বাতাসের বেগের উপর ভিত্তি করে চিমনির উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়। কম উচ্চতার চিমনি হতে নির্গত দূষিত গ্যাস ধীর বায়ু প্রবাহের ফলে কারখানার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে কর্মচারিদের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। বায়ু প্রবাহের মাত্রা বেশি হলে এই গ্যাস অধিক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে—ফলে গ্যাসের ঘনত্ব হ্রাস পায়।

৫. **উৎপাদন প্রণালির উন্নতিসাধন :** শিল্পকারখানা, ইঞ্জিন প্রভৃতি থেকে যে ধোঁয়া নির্গত হয়, তা যদি যন্ত্রের মধ্যে শোধন করে বাইরে প্রেরণ করা যায়, তাহলে বায়ুমণ্ডলের বাতাস কলুষিত হয় না। বিশেষজ্ঞগণ ইতোমধ্যে এ ধরনের দূষিত গ্যাস শোধনযন্ত্র আবিষ্কার করেছেন।

৬. **অঞ্চল ভাগ :** বড় বড় শহরে আবাসিক এলাকা, শিল্প এলাকা, অফিস আদালত এবং বাণিজ্যিক এলাকাকে পরিকল্পনা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়। এতে শিল্প কারখানার দূষিত বাতাসে জনমানব ও জীবজন্তুর ক্ষতি হতে পারে। এতে কিছুটা হলেও বায়ু দূষণের হাত থেকে পরিবেশ রক্ষা পায়। দেশের বড় বড় শহরে, বিদেশে, যেমন—আমেরিকাতে এ ধরনের অঞ্চল ভাগ করে পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

৭. **দূষণ পদার্থের শোধন :** দূষণ পদার্থের শোধন প্রণালি একটি আধুনিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দূষণ পদার্থ মুক্ত বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ার আগেই গবেষণাগারে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছেঁকে নেয়া বা দূষণ পদার্থকে আলাদা করা হয়। এই দূষিত পদার্থের কণা অন্য কোনো কাজে লাগানো হয়। তবে এই শোধন প্রক্রিয়া একটু জটিল।

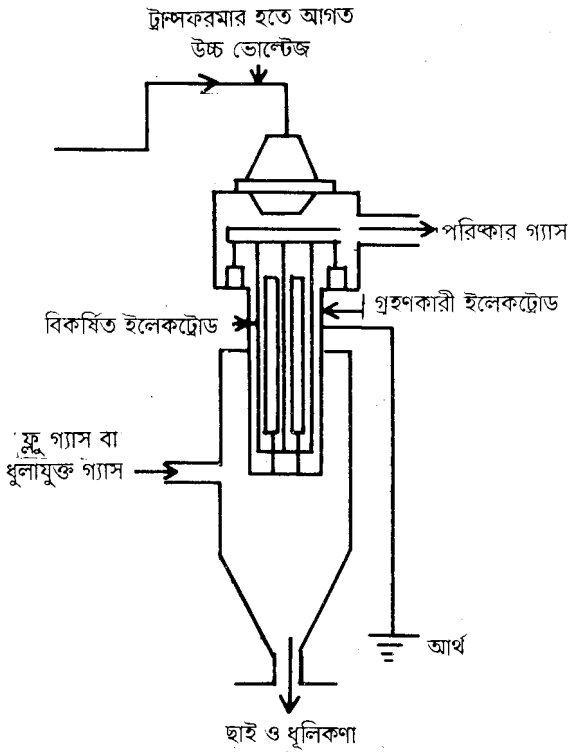

চিত্র ৪.২ : ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর।

আজকাল সেটলিং প্রকোষ্ঠ (setling chamber), ধূলিকণা পৃথককরণ (dust separator), ব্যাগ ফিল্টার, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর (electorstatic precipitator) প্রভৃতি আমাদের দেশে পাওয়ার প্ল্যান্টেও ব্যবহৃত হয়। ৪.২ চিত্রে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর এর কর্তিত নকশা দেখানো হয়েছে। এটি বাতাস থেকে ধুলাবালি আলাদা করে পরিবেশ দূষণ কমায়। সংগৃহীত দূষণ পদার্থ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক কার্যকর জিনিস তৈরি করতে সাহায্য করছে। যেমন : সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) অণু দিয়ে সালফিউরিক এসিড, সল্ট কেক (salt cake) দ্বারা কাগজের মণ্ড তৈরি করা হয় এবং ছাইভস্ম সিমেন্টের উপাদান হিসেবে কাজে লাগানো হয় ইত্যাদি। সুতরাং বায়ু শোধন করতে গিয়ে আসল উদ্দেশ্যতো সফল হবেই, তদুপরি বোনাস হিসেবে দূষিত পদার্থের অণু দিয়ে

অন্যান্য কার্যকর উপাদান প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। তাই, এটি অধিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে।

বাংলাদেশে বাতাসের প্রকৃতির অবস্থা (Air Quality status in Bangladesh) : ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষ বাতাস, পানি, মাটি, আবহাওয়া, পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে তেমন সচেতন ছিল না। বর্তমানে জলবায়ুর পরিবর্তনে দেশের ক্ষতিকর অবস্থা বিবেচনা করে আমাদের দেশের লোকজন সতর্ক হয়েছে। এক দেশের বাতাস দূষিত হলে তার দ্বারা বিশ্ব বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়। সে আলোকে বাংলাদেশের বাতাসের প্রকৃতির অবস্থা একটি ছক দ্বারা দেখানো হয়েছে। যেমন :

দূষণ (pollution)	নিরাপত্তা স্তর (Safe level)	ক্ষতিকারক স্তর (Harm level)	ঢাকা শহরে স্তর
কার্বন মনোক্সাইড (CO)	৯	৫০	৬০
ওজোন (O_3)	০.১২০	০.৬০	০.৬৫
নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2)	০.০৫৩	২.০০	০.৫১৭
সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)	০.১৪	১.০০	০.১৯৬
ধুলাবালি	১৫	৬০০	৯৪৬

পরিবেশ অধিদপ্তরের এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, বাংলাদেশে সর্বমোট প্রায় ৩,৬৭,০০০ মোটরযান চালু রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে রয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মোটরযানের সংখ্যা কম হলেও তা থেকে নির্গত ধোঁয়ার মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। নিচে একটি ছকে ঢাকা মহানগরীতে বিভিন্ন গ্যাসের নির্গমনের মাত্রা দেখানো হয়েছে।

ঢাকা নগরীর বাতাসে মোটরযানের নির্গত ধোঁয়ার পরিমাণ (Automobile emission into the Air of Dhaka city) :

মোটরযান থেকে নির্গত গ্যাস	প্রতিদিন নির্গত গ্যাসের পরিমাণ
ধুলাবালি	১,২৪১ কেজি/দিন
সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)	৩,৪৩২ কেজি/দিন
নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x)	৩৫,৪৪২ কেজি/দিন
কার্বন মনোক্সাইড (CO)	৪৮৪ টন/দিন

ঢাকাতে দিন দিন বস্তি এলাকা ও অপরিকল্পিত কলকারখানা স্থাপনের কারণে এই নগরীর বাতাস দূষণের পরিমাণ বেড়ে চলেছে, যা ভবিষ্যতের জন্য ভয়াবহ।

৪.৪ পানি দূষণ

মানুষের বা জীবজন্তুর পেটের পীড়ার অধিকাংশ কারণ হলো পানি দূষণ। যেমন : আমাশয়, কলেরা, বদহজম, গ্যাস্ট্রিক প্রভৃতি। নিম্নবর্ণিত কারণে পানি দূষিত হতে পারে। যেমন :

১. জলাধারের সাথে নর্দমার সংযোগ : নদী, পুকুর, দীঘি প্রভৃতির সাথে ময়লা পানি বাহিত নর্দমার সংযোগ থাকলে পানি দূষিত হয়। এ পানি দ্বারা কোনো কাজ করা উচিত নয়। গ্রামে-গঞ্জে পায়খানা পানিবাহিত লাইনের সাথে জলাশয়ের সংযোগ দেয়া হলে এই দুরবস্থার উদ্ভব ঘটে।

২. জলাশয়ের পানিতে কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ মিশ্রিত হওয়া : কলকারখানা থেকে পোড়া গ্যাস, তেল জাতীয় দ্রব্য, ক্ষারকীয় পদার্থ ইত্যাদি প্রবাহিত হয়। এই ক্ষতিকারক পদার্থের মিশ্রণে পুকুর, নদী, খালবিল ও জলাশয়ের পানি দূষিত হয়।

৩. রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে পানি দূষিত হওয়া : সুতাকল, পাটকল, সিমেন্ট কারখানা, পাল্প মিলস, সার কারখানা প্রভৃতি থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে পানি দূষিত হয়। যেমন : সিলেটের পাল্প মিলস ও কারখানা থেকে নির্গত রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ মিশ্রিত পানি কুশিয়ারা নদী ও সাগরের পানিকে দূষিত করছে।

৪. পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে পানি দূষিত হওয়া : পারমাণবিক বোমাতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে, যা পানি ও বায়ুকে দূষিত করে এবং তা গোটা পরিবেশকে ব্যাহত করে। সমুদ্রের মধ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণে তাই পানি দূষিত হয়।

৫. পারমাণবিক বর্জ্য সংমিশ্রণে পানি দূষিত হওয়া : পারমাণবিক রিয়্যাক্টর, ডুবো জাহাজ, সোডিয়াম কুলড বাল্ব ইত্যাদি থেকে বিক্রিয়া ঘটানো ছাই জাতীয় বর্জ্য পদার্থ গভীর সমুদ্র স্রোতে ছেড়ে দেয়া হয়। বেশি অথবা কম হলেও তা পানিকে দূষিত করে, যা মৎস্য সম্পদ ও মৎস্যভোজীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

৬. জলাশয়ে গরু-বাছুরের গোসলে পানি দূষিত হওয়া : গরু-বাছুরের গায়ে রোগজীবাণু থাকে। তাই, এগুলোকে জলাশয় অথবা পুকুরে গোসল করালে পানি দূষিত হয়। এরূপ পানিতে গোসল করা এবং ঐ পানি রান্নার কাজে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

৭. পাইপ লাইন লিকেজ হয়ে পানি দূষিত হওয়া : নর্দমা ও সিউয়েজ পাইপের পার্শ্ব দিয়ে পানি সরবরাহের পাইপ গেলে এবং তা লিকেজ হলে সেই পানি দূষিত হয়। তাই, সন্দেহ হলে ট্যাপের পানি ফুটিয়ে খাওয়া যুক্তিযুক্ত।

৮. পেস্টিসাইড মিশে পানি দূষিত হওয়া : শস্য ক্ষেত্রে : পোকা-মাকড় দমন করার জন্য পেস্টিসাইড প্রদান করা হয়। এতে পোকা-মাকড় দমন হলেও বৃষ্টির পানি অথবা বন্যার পানিতে ধুয়ে নদী, পুকুর ও বিলের পানিকে দূষিত করে। এজন্য সেখানকার মৎস্য সম্পদ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই মাছ যারা খায় তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। রান্নার কাজে এ পানি ব্যবহার করেও লোকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৯. শহরায়ণের ফলে পানি দূষিত হওয়া : শহরায়নের ফলে বস্তি এলাকার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তাদের বর্জ্য পদার্থ পুকুর, নালা প্রভৃতিতে ফেলা হচ্ছে, সেখানকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং পানিও দূষিত হচ্ছে।

১০. শিল্প কারখানা থেকে নিঃসৃত উত্তপ্ত পানি দ্বারা পানি দূষিত হওয়া : কলকারখানা থেকে যে উত্তপ্ত পানি ছাড়া হয়, সেটি জলাশয়ের সাথে মিশে মৎস্য সম্পদকে বিনষ্ট করছে এবং মাছের বসবাসের জন্য পানিতে যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন, তা নষ্ট করছে। ফলে বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার জলাশয়সমূহে মাছের স্বল্পতা বা শূন্যতা দেখা দিচ্ছে।

১১. লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে পানি দূষিত হওয়া : পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেলে তা দিয়ে কৃষিক্ষেতে পানি সেচ ও গাছপালা উৎপাদন সম্ভব নয়। তবে লবণাক্ত পানি দ্বারা নারিকেল ও সুপারি গাছের কিছু উপকার হয়।

১২. শস্যক্ষেতের আবর্জনা পচে পানি দূষিত হওয়া : শস্যক্ষেতের পরিত্যক্ত গাছপালার অবশিষ্টাংশ, পাতা ইত্যাদি পানির সংস্পর্শে পচে পানিকে দূষিত করে।

১৩. ভাতের মাড় মিশে পানি দূষিত হওয়া : ভাতের মাড়, মলমূত্র প্রভৃতি একটি জলাশয়ে পতিত হলে তা দহন বিক্রিয়ায় ($CH_2O + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$) কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। ফলে, সে পানিতে মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হয়।

১৪. ক্ষতিকারক খনিজ পদার্থ মিশে পানি দূষিত হওয়া : পানিতে আর্সেনিক (As), ক্যাডমিয়াম (Cd), সীসা (Pb), ক্রোমিয়াম (Cr) প্রভৃতি মিশে পানিকে দূষিত করে। এ পানিতে গোসল করলে গায়ে নানা রকম চর্ম রোগ জন্মে। অর্সেনিক ও ডি.ডি.টি. প্রায় একই ধরনের বিষাক্ত পদার্থ।

১৫. রাসায়নিক পদার্থ মিশে পানি দূষিত হওয়া : পল্লীবিদ্যুতের কাঠের খুঁটি ব্যবহার করার আগে তিন প্রকার রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে ডুবিয়ে তাপ প্রয়োগে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ রোধ করা হয়। রাসায়নিক পদার্থ জীবজন্তুর জন্য ক্ষতিকর। ফলে, বন্যার সময় এই খুঁটিগুলো পানি দূষিত করে, ফলে মাছ মরে যায় এবং অন্যান্য খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

৪.৫ পানির দূষণ রোধের ব্যবস্থা (Means of Anti water pollution)

পানির দূষণ রোধকল্পে নিচের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন :

১. জলাশয়ের সাথে নর্দমার সংযোগ না দেয়া।

২ জলাশয়ের পানিতে কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ না ফেলে তা নির্দিষ্ট গর্তে ফেলা।

৩. রাসায়নিক দ্রব্য জলাশয়ে না মিশিয়ে কংক্রিট নির্মিত নালায় অথবা কোনো গর্তে ছেড়ে দেয়া ভালো।

৪. কোনো জলাশয়ে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণও ঘটানো উচিত নয়, কারণ এতে সমগ্র পৃথিবীর পরিবেশ নষ্ট হয়।

৫. পারমাণবিক বর্জ্য কংক্রিট নির্মিত কঠিন পাত্রে বদ্ধ অবস্থায় ২৫/৩৯ মিটার মাটির নিচে পুঁতে ফেলা উচিত।

৬. গরু-বাছুর পুকুর বা জলাশয়ে গোসল করানো ঠিক নয়।

৭. পানির লাইনকে দূষিত দ্রব্যের পাশ দিয়ে নেয়া ঠিক নয় এবং লিকেজ পরীক্ষা করে সর্বদা ঠিক রাখা দরকার।

৮. জলাধারের কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। ফসলের ক্ষেতে প্রয়োগ করা পেস্টিসাইড দ্বারা পানি যাতে দূষিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

৯. পানি ফুটিয়ে পান করলে পানির দূষিত অবস্থা নষ্ট হয়ে যায়।

১০. থিতানো প্রক্রিয়া এবং ফটকিরি ফেলে খাবার পানির দূষণ দূর করা হয়। বয়লার ড্রামে প্রয়োগকৃত পানিও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করা যায়।

পৌর এলাকা থেকে গৃহে ব্যবহারের পানি ও পয়ঃপ্রণালির বর্জ্য পানি (sewerage water) সরাসরি নদী অথবা যে কোনো জলাশয়ে ছেড়ে না দিয়ে তা পরিশোধন প্ল্যান্টের মাধ্যমে ছাড়া প্রয়োজন। ঢাকা শহরের বর্জ্য পানি পাগলায় স্থাপিত পরিশোধন প্ল্যান্টের মাধ্যমে শোধন করে বুড়িগঙ্গা নদীতে ছাড়া হয়। ফলে, বুড়িগঙ্গা নদীর পানি মানুষ ও মাছের জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে না।

তবে, মাটির উপরিভাগের পানি বিবেচনা করলে মধুমতি নদীর পানি বুড়িগঙ্গা নদীর পানির তুলনায় ভালো। ঢাকা শহরে জনসংখ্যার আধিক্য ও লঞ্চ, স্টিমার প্রভৃতি অধিক চলার কারণে বুড়িগঙ্গার পানি কিছুটা হলেও দূষিত হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রকৃতি (ground water quality) : প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত পানির কোনোটিই সবদিকে বিশুদ্ধ নয়। আমরা সচরাচর নলকূপের পানি পান করি। কিন্তু, এই পানিতেও উপস্থিত বিভিন্ন উপাদানের কমবেশির কারণে তা দূষিত হতে পারে যা জীবজন্তু সকলের জন্যই ক্ষতিকর। নিচে ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রকৃতি একটি ছকে দেখানো হয়েছে :

মাধ্যম	গভীর নলকূপ	স্বাস্থ্য সম্পদ মাত্রা
পি. এইচ (pH)	৭.৫	৬.৫–৮.৫
ক্লোরাইড	১১০০ মি. লি./লিটার	২৫০
ই. সি (EC)	৪০০০ মিলি মোর/সে:মি:	--
টি.ডি.এস (TDS)	১৮০০ এম. জি/লিটার	১০০০
ডি. ও (D.O)	৩.১ এম.জি/লিটার	--
বি. ও. ডি (BOD)	১.২ এম.জি/লিটার	--
সি. ও. ডি (COD)	১৮ এম.জি/লিটার	--
লৌহ	০.৩ এম.জি/লিটার	০.৩

৪.৬ শব্দ দূষণ (Noise Pollution)

কথোপকথনের শব্দ শ্রুতিমধুর, যা দিয়ে মনকে শান্তি এবং গড়বে কাজের পরিকল্পনা। অপরদিকে কর্কশ শব্দ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। কর্কশ শব্দ কর্তৃক পরিবেশ দূষণের কারণ ও প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

১. কর্কশ শব্দ ভীতির সঞ্চার করে : কর্কশ শব্দ হঠাৎ যদি কারো কর্ণে প্রবেশ করে, তখন সে তাৎক্ষণিকভাবে ভীতিগ্রস্ত হয়। কেউবা এ ধরনের শব্দ শুনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের শব্দে কেউবা জ্ঞান হারিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটাতে পারে। কলকারখানায় এ রকম শব্দের ভীতির কারণে অনেকের জীবননাশও হতে পারে।

শব্দ পরিমাপ করা হয় ডেসিবেল দ্বারা। যুদ্ধ বিগ্রহ, জেট বিমান চলা, উন্নয়ন ও মেরামত কাজ, ব্যস্ত শহরের গাড়ি ও জনমানবের শব্দ ইত্যাদি দ্বারা অধিক হারে শব্দ দূষণ ঘটে। এসব ক্ষেত্রে শব্দ দূষণের মাত্রা ৯০ থেকে ১৯০ ডেসিবেল পর্যন্ত হয়। নিচে বিভিন্ন কারণে শব্দ দূষণের মাত্রা (noise level) ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

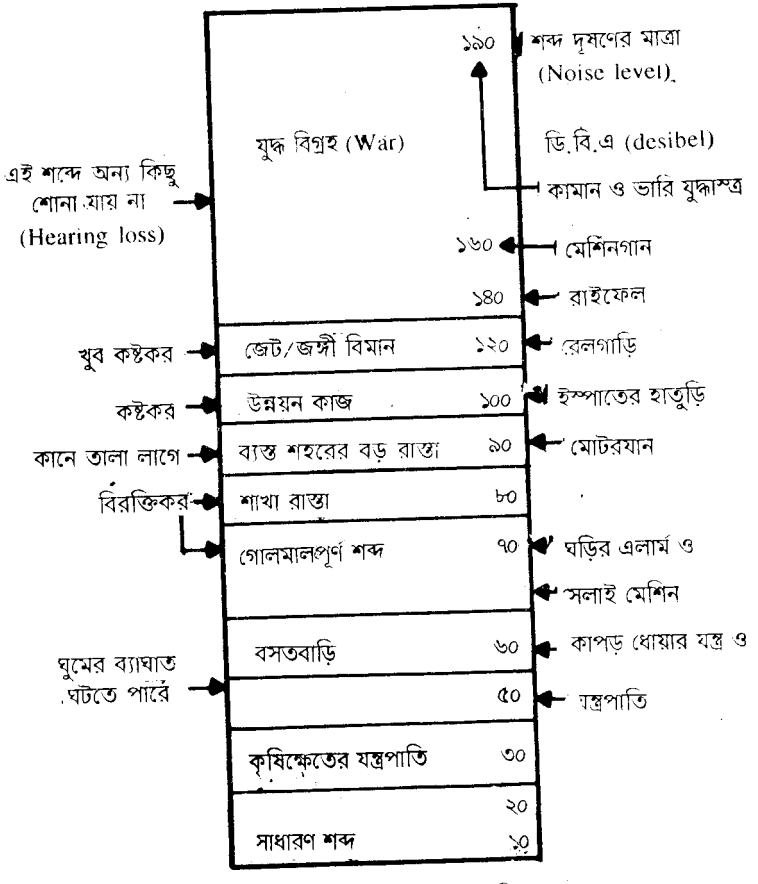

চিত্র ৪.৩ : শব্দ দূষণ মাত্রার রেখাচিত্র।

২. কর্কশ শব্দ আবাসিক এলাকার পরিবেশ নষ্ট করে : শব্দ দূষণ ঘটলে পারিবারিক জীবন বিপন্ন হয়। সেখানে মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার

ব্যাঘাত ঘটে, স্বাভাবিক কথোপকথনে ব্যাঘাত ঘটে। কোনো বাড়িতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও রোগী থাকলে শব্দ দূষণে তাদের রক্তচাপ ও অসুস্থতা বেড়ে যেতে পারে।

৩. **শব্দ দূষণে হাসপাতালের পরিবেশ নষ্ট হয় :** মোটরগাড়ির হর্ন, মাইকিং প্রভৃতির বিকট শব্দ নিয়ন্ত্রণ করা না হলে হাসপাতালের সমগ্র পরিবেশ নষ্ট হয়। কোনো রোগী বিকট শব্দের মধ্যে নিজেকে সুস্থ বোধ করে না এবং ঘুমোতেও পারে না।

৪. **ককটেল, হাতবোমা প্রভৃতিতে শব্দ দূষণ ঘটে :** ককটেল ও হাতবোমা প্রভৃতি বিকট শব্দ ঘটায়। এতে শব্দ দূষণ ঘটে, মানুষ ভীতগ্রস্ত হয় এবং অনেকে এ ধরনের বারুদের আঘাতে আহত বা নিহতও হতে পারে।

শব্দ দূষণজনিত বধিরতা : পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শব্দ দূষণ ঢাকা মহানগরীতে এক মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। আমরা এর খারাপ প্রভাব সম্পর্কে খুব একটা অবগত নই। কারণ বায়ুদূষণ আমরা দেখতে পাই ধুলাবালি, গাড়ির কালো ধোঁয়া ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু শব্দ দূষণ দেখতে পাই না, যা নীরবে আমাদের শ্রবণশক্তিকে ধ্বংস করে যাচ্ছে। হয়তো একদিন এটি জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে। ঢাকায় শব্দ দূষণের প্রধান কারণ অতিমাত্রায় যানবাহন বৃদ্ধি, যার বেশিরভাগ পুরনো ইঞ্জিনের। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন কলকারখানা, কলকারখানায় অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ শব্দ ও অপরিকল্পিত অবস্থান। তাতে আমরা প্রত্যেকে কোনো না কোনোভাবে আক্রান্ত হচ্ছি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যানবাহনের চালক, হকার, কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিক।

চিত্র ৪.৪ : শব্দ দূষণজনিত বধিরতার শিকার এক শিশু এবং ডাক্তারি নিরীক্ষণ।

শব্দ দূষণের শারীরিক প্রতিক্রিয়া : আমাদের কানের শব্দ ধারণক্ষমতা সাধারণত ৮৫ ডেসিবেল। এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী শব্দের প্রভাবে আমাদের শ্রবণশক্তির স্বাভাবিক ক্ষমতা আস্তে আস্তে লোপ পায়, একে বলে শব্দ দূষণজনিত বধিরতা । দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশের উচ্চ কর্কশ শব্দের প্রভাবে অনেকের এ রোগ হয়ে থাকে। তাছাড়া কামার, কুমার, ড্রিল মেশিন চালক, ছাপাখানা, উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিন এবং যারা উচ্চঃস্বরে ওয়াকম্যান ব্যবহার করে তাদেরও এ রোগ হয়ে থাকে। কারণ এসব মেশিন কানের স্বাভাবিক শব্দ ধারণ ক্ষমতার চেয়ে তীব্র শব্দ সৃষ্টি করে, যা কানের শ্রবণকেন্দ্র ককলিয়াকে নষ্ট করে দেয়। ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি কমে যায় এবং সাথে সাথে কানে অস্বাভাবিক শব্দও হয়ে থাকে। অনেকেই আবার বংশগত বা এমনিতেও শব্দ দূষণের প্রতি অতি সংবেদনশীল থাকে, এরাও বেশি আক্রান্ত হন। তাছাড়া বয়স্করা তরুণদের চেয়ে শব্দ দূষণে সহজেই আক্রান্ত হয়ে থাকেন। যারা এ ধরনের পরিবেশে থাকে বা পেশায় কাজ করে তাদের মাঝে মাঝে শ্রবণশক্তি পরীক্ষা করানো উচিত। পক্ষান্তরে সমস্যা জটিল হয়ে সম্পূর্ণভাবে বধির হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। এ ছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ কর্কশ শব্দের প্রভাবে মাথাব্যথা, মানসিক চাপ, অনিদ্রা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট, গর্ভপাত ও নবজাতকের বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে।

৪.৭ শব্দ দূষণ রোধের উপায় (Means of anti noise pollution)

শব্দ দূষণ রোধ একটি সাধারণ বিচার বিবেচনার বহিঃপ্রকাশ। নিচে কর্কশ বা খারাপ শব্দ দূষণ রোধের উপায় বর্ণনা করা হলো :

১. কথাবার্তায় নম্রতা বজায় রাখা : একই কথা জোরে বললে কর্কশ লাগে এবং আস্তে বললে শ্রুতিমধুর লাগে। সুতরাং কথাবার্তায় নম্রতা বজায় রাখলে শব্দ দূষণ রোধ হয়।

২. অযথা শব্দ না করে চলা : হাটার সময় জুতার খটখট শব্দ করা, বেশি কথা বলে গোলমাল সৃষ্টি অন্য মানুষের বিরক্তির কারণ হতে পারে। সুতরাং অযথা শব্দ না করে চলা যুক্তিযুক্ত। প্রয়োজনে কানে ইয়ার প্লাগ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. মোটরযানের সাইলেন্সার পাইপ ঠিক রাখা : মোটরযানের সাইলেন্সার পাইপ নষ্ট হলে বা ফেটে গেলে ইঞ্জিন থেকে গ্যাস বেরুনোর সময় বিকট শব্দ হয়। সাইলেন্সার পাইপ ঠিক থাকলে এই শব্দ দূষণ ঘটে না। কলকারখানার ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতির শব্দ যতদূর সম্ভব রোধ করলে কাজের পরিবেশ ভালো থাকে। উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী সব যন্ত্রেই শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য সাইলেন্সারে পাইপ ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।

৪. পুরানো যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা : পুরানো ও উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী যানবাহন রাস্তায় চলতে দেয়া উচিত নয়।

৫. স্কুল ও হাসপাতালের সামনে হর্ন না বাজানো : স্কুল ও হাসপাতাল নীরবতা পালনের স্থান। হর্ন বাজালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা এবং হাসপাতালে রোগীদের বিশ্রাম ও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। তাই স্কুল ও হাসপাতালের পাশ দিয়ে মোটরযান যাবার সময় হর্ন বাজিয়ে শব্দ দূষণ ঘটানো ঠিক নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও হাসপাতালের পার্শ্বে তাই হর্ন না বাজানোর প্রতীক রাখা হয় (চিত্র ৪.৫)। চালককে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার সংকেত বা প্রতীক দেখে ও মেনে চলা আবশ্যক।

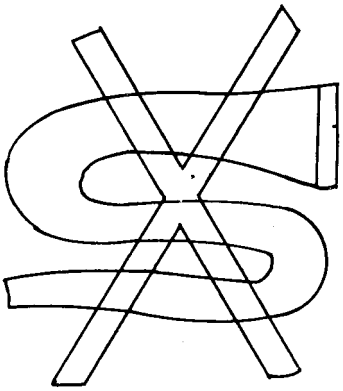

চিত্র ৪.৫ : হর্ন না বাজানোর সংকেত।

৬. লোকালয় থেকে বাসস্ট্যান্ড দূরে রাখা : আবাসিক এলাকা ও অফিস আদালতের পরিবেশ কর্কশ শব্দে যাতে দূষিত না হয় সেজন্য বাসস্ট্যান্ড লোকালয় থেকে দূরে রাখা যুক্তিযুক্ত ; এতে শব্দ দূষণ রোধ হয়।

৭. জোরে শব্দ দিয়ে টি.ভি, রেডিও না চালানো : প্রতিবেশীর সমস্যা হবে না এভাবে টি.ভি. ও রেডিও যতটুকু সম্ভব কম শব্দে চালানো আবশ্যক। এতে পরিবারের সবাইর কানের পর্দা দীর্ঘকাল স্বাভাবিক থাকে এবং শব্দ দূষণও রোধ হয়।

৮. বিশ্রামের সময় মাইকিং না করা : মানুষের বিশ্রামের সময় মাইকিং করা ঠিক নয়। এতে শব্দ দূষণ ঘটে এবং প্রত্যেকের বিরক্তির কারণ হয়।

৯. ককটেল, হাতবোমা প্রভৃতি না ফাটানো : লোকালয়, রাস্তাঘাট প্রভৃতি স্থানে ককটেল অথবা হাতবোমা ফাটালে শব্দ দূষণ ঘটে। তাই, ককটেল ও হাতবোমা ফাটানো থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

১০. বধিরতা রোগের চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন :.রোগের শুরুতে শ্রমিকদের বিশ্রাম ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং যথাযথ চিকিৎসা দেয়া উচিত। অন্যথায়, বধিরতা রোগ থেকে অন্য রোগ আক্রমণ করতে পারে।

প্রধান প্রধান দূষিত শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ (Identify main pollution industries) : পরিবেশবিধি, ১৯৮১ (Environmental act, 1981) অনুযায়ী নিম্নলিখিত কলকারখানাসমূহ পরিবেশ দূষণে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যথা :

১. এসবেস্টস (Asbestos) ও এই জাতীয় উপাদান প্রস্তুতকারক শিল্প কারখানা ;

২. সিমেন্ট ও সিমেন্টজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক শিল্প কারখানা ;

৩. সিরামিকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক শিল্প কারখানা ;

৪. রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ;

৫. কয়লা ও লিগনাইটজাত রাসায়নিক শিল্প–কারখানা ;
৬. ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কারখানা ;
৭. ফেরাস মেটালার্জিক্যাল শিল্প কারখানা ;
৮. নন–ফেরাস মেটালার্জিক্যাল শিল্প কারখানা ;
৯. সার কারখানা ;
১০. ঢালাই কারখানা ;
১১. খাদ্য ও কৃষিজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক কারখানা ;
১২. পাট ও পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক কারখানা ;
১৩. চিনি কল ;
১৪. খনিজ সম্পদজাত কারখানা ;
১৫. ইট প্রস্তুতকারক কারখানা ;
১৬. চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক কারখানা ;
১৭. ওর বা মিনারেল প্রক্রিয়াজাত কারখানা ;
১৮. বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও বয়লার ;
১৯. কাগজ ও পাল্প প্রস্তুতকারক কারখানা ;
২০. টেক্সটাইল প্রক্রিয়াজাতকরণ ;
২১. পেট্রোলিয়াম শোধনাগার ;
২২. পেট্রোলিয়াম দ্রব্য ও পেট্রো কেমিক্যাল শিল্প কারখানা ;
২৩. বর্জ্য পদার্থ হতে প্রয়োজনীয় পুনরুদ্ধার প্রকল্প ;
২৪. ভস্মিভূতকরণ প্রভৃতি।

বিভিন্ন কারখানায় বায়ুদূষণ

সার কারখানা ও অ্যালুমিনিয়াম তৈরির কারখানা	HF, NH_3, ফ্লোরাইড, ধূলিকণা
রাসায়নিক কারখানা [অ্যাসিড প্ল্যান্ট কৃত্রিম আঁশ (Synthetic fibre)]	এসিডের ফেনা
ট্যানারি ও চামড়া শিল্প, সিমেন্ট কারখানা	মারকোপটান ও সালফাইড সিমেন্ট ও লাইন কণা পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন, H_2S নাইট্রোবেনজিন ও অ্যানিলিন, পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন ও আলকাতরার অ্যারোসল।
কাগজ কল	H_2S মারকেনটান
শোধন ও পেট্রো কেমিক্যাল কারখানা	H_2S, HC, গন্ধযুক্ত মারকেনটান

মেটালার্জিক্যাল কারখানা	ধাতুমল, ধূলিকণা
ক্লোরিনের ইলেকট্রোলাইটিক কারখানা	ক্লোরিন
কয়লা দহন (পাওয়ার প্ল্যান্ট)	ঝুলকালি
মোটরগাড়ির ধোঁয়া : ১. পেট্রোল ২. ডিজেল	হাইড্রোজেন, HCHO

১. পাট শিল্পের দূষণ (Pollution in Jute industry) : বাংলাদেশে পাট শিল্প রয়েছে : (১) দৌলতপুর জুট মিলস, খুলনা, (২) ক্রিসেন্ট জুট মিলস, খুলনা (৩) পূর্বাচল জুট মিলস লি:, যশোহর।

পাটকলে নিম্নবর্ণিতভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটে :

ক. পাটের উড়ন্ত আঁশ, শ্রমিক, কর্মচারি, কর্মকর্তাদের এমন কি পার্শ্ববর্তী লোকজনের অস্বস্তির কারণ হয়। সেজন্য পাটকলে থাকতে হলে নাকে, মুখে কাপড়ের ঢাকনা লাগাতে হয়। অন্যথায়, উড়ন্ত আঁশ মানুষ ও জীবজন্তুর শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টের কারণ হয়।

খ. পাটকলের বয়লারে যে জ্বালানি ব্যবহার করা হয়, সেই জ্বালানি কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ছেড়ে পরিবেশ দূষিত করে।

গ. পাটকলে বিভিন্ন প্রকার রং, রাসায়নিক পদার্থ, ক্ষারকীয় পদার্থ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। এগুলো যে পথে বা পাইপের মধ্য দিয়ে নির্গত হয়, সেখানকার পানি দূষিত হয় এবং এর দ্বারা বায়ুমণ্ডলও কলুষিত হয়।

ঘ. পাটকলে শত শত যন্ত্র এক সাথে চালিত হলে শব্দ দূষণ ঘটে। এতে আশেপাশের লোকালয়ের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।

২. টেক্সটাইল মিলে দূষণ (Pollution in Textile mills) : বাংলাদেশে টেক্সটাইল মিল রয়েছে : (১) ক্রিসেন্ট টেক্সটাইল লিঃ, পাবনা, (২) কাসেম টেক্সটাইল মিলস, টঙ্গী, (৩) চিত্তরঞ্জন কটন মিলস, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি।

টেক্সটাইল মিলে নিম্নবর্ণিতভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটে :

ক. সুতার উড়ন্ত আঁশ, তুলার আঁশ কর্মরত কর্মচারিদের শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটায়। নাকে, মুখে কাপড় না বেঁধে যে কাপড়ের কলে কাজ করে, শীঘ্রই তার ফুসফুসে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

খ. সুতা ও কাপড়ের কলেও বয়লার থাকে এবং বয়লারে যে জ্বালানি দহন ঘটে তার ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণ ঘটে।

গ. কাপড়ের কলে বিভিন্ন প্রকার রং, রাসায়নিক পদার্থ, ক্ষারকীয় পদার্থ বা ব্লিচিং পাউডার যেমন : BHC, DDT প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। এগুলো দ্বারা জলাশয়ের পানি এবং বাতাস দূষিত হয়।

ঘ. টেক্সটাইল মিলে অনেকগুলো যন্ত্র একসাথে চালিত হয়, এজন্য শব্দ দূষণ ঘটে এবং পার্শ্ববর্তী আবাসিক পরিবেশের দূষণ ঘটে।

ঙ. বিভিন্ন পদার্থের নিষ্কাশন লাইন যেমন গ্যাস লাইন, ক্ষারকীয় পদার্থের লাইন, বাষ্প লাইন প্রভৃতিতে লিকেজ ঘটলে পানি এবং বাতাসের দূষণ ঘটে।

প্রতিরোধ : পাট ও টেক্সটাইল মিলের দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যেমন :

১. প্রবাহিত ময়লাযুক্ত পানি পরিশোধন করে ছাড়তে হয়।

২. রঙযুক্ত পানি পুনঃপ্রস্তুতকরণ সাইকেলের মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয়। এতে রঙ এর অপচয় রোধ এবং দূষণমুক্ত হয়।

৩. **বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে দূষণ** (Pollution in power stations) : বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বলতে ডিজেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাষ্প টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গ্যাস টারবাইন কেন্দ্র, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতিকেই বুঝায়। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পানি ও বাতাস দূষণের কারণ নিম্নরূপ :

অ. ডিজেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দূষণ : বাংলাদেশে ডিজেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে :

(১) সৈয়দপুর ডিজেল লিকেজ, (২) বরিশাল ডি.বি. কেন্দ্র, (৩) ভোলা ডিজেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৪) বগুড়া ডিজেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৫) ঠাকুরগাঁও ডিজেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৬) রাজশাহী ডিজেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি।

ক. ডিজেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বড় বড় ডিজেল ইঞ্জিনে প্রতি ঘণ্টায় শত শত লিটার জ্বালানি দহন ঘটে। এতে প্রচুর ধোঁয়া উৎপন্ন হয় এবং বাতাস দূষিত হয়।

খ. ডিজেল ইঞ্জিন গড়িয়ে পড়া তেল, মবিল একত্রে মিশে পাইপ লাইনে নির্গত হয়। সেই নির্গমনে জলাশয়ের পানি দূষিত হয়।

গ. বড় ডিজেল ইঞ্জিন বা ইঞ্জিনসমূহ চলার সময় বিকট শব্দ হয় এবং এর দ্বারা শব্দ দূষণ ঘটে।

আ. **বাষ্প টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দূষণ :** বাংলাদেশে বাষ্প বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে : (১) আশুগঞ্জ বাষ্প বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (২) সিদ্ধিরগঞ্জ বাষ্প টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৩) চট্টগ্রাম শিকলবাহা বাষ্প বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৪) খুলনা বাষ্প টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি।

ক. বাষ্প টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একাধিক বয়লার ব্যবহৃত হয়। এ বয়লারের পানিকে তাপ প্রয়োগে বাষ্প উৎপন্ন করতে প্রচুর কয়লা, ক্রুড অয়েল প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদির দহন ঘটে। এ দূষণের ফলে বয়লার চুল্লির চিমনি থেকে যে পোড়া গ্যাস বের হয় তা দ্বারা বায়ু দূষিত হয়।

খ. বয়লারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, টারবাইনের যন্ত্রাংশ প্রভৃতি থেকে গড়িয়ে পড়া তেল বা মবিল, গ্রিজ প্রভৃতি পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে।

গ. জ্বালানি দহন, যন্ত্রাংশ চলা, টার্বো জেনারেটর এবং টারবাইন চলার যে শব্দ হয় তা দ্বারা শব্দ দূষণ হয়।

ঘ. বাষ্প এবং গ্যাস লিকেজ দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়।

ই. গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দূষণ : বাংলাদেশে গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে : (১) হরিপুর গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (২) শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৩) সিলেট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৪) চট্টগ্রামে বার্জে রক্ষিত গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৫) খুলনা গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৬) ভেড়ামারা গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৭) সৈয়দপুর গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৮) বরিশাল গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৯) রংপুর গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (১০) বগুড়া গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (১১) বাঘাবাড়ি গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি।

ক. গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কমবাস্টরে জ্বালানি হিসেবে হাইস্পিড ডিজেল অথবা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ওপেন সাইকেল বিশিষ্ট গ্যাস টারবাইন প্ল্যান্টে টারবাইন থেকে বিতাড়িত গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়া হয়। এই গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাই–অক্সাইড (CO_2) এবং কার্বন মনোক্সাইড (CO) এবং কার্বন (C) থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই এ গ্যাস দ্বারা বাতাস দূষিত হয়। ৪.৬ চিত্রে গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত গ্যাসের নির্গমনে বায়ু দূষণ প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

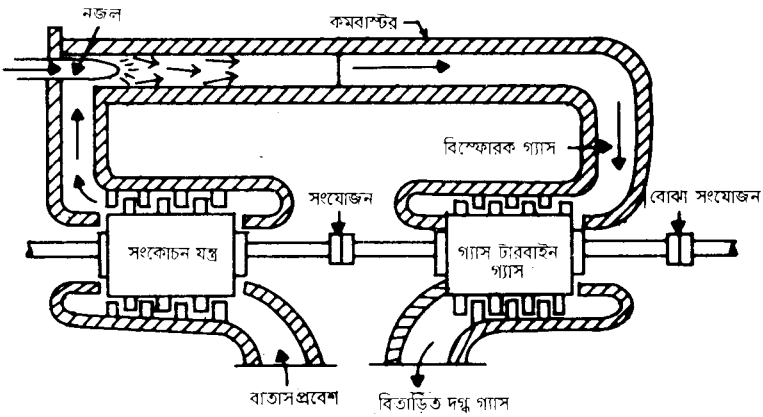

চিত্র ৪.৬ : গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত গ্যাসে বায়ু দূষণ হয়।

খ. টারবাইন, টার্বোজেনারেটর প্রভৃতির বিয়ারিং ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ থেকে নির্গত অয়েল ও গ্রিজ পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে।

গ. গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রসমূহ চলার শব্দে শব্দ দূষণ ঘটে।

ঈ. পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দূষণ : বাংলাদেশের সাভারে ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি গবেষণামূলক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে।

ক. পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রিয়্যাক্টরের মধ্যে পারমাণবিক জ্বালানি (ইউরেনিয়াম–২৩৫) বিক্রিয়া ঘটিয়ে তাপ উৎপন্ন করা হয়। এই বিক্রিয়া থেকে ক্ষতিকর রশ্মি বের হয়, যা জীবজন্তুর জন্য ক্ষতিকর।

খ. পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য পদার্থ বাতাস ও পানি উভয়কেই দূষিত করে।

গ. বাষ্প টারবাইন ও টার্বোজেনারেটর থেকে নির্গত তেল বা মবিল পানির সাথে মিশে পানি দূষিত করে।

ঘ. বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি চলার শব্দ থেকে দূষণ ঘটে।

ঙ. পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দূষণ : বাংলাদেশের কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী নদীতে একটি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে।

(ক) পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ভারি টারবাইন ও জেনারেটর ব্যবহৃত হয়। এসব যন্ত্র থেকে নির্গত তেল, গ্রিজ প্রভৃতি দ্বারা পানি দূষিত হয়।

(খ) মাটির নিচে প্ল্যান্টটির টারবাইন ও জেনারেটর কক্ষ স্থাপিত। সে কারণে এই প্ল্যান্টে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের স্বাচ্ছন্দ্যকর পরিবেশ থাকলেও সেখানে কিছু বায়ু দূষণ ঘটে।

(গ) ভারি যন্ত্রাদি চলার কারণে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য শব্দ দূষণ ঘটে।

প্রতিরোধ : বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দূষণ রোধ করার জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গৃহীত হয়। যেমন :

(১) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তেল জলাধারের পানিতে ফেলা ঠিক নয়।

(২) চিমনির উচ্চতা পার্শ্ববর্তী দালানকোঠার চেয়ে বেশি হওয়া আবশ্যক।

(৩) শব্দ কমানোর জন্য সাইলেন্সার পাইপ ত্রুটিমুক্ত রাখতে হয়।

সর্বোপরি, পরিবেশ দূষণবিহীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যবহার করতে হবে। পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাতচক্র চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র এ ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদাহরণ। নিচে সৌরশক্তি চালিত একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্ণনা দেয়া হলো।

পরিবেশ দূষণবিহীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রবিশিষ্ট সৌরশক্তির ঝলমলে জাহাজ : ১৯-০৫-২০০২-তে প্রকাশিত প্রথম আলোর এক সংবাদ বিবরণীতে জানানো হয়েছে যে, সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ডারনিং হারবারে অনুষ্ঠিত সিডনি ইন্টারন্যাশনাল বোট শোতে বিলাসবহুল ইয়াট এবং ঐশ্বর্যশালী ক্রুজশিপের বহরে একটি জাহাজ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে। সেটি ছিল ১১০ জন যাত্রী বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার সেইলর। এটিই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত বিশ্বের প্রথম সমন্বিত (হাইব্রিড) বিদ্যুৎ, সৌর-বায়ু শক্তিচালিত জাহাজ। এরকম এক অনন্য উদ্যোগের সূচনাটি বেশ মজার। অস্ট্রেলিয়া নিবাসী ডা. রবার্ট ডেন পেশায় চিকিৎসক (জেনারেল প্র্যাকটিশনার) হলেও তাঁর নেশা নিজের বোট নিয়ে সমুদ্রে ঘোরা। ১৯৯৬ সালে ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত অ্যাডভান্সড টেকনোলজি বোট রেসে অংশ নিলেন এই চিকিৎসক। আর এটিই বদলে দিল তার জীবনধারা। নিউ সাউথ ওয়েলসে তার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা সেবার (মেডিকেল প্র্যাকটিস) সব উপকরণ তিনি বিক্রি করে দিলেন। বিশেষ ধরনের এক বোট নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। উদ্দেশ্য, পরের বছরের প্রতিযোগিতায় তার বোটই অর্জন করবে প্রথম স্থানটি।

তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন তেমনটিই ঘটল। অর্থাৎ ডেনের বোটই প্রথম হলো, বারো মাস ধরে নির্মাণ করা **মারজোরি কে** নামের ওই জাহাজটি সেই সাফল্য অর্জন

করেছিল সৌর এবং বায়ুশক্তিতে। প্রথম প্রতিভাত হলো সৌরশক্তি চালিত জাহাজের বাণিজ্যিক বাস্তবতার। অতঃপর স্বভাবতই বেড়ে গেল ডেনের ব্যস্ততা। তিনি এবং তার স্বেচ্ছাসেবী সহচরগণ মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন সোলার সেইলর হোল্ডিং। বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক সৌর-বায়ু-এলপিজি শক্তিচালিত জাহাজ নির্মাণে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এই অভূতপূর্ব প্রচেষ্টার কথা। অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল সরকারের এক মিলিয়ন ডলারের অনুদানের পাশাপাশি আরো পাওয়া গেল এল নিউ সাউথ ওয়েলস সরকারের ৪৫ হাজার ডলারের অনুদান। জলযান তৈরির প্রযুক্তিতে ছিল আটটি সৌর-প্যানেলের পাল। অর্থাৎ একই সাথে এগুলো সৌরশক্তি গ্রহণ করে এবং বাতাসের বিপরীতে পালের কাজ করে। কম্পিউটারে নিয়ন্ত্রিত এসব পালকে দ্রুত সূর্য ও বাতাসের দিক অনুযায়ী উপযোগী দিকে স্থাপন করা যায়। সৌরশক্তির ক্ষেত্রে বিখ্যাত সংস্থা বিপি সোলারেক্স কর্তৃক নির্মিত হাইএফিশিয়েন্সি ফটোভোল্টাইক সেলগুলোকে সোলার সেইলর দলের উদ্ভাবিত পন্থায় প্লাস্টিক ও ফাইবার গ্লাসের সাতটি স্তরের ভেতর স্থাপন করা হয়।

চিত্র ৪.৭ : সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রবিশিষ্ট জলজাহাজ।

জাহাজের ডানে চারটি ও বাঁয়ে চারটি — প্রতিটি আট বর্গমিটারের মোট আটটি পালকে ঘুরিয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখলে চলার সময়ে বাতাস থেকে সর্বোচ্চ লিফট পাওয়া যায়। আর সবগুলোকে নামিয়ে আনুভূমিক অবস্থায় রাখলে সর্বোচ্চ পরিমাণ সৌরশক্তি পাওয়া যায়। পালগুলো এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরি কাঠামো শতকরা ১০০ ভাগ সেফটি—মার্জিনসহ সর্বোচ্চ ৪০ নট (ঘণ্টায় ৪০ নটিক্যাল মাইল) গতির বাতাসে কার্যকর করে নির্মিত হয়। অবশ্য বাতাসের গতিবেগ ৩০ নটের ওপরে গেলেই পালগুলোকে নামিয়ে ফেলা উচিত। এক্ষেত্রে নিরাপত্তার কারণে কম্পিউটারকে এমনভাবে প্রোগ্রামড করা যায়, যেন বাতাসের নির্ধারিত গতিবেগ অতিক্রমের সাথে সাথে পালগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেমে যায়।

তবে যদি সৌর ও বায়ুশক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে আবহাওয়া অনুপযোগী থাকে এবং দুই পাশের প্রতিটি দশমিক ৪০ জেনেসিস ৭০ অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার সিলড অ্যাবজর্বড গ্লাস ম্যাট

ব্যাটারির ক্ষমতা হ্রাস পায় ৫০ শতাংশেরও নিচে তাহলে কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু করবে ৮০ কিলোওয়াট ক্ষমতার এলপিজি-শক্তিচালিত জেনারেটর। জেনারেটর থেকে প্রাপ্ত শক্তিতে চলবে জাহাজের দুটি ৪০ কিলোওয়াটের আর্থ-ম্যাগনেট ইলেকট্রিক মোটর। এই দুই মোটর মিলে চালনা করবে জাহাজের নিয়ন্ত্রণাধীন পিচ প্রপেলারকে। নিয়ন্ত্রণাধীন পিচ মানে হলো যেখানে প্রপেলারে ব্লেডের পিচ বা কৌণিক দূরত্ব বিশেষ কারিগরি কৌশলে কমিয়ে বাড়িয়ে একই ঘূর্ণায়মান গতিতে পানিতে পিছনের দিকে বিভিন্ন পরিমাণের ধাক্কা পাওয়া যায়। ৪.৭ চিত্রে এই ধরনের সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিশিষ্ট জলজাহাজ দেখানো হয়েছে।

সিডনির ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি প্যাটেন্ট নকশার মোটরটির ইস্পাতের স্ট্যাটরে কোনো অয়্যারিং নেই। রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে একটি র‍্যাক-বক্সের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই বক্সটি নিয়ন্ত্রিত হয় হুইল হাউস বা ব্রিজে অবস্থিত টাচক্রিন পর্দার বিভিন্ন আইকনে স্পর্শের মাধ্যমে। এয়ার-কোল্ড মোটর দুটি নিজ নিজ শ্যাফটকে মিনিটে ৭৫০ বার ঘোরায়।

শুধু পালের সাহায্যে ডিএনভি-ক্লাসড ডেট নরস্কে ভেরিতাস বা দি নরওয়েজিয়ান ভেরিফায়ার সোলার সেইলর ১৫ নট বাতাসে সর্বোচ্চ ৭ নটে চলতে সক্ষম। আর ২৫ নটের বাতাসে এর গতি উঠে ১৫ নটে। পূর্ণ সূর্যের আলোর সৌরশক্তিতে গতি ওঠে সর্বোচ্চ ৭ নট। তবে মেঘলা হলে গতি নেমে যায় তিন/চার নটে। ব্যাটারি শক্তিতে জাহাজের গতি হয় ১০/১২ নট। তবে, সৌর ও বায়ুশক্তির সমন্বয়ে সর্বোচ্চ ১৫ নটে চলে সোলার সেইলর।

২১ দশমিক ৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১০ দশমিক ৩ মিটার প্রস্থ পুরস্কার বিজয়ী ঝলমলে এই জাহাজটির রয়েছে আরো আশ্চর্যজনক দিক। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে অলিম্পিক টর্চ-টিকে নিয়ে সিডনি হারবার অতিক্রম করে এই যুগান্তকারী সোলার সেইলর। এর পরিবেশগত দিকটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোলার সেইলর থেকে কোনো গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গত হয় না, পানি দূষণ বা বায়ু দূষণও ঘটে না। আর পরোক্ষভাবে এটি খনিজ জ্বালানি বা ফসিল ফুয়েল সাশ্রয় করে।

সমগ্র ব্যাপারটিই এরকম যে, ১১০ জন যাত্রী ক্রুজশিপের উত্তেজনাকর এবং আনন্দঘন জাগরণে মেতে ওঠে, যেখানে নেই কোনো অযাচিত শব্দ, ধোঁয়া বা কম্পন। ডা. ডেন বিশ্বাস করেন, তাঁর এই জাহাজটি অভাবনীয় আকর্ষণ অর্জন করতে পেরেছে, বিশেষ করে যারা শব্দবিহীন, ব্যয়সাশ্রয়ী এবং খনিজ জ্বালানি জ্বালায় না এমন জলযান পছন্দ করে থাকেন তাদের মাঝে। নিঃসন্দেহে এসব মানুষের মাঝে সোলার সেইলর জাগিয়েছে আগামী দিনের বিজ্ঞান উৎকর্ষের প্রতি উৎসাহ। ডা. ডেনের ভাষায়, আমাদের পরিচিত পরিবহন শিল্পে যানবাহন বিপ্লবের সবচেয়ে সামনের সারিতে অবস্থান করছে আমাদের সৌরপালের প্রযুক্তি। নৌ পরিবহনের যে কোনো পর্যায়ে এটি প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে—নদীর ছোট্ট নৌকা বা উপকূলের বিলাসবহুল ইয়াট থেকে বিশালাকার গভীর সমুদ্রগামী জাহাজে। আপাত পরিমাপে সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সমুদ্রগামী জাহাজের জ্বালানি ব্যয়ের প্রায় ২০ শতাংশ সাশ্রয় হতে পারে এই সৌর প্যানেল প্রযুক্তির মাধ্যমে।

বন্দরের প্রবেশপথে সৌরশক্তি : আজকের দিনে পরিবেশ সচেতনতা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি বেড়ে চলেছে বিকল্প এবং পরিবেশ-অনুকূল জ্বালানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা। সৌরশক্তি আজ বিবেচিত হচ্ছে আগামী দিনের জন্য নিরাপদ ও সহনীয় পরিবেশ-অনুকূল শক্তির উৎস হিসেবে। এই প্রযুক্তি যেভাবে বিস্তৃত হয়ে চলেছে তাতে করে এমনটি ভাবাই যায় যে, একদিন সারা বিশ্বের শক্তি সরবরাহের শীর্ষে অবস্থান করবে সৌরলোক।

এসএমএম ২০০০ (সোলার মেরিটাইম মিট) উৎসবে সোলার এজি নামের সংস্থাটি প্রকৃতি থেকে এ অবারিত শক্তির আঁধারকে সামনে এনেছে। সংস্থাটির মুখপাত্র টমাস রুডলফ বলেন, মেরিটাইম ক্ষেত্রে সৌরশক্তি প্রয়োগের অবকাশ অসীম। এই সংস্থাটি ইতিমধ্যে জাহাজের লাইফবোট এবং বন্দরের প্রবেশ পথে নদীর মাঝে জাহাজকে চ্যানেল দেখানোর জন্য স্থাপিত ভাসমান বয়াতে প্রয়োগ করেছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরকোষ বা সোলার সেল নির্মিত হয়েছে মহাকাশযান এবং নাসার স্যাটেলাইটের প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে। এসবের সম্ভাব্য স্থায়িত্বকাল প্রায় ২০ বছর। আর এতে ব্যবহৃত ধাতুগুলো ক্ষয়রোধী।

৪.৮ মোটরযান শিল্পে দূষণ (Pollution in Automobile industry)

বাংলাদেশে মোটরযান শিল্প রয়েছে : (১) প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম, (২) নাভানা মোটরস, ঢাকা, (৩) নিটল মোটরস, ঢাকা (৪) রমনা মোটরস, ঢাকা (৫) নাজমা মোটরস, চট্টগ্রাম (৬) মায়া মোটরস, বগুড়া এবং দেশের সব জেলা শহরে একাধিক মোটরযান মেরামত গ্যারেজ রয়েছে। তদুপরি, দেশে অসংখ্য সার্ভিস স্টেশন, ফিলিং স্টেশন আছে।

মোটরযান প্রস্তুত, সংযোজন, মেরামত প্রভৃতি শিল্পে নিম্নবর্ণিতভাবে পানি ও বাতাসের দূষণ ঘটে, যেমন :

ক. মোটরযান শিল্প কারখানায় শত শত নতুন ও পুরাতন ইঞ্জিন সর্বক্ষণ চলে। এতে শত শত লিটার জ্বালানি দহনের গ্যাসে পরিবেশ দূষিত হয় ফলে বাতাস দূষণের মাত্রাই সবচেয়ে বেশি হয়।

খ. মোটরযানের ইঞ্জিন থেকে তেল বা মবিল, গ্রিজ, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি নির্গত হলে তা পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে।

গ. শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো বিভাগে সারাক্ষণ কাজ হয় বলে বিভিন্ন ধরনের শব্দের মিশ্রণে শব্দ দূষণ ঘটে।

মোটরগাড়ির জ্বালানি দহনের ফলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন (HC) নির্গত হয় তা বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে স্মগ এ পরিণত হয়। নিচে চিত্রের সাহায্যে ফটোকেমিক্যাল বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

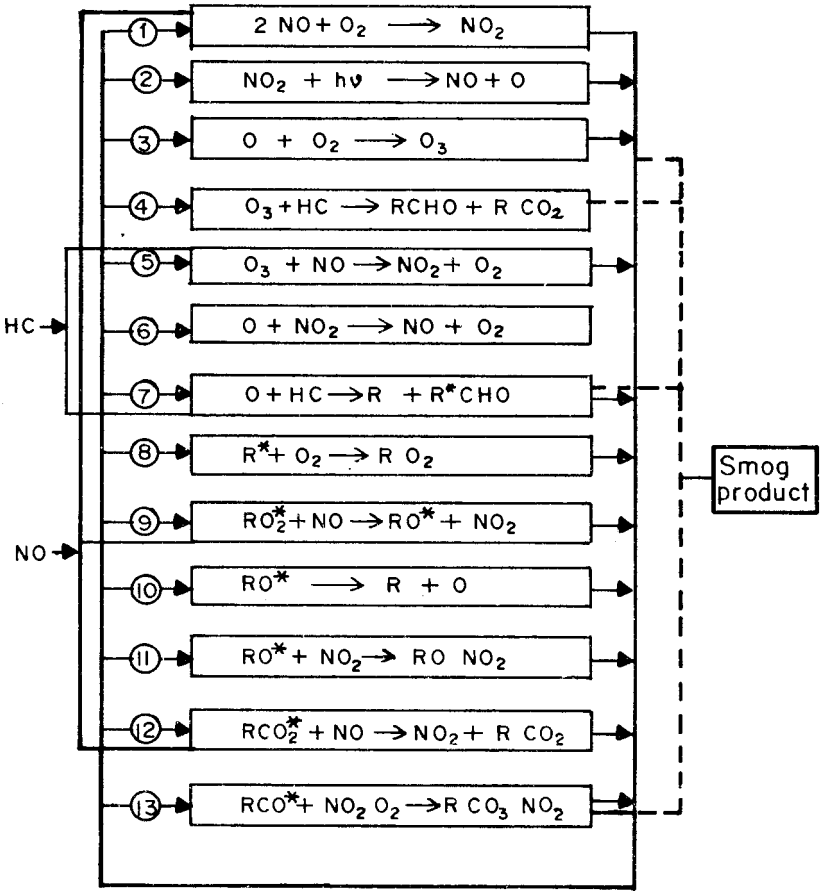

চিত্র ৪.৮ : মোটরযান শিল্পে জ্বালানি দহনে ফটোকেমিক্যাল স্মগ স্মগে পরিণত হওয়ার বিক্রিয়া প্রদর্শন।

NO	নাইট্রিক অক্সাইড	RCNO	অ্যালডিহাইড
NO_2	নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড	HC	হাইড্রোকার্বন
h	সূর্যরশ্মির শক্তি	O_2	অক্সিজেন
O_3	ওজোন	O	অ্যাটমিক অক্সিজেন
RO	ওক্সভালকিল রেডিকেল	R*	অ্যালকাইল রেডিকেল
RCO	অ্যাসিল রেডিলে	RO_2	পার অক্সাভালকিল
$RCO_3\ NO_2$	কম্পাউন্ড এক্স-এমিল	$RONO_2$	অ্যালকাইল ও নাইট্রেট

ফটোকেমিক্যাল স্মোগ ⟶ স্মোগ

প্রতিরোধ : মোটরযান শিল্পে দূষণ রোধ করতে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন :

(১) ইঞ্জিনের কার্যকাল শেষ হয়ে গেলে এটিকে পরিত্যক্ত বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। এটিকে পুনঃমেরামত করে ব্যবহার করা উচিত নয়।

(২) ইঞ্জিনে কখনোই পোড়া লুবঅয়েল বা মেয়াদোত্তীর্ণ লুব অয়েল ব্যবহার না করে তা নির্দিষ্ট সময়ে পরিবর্তন করা যুক্তিযুক্ত।

(৩) দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা উচিত।

(৪) সব মোটরযান এবং অন্যান্য ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন ঘটিয়ে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে ক্যাটালিটিক কনভার্টার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ক্যাটালিটিক কনভার্টার (Catalytic Converter) : ক্যাটালিটিক দহন সাধারণত CO ও হাইড্রোকার্বনকে অক্সাইড-এ পরিণত করে। ভেনেডিয়াম পেন্টাঅক্সাইড (V_2O_5) ক্যাটালিস্টরূপে ব্যবহৃত হয়। যদিও আজকাল এই কনভার্টারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে তবুও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও বিদ্যমান :

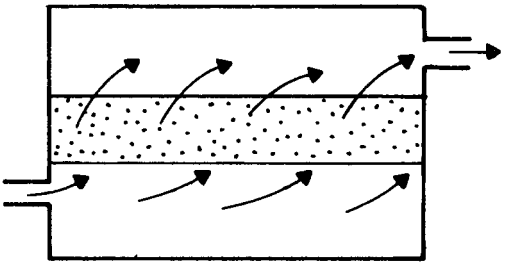

চিত্র ৪.৯ : ক্যাটালিটিক কনভার্টারের মাধ্যমে মোটরযানের দূষণবিহীন গ্যাস নির্গমন।

১। এটি প্রতি ১ বছর অন্তর পরিবর্তন করা উচিত।

২। এটি লেড উৎপাদন-এর ডায়সন রূপে কাজ করে।

৩। এটির কার্যকারিতা সময়ের সাথে হ্রাস পায়।

৪। এটি ব্যবহারে চাপের হ্রাস বা প্রেসার ড্রপ বেশি এবং অধিক শব্দ হয়।

৪.৯ ইট প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানে দূষণ (Pollution in Brick manufacturing industry)

সাভারে ফায়ার ব্রিক্স শিল্পসহ দেশের প্রায় সব এলাকাতে ইটখোলা এবং কিছু ফায়ার ব্রিক্স শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সাধারণত ইটখোলা এবং ফায়ার ব্রিক্স প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানে নিম্নবর্ণিতভাবে পানি ও বায়ু দূষিত হয় :

ক. ইট প্রস্তুতের কারখানায় সাধারণত জ্বালানি হিসেবে কাঠ ও কয়লা ব্যবহৃত হয়। ফলে ভাটায় চিমনি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় সমগ্র পরিবেশ দূষিত হয়। কারণ, ভেজা অথবা আধা শুকনা কাঠ ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ইটভাটার চুল্লিতে ব্যবহৃত হয়। সেজন্য, এ জ্বালানি দহনের ফলে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস (CO) বায়ুমণ্ডলে মিশতে থাকে। এ ক্ষতিকারক গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশে বাতাস দূষিত করে।

খ. ইটভাটার চুল্লি দিনরাত এবং মাসের পর মাস জ্বলে। এতে চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়া সেখানকার আবহাওয়াকে শুষ্ক করে তোলে। এ আবহাওয়ায় আশপাশে বৃক্ষ শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং ইটভাটা এলাকায় এসিড বৃষ্টি (Acid rain) ঘটে, যা ফসল ও গাছপালার ক্ষতিসাধন করে।

গ. ইটভাটাতে দিনরাতে সবসময় ট্রাক আসা-যাওয়া করে বলে এতেও সেখানকার আবহাওয়া ট্রাকের ধোঁয়ায় এবং ধুলাবালিতে দূষিত হয়।

প্রতিরোধ : ইট প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানের দূষণ রোধ করতে হলে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গৃহীত হয় :

(১) ইটভাটার চুল্লিতে কাঠের পরিবর্তে কয়লার গুঁড়া ব্যবহার করা।

(২) ভাটাগুলো শহর থেকে দূরে গাছপালার ভিতরে স্থাপন করা হয়।

৪.১০ রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে দূষণ (Pollution in chemical industry)

রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান বলতে পেপার ও পাল্প মিল, সার কারখানা, পেট্রো-রাসায়নিক কারখানা, চামড়া শিল্প প্রভৃতিতে বুঝায়। বাংলাদেশে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে : (১) ঢাকাস্থ হাজারিবাগ ট্যানারিসমূহ, (২) ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি:, (৩) চিটাগাং সিমেন্ট ক্লিংকার এন্ড গ্রাইন্ডিং কোং লি:, (৪) এসবেসটস সিমেন্ট ইন্ডা: লি: চট্টগ্রাম, (৫) চট্টগ্রাম পেপার মিল, (৬) কর্ণফুলী পেপার মিল, (৭) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল লি:, (৮) ইস্ট বেঙ্গল পেপার মিল, টঙ্গী, (৯) উত্তরবঙ্গ পেপার মিল, পাকশি, পাবনা, (১০) ফেঞ্চুগঞ্জ কারখানাসহ অন্যান্য সার কারখানা প্রভৃতি। এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বায়ু এবং পানি দূষিত হওয়ার কারণ নিচে বর্ণনা করা হলো।

(১) পেপার ও পাল্প মিলে দূষণ (Pollution in Paper and pulpmills) :

ক. পেপার ও পাল্প তৈরি যন্ত্রে বাঁশ, কাঠ, কাঁচাপাট, আঁখের ছোবড়া প্রভৃতি কাঁচামাল (raw materials) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলো সেখানে চুর্ণ করা হয় যেখানে উড়ন্ত আঁশ দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়। ফলে কর্মচারিদের নাকে মুখে কাপড় বেঁধে চলতে হয়। অন্যথায় তারা ফুসফুসের ব্যাধিতে ভুগতে পারে।

খ. কাঁচামালের মণ্ড প্রস্তুতের সময় এতে নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশানো হয়, যা পরিবেশকে দূষিত করে। সিলেট পাল্প মিল থেকে প্রবাহিত পদার্থ দ্বারা কুশিয়ারা নদীর পানি এবং সাগরের পানি দূষিত হচ্ছে।

গ. বর্জ্য রাসায়নিক পদার্থ তরল পদার্থ আকারে যে জলাশয়ে ফেলা হয়, সেখানকার পানি দূষিত হয়।

ঘ. কাগজ কলের বয়লারের চুল্লিতে কয়লা, ক্রুড অয়েল অথবা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। জ্বালানি দহনের ধোঁয়া বাতাসকে দূষিত করে।

ঙ. কাগজ কলের কাঁচামালকে বিস্তীর্ণ এলাকায় স্তূপীকৃত অবস্থায় রাখা হয়। বাতাসে উড়ে সেগুলো কর্মরত কর্মচারিদের চোখে মুখে পড়ে। ফলে, এতেও সে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ দূষিত হয়। কাঁচামাল পানিতে পচে দুর্গন্ধ বেরোয়, এতেও পরিবেশ দূষিত হয়।

২. সার কাখানায় দূষণ (Pollution in Fertilizer Factory) : সার কারখানা একটি রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে সার কারখানা রয়েছে, (১) ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, (২) পলাশ সার কারখানা, খুলনা (৩) ঘোড়াশাল সার কারখানা (৪) টি. এস. পি কমপ্লেক্স বা জিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম (৫) বাংলাদেশ মিল্‌স এন্ড ফার্টিলাইজার, ঢাকা।

শিল্প দূষণ নিম্নরূপ :

ক. সার কারখানার চুল্লিতে তাপ প্রয়োগের জন্য তরল অথবা বায়বীয় জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি দহনে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং কার্বন মনোক্সাইড (CO) পরিবেশকে দূষিত করে।

খ. সার তৈরির বর্জ্য রাসায়নিক পদার্থ পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে।

গ. সার কারখানায় বিভিন্ন প্রকার গ্যাস ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রবাহের লাইনে লিকেজ হলে বাতাস দূষিত হয়।

ঘ. কারখানাতে যেসব এসিড ও ক্ষারকীয় পদার্থ ব্যবহৃত হয় তা দ্বারাও পরিবেশ দূষিত হয় এবং এগুলো নদী বা জলাশয়ে পতিত হলে সেখানকার মাছ মরে যায়।

ঙ. সার কারখানাতে প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন হয়। এ পানি দূর অঞ্চল হতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে অথবা ডিপ টিউব অয়েল এর সাহায্যে মাটির নিচ হতে উত্তোলন করা হয়। ফলে পানির লেভেল নিচে চলে যাওয়ায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পানি সঙ্কট দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ কর্ণফুলী সার কারখানার কথা ধরা যাক। এখানে প্রতি ঘণ্টায় ৬০০ মেট্রিক টন পানি ৬টি ডিপ টিউবঅয়েল এর সাহায্যে মাটির নিচ হতে উত্তোলন করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ পার্শ্ববর্তী এলাকায় লোকজন বর্তমানে প্রচণ্ড পানি সঙ্কটের সম্মুখীন।

প্রতিরোধ : সার কারখানা এবং পেপার ও পাল্প মিলের দূষণ ও প্রতিরোধ একই রকম। যেমন :

(১) সালফেট লিকায়র (sulphate liquor) পুনঃসাইকেল-এর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়।

(২) রাসায়নিক পুনঃসংরক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

(৩) টেকনোলজি অপশন প্রয়োগ করা হয়।

(৩) পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পে দূষণ (Pollution in petro chemical industry) : পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থকে যে কারখানাতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে তেল শোধনাগার, বিভিন্ন রকম সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা, ফিলিং স্টেশন, সাবান তৈরির কারখানা ইত্যাদিকে বুঝায়। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও

বরিশালসহ অন্যান্য এলাকাতেও বিভিন্ন ধরনের পেট্রো রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বাতাস ও পানির নিম্নবর্ণিত কারণে দূষণ ঘটে, যেমন :

ক. এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য বড় কড়াই অথবা বেসিনে জাল দেয়া হয়। ফলে, সেখানে ছোট-বড় বয়লার, চুল্লি ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি হিসেবে এখানে কয়লা, ক্রুড-অয়েল, প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ফলে জ্বালানি দহন ও ধোঁয়ার কারণে পরিবেশ দূষিত হয়।

খ. তারপিন, কেরোসিন, প্যারাফিন, ন্যাপথলিন, অ্যারোমেটিক, ডিজেল, পেট্রোল, বিভিন্ন প্রকার চর্বি এবং অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে পানি দূষিত হয়।

গ. লুব অয়েল, গ্রিজ ইত্যাদি পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে।

ঘ. হাইড্রোজেন ও কার্বনের সমন্বয়ে জ্বালানি তৈরি হয়, যা দাহ্য পদার্থ হিসেবে পরিগণিত হয়। সেটি বোমা তৈরির কাজেও ব্যবহৃত হয়। ফলে, এসব পদার্থ সহজেই দাহ্য বস্তুতে রূপ নিয়ে পরিবেশ দূষিত করে।

প্রতিরোধ : পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পে দূষণ রোধ করতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি গৃহীত হয়, যেমন :

(১) এ শিল্পের বর্জ্য তেল একটি বদ্ধ নর্দমায় ছেড়ে দেয়া উচিত।

(২) অগ্নি-প্রতিরোধক ব্যবস্থা জোরদার করতে হয়।

(৪) চামড়া-শিল্পে দূষণ (Pollution in tanneries industry) : চামড়া শিল্পে ছাগল, গরু, মহিষ এবং অন্যান্য পশুর কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করা, কাঁচা চামড়া পাকা করা এবং চামড়াজাত বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। ঢাকার হাজারিবাগ এলাকাতেই প্রায় ১০০টি এবং চট্টগ্রামসহ অন্যান্য এলাকাতেও চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই শিল্পে-বাতাস ও পানি দূষিত হওয়ার কারণ নিম্নরূপ :

ক. চামড়া শিল্পে কাঁচা চামড়ায় লবণ দেয়া এবং পরিষ্কার করার সময় প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়ায় যা পরিবেশকে দূষিত করে।

খ. চামড়া কাঁচা অথবা পাকা অবস্থায় কাঁচি দিয়ে সাইজ করে কাটার সময় ছোট অংশগুলো ঠিকমতো সংরক্ষণ করা না হলে তা এখানে সেখানে পড়ে এবং পশুপাখি সেগুলো টেনে নিয়ে গেলে বাতাস ও পানি দূষিত হয়।

গ. কাঁচা চামড়া পাকা করতে হলে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করতে হয়। ফলে, রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে বাতাস ও পানি দূষিত হয়।

ঘ. চামড়া শিল্পে বয়লার, চুল্লিতে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি দহনের কারণে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড মিশ্রিত হওয়ার ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

ঙ. চামড়া শিল্পে কিছু ক্ষারকীয় পদার্থও ব্যবহৃত হয়, যার জন্য বাতাস ও পানি দূষিত হয়। যেমন : কাঁচা চামড়ার পচন রোধ করার জন্য চামড়ার ভিতরে ভাঁজে ভাঁজে লবণ দেয়া হয়। এটি ধোয়ার সময় দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষারকীয় পানি বের হয়, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

চ. চামড়া শিল্পে দূষণ চিহ্নিত করার ব্যাপারে তিনটি ডি (3 Ds) ব্যবহার করা হয়, যেমন :

(১) ময়লা (Dirty),

(২) বিপদজনক (Dangerous), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) গ্যাসের কারণে এবং

(৩) অবমূল্যায়ন (Degrading)। এই শিল্পে চামড়া প্রক্রিয়াকরণের স্থানে যে দুর্গন্ধ হয় তার জন্য মানুষের মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া হয়। অনেকের বমি ভাব হয়।

প্রতিরোধ : চামড়া শিল্পে দূষণ রোধ করতে নিম্নলিখিত সতর্কতামূলক পদ্ধতি গৃহীত হয়। যেমন :

(১) চামড়া শিল্প থেকে ক্ষারকীয়, লবণাক্ত ও অম্লীয় পানি নির্দিষ্ট একটি নালায় ফেলতে হবে যাতে কেউ ব্যবহার করতে না পারে এবং সেখানে কেউ মাছের চাষও না করে।

(২) চামড়া শিল্প থেকে নির্গত পানিতে ভাসমান কঠিন পদার্থ, বিষাক্ত জৈব পদার্থ ইত্যাদি ছাঁকনি দিয়ে সংগ্রহ করে তা মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।

(৩) পানিতে দ্রবীভূত ফ্লোরাইড সালফেট আলাদাভাবে নিরাপদ স্থানে নিষ্কাশন করতে হবে।

(৪) চামড়া শিল্পে কর্মরত কর্মচারি ও কর্মকর্তাগণকে দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পেতে তাদের নাকে এক ধরনের প্রতিরোধমূলক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে।

(৫) এ শিল্পে কর্মরত কর্মচারিদের নাকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও হাতে গ্লোব্‌স ব্যবহার করতে হবে।

(৬) চামড়া শিল্প থেকে নির্গত পানি পরিশোধন করে নদী অথবা জলাশয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৪.১১ পেস্টিসাইডের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া (The use and effect of Pesticides)

ক্ষেতে ফসল ফলানোর জন্য এবং পোকামাকড় দমনের জন্য বালাই নাশক ব্যবহার করতে হয়। ক্ষেতে খামারে যেসব পোকামাকড় দেখা যায়, তার অধিকাংশ ক্ষতিকারক এবং কিছু উপকারী। পেস্টিসাইড ক্ষেতে প্রয়োগ করলে তাই খারাপ পোকামাকড়ের সাথে কিছু উপকারী পোকামাকড়ও মারা পড়ে যা পরিবেশের জন্য কিছুটা ক্ষতিকারক হয়। আমাদের দেশে পেস্টিসাইড প্রস্তুতের তেমন উন্নত প্রতিষ্ঠান নেই এবং এটি সাধারণত বিদেশ থেকে আমদানি হয়।

গবেষকদের মতে ক্ষেতে পেস্টিসাইড প্রয়োগের পূর্বে কৃষককে সম্যক প্রশিক্ষণ নিতে হয়। ক্ষেতে কখনোই পরিমাণের অতিরিক্ত পেস্টিসাইড প্রয়োগ করতে নেই। আবার কোন ফসলের ক্ষেতে কি ধরনের পোকার আক্রমণ হয় এবং কোন মৌসুমে কোন ধরনের পোকার আবির্ভাব ঘটে, সে ব্যাপারে কৃষক অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে জানতে পারে। অতিরিক্ত পেস্টিসাইড আমাদের বসবাসের মাটি, পানি, বায়ু, খাদ্যদ্রব্য, শাক-পাতা, ফলমূল, তরিতরকারি প্রভৃতিতে দূষণ ঘটায়। গবেষকদের মতে পেস্টিসাইডের শতকরা ০.১ ভাগ

কীটপতঙ্গ বিনাশের কাজে এবং অবশিষ্ট পরিবেশ দূষণ ঘটায়। তাই, পেস্টিসাইড ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

পেস্টিসাইডের প্রকারভেদ (Types of pesticides) : রাসায়নিক পেস্টিসাইডের ব্যবহারভেদে এটিকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়, যেমন :

(১) **কীটনাশক** (Insecticides) : অ্যালড্রিন, ডায়াজিনন, ডিডিটি, ক্যাম্পর, পেরাথিরন, কার্বোফুরান, এলডেকার্ব, রোটেনল প্রভৃতি পেস্টিসাইড দ্বারা কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড় দমন করা হয়।

(২) **আগাছা নাশক** (Herbicides) : সিলডেক্স, ডাইফেলাসাইড, ডালাপন, আরটাজিন, সিটমাজিন ইত্যাদি ক্ষেত খামারের আগাছা দমনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

(৩) **ছত্রাকনাশক** (Fungicides) : কার্বন ডাই-সালফাইড, ব্রোমাইড, ক্যাপাটান, ম্যানকোজের ইত্যাদি ফসলের ছত্রাক দমনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

(৪) **ইঁদুর নাশক** (Rodenticides) : মিথাইল ব্রোমাইড, কার্বন ডাই-সালফাইড ইত্যাদি আবাসিক এলাকার ইঁদুর দমনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

(৫) **বক্রকৃমি নাশক** (Nematocides) : কার্বন ডাই-সালফাইড, ইথিলিন ডাইব্রোমাইড, মিথাইল ব্রোমাইড, কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড ইত্যাদি ফসলের ক্ষেত, ঘাস, বক্রকৃমি নাশের জন্য ব্যবহার করা হয়।

ফসলের ক্ষেতে পোকামাকড়, ইঁদুর, বক্রকৃমির আক্রমণে ফসলের হ্রাস ঘটে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। পেস্টিসাইড পরিমিত মাত্রায় ব্যবহারে পোকামাকড় নিধন হয় বা কমে যায়। ফলে, ক্ষেতখামার থেকে আশাপ্রদ ফসল পাওয়া যায়।

পেস্টিসাইড ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া : ফসলের ক্ষেত এবং বসতবাড়িতে পোকামাকড়, ইঁদুর ইত্যাদি দমন করার জন্য পেস্টিসাইড ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা নিম্নরূপ :

সুবিধা (Advantages)	**অসুবিধা** (Disadvantages)
১. মাজরা পোকা, ল্যাদা পোকা, ইঁদুর ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পেতে পেস্টিসাইড ব্যবহার করা হয়।	১. পেস্টিসাইড ব্যবহারের ফলে ক্ষেত খামারে উপকারী কীটপতঙ্গের মৃত্যু হয়।
২. কীটপতঙ্গ ফসলের কচি পাতা খেয়ে ফেলে এবং এদের আক্রমণে গাছ হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়। সেজন্য গাছে পেস্টিসাইড দিলে গাছটি বেঁচে যায় এবং বংশবৃদ্ধিও ঘটায়।	২. পেস্টিসাইড মাটি, পানি ও বাতাস দূষিত করে।
৩. হাজার, লক্ষ টাকা খরচ করে ক্ষেত করে এবং সময়মতো পেস্টিসাইড ব্যবহার করলে ফসলের ভালো ফলন পাওয়া যায়, অর্থনৈতিক দিকেও লাভবান হওয়া যায়।	৩. এটি মাটির উর্বরা শক্তি কমায় এবং যেসব ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন ধারণ করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, পেস্টিসাইড সেসব ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

৪. নারিকেল গাছ, লেবু গাছ, কাঁঠাল গাছ, আমগাছ, লিচু গাছ প্রভৃতি গাছের শিকড়ে পোকা লাগলে গাছ মরে যায়। পেস্টিসাইড ব্যবহার করলে পোকা মরে যায় এবং গাছগুলো বেঁচে যায়।	৪. যেসব পুকুর ও জলাশয়ের পাড় নিচু, সেখানকার ক্ষেত খামারে পেস্টিসাইড ও পানি সরবরাহ করলে বিষ মিশ্রিত পানি জলাশয়ে পতিত হয়ে পানি দূষিত হয়, জলজ প্রাণী ও মৎস্য সম্পদ মারা যায়।
৫. ইঁদুরের উৎপাতে ক্ষেতে পাকা ধান, গম নষ্ট হয়ে যায়। পেস্টিসাইড ব্যবহার করলে ক্ষেত ও ঘরবাড়ির ইঁদুর মরে যায়।	৫. অনেক কৃষকই বাসুডিন, এনড্রিন নামক বিষ ক্ষেতে প্রয়োগ করার জন্য ঘরে রেখে দেয়। সেগুলো ভুলক্রমে খাবারের সাথে মিশে গেলে খাবারে বিষক্রিয়া হয় এবং মানুষ ও পশুপাখির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪.১২ অজৈব সারের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া (Use and effect of Inorganic Fertilizer)

যে সারের মধ্যে জীবদেহ সংক্রান্ত কোনো সংশ্রব থাকে না এবং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়, তাকে অজৈব সার বলে। সাধারণত নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি অজৈব সারের যৌগিক পদার্থ। এ সার ভূমিতে প্রয়োগ করলে ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়, গাছপালা সতেজ এবং ফসলের ফলন ভালো হয়। ইউরিয়া, পটাশ, ফসফেট প্রভৃতি অজৈব সারের উদাহরণ। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বাতাস থেকে রাসায়নিক উপায়ে এ সারের উপাদান সংগ্রহ করা হয় এবং সার প্রস্তুত যন্ত্রের সমন্বয়ে প্রস্তুত করে তা ব্যাগে পূরণ করে বাজারজাত করা হয়। ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, ঘোড়াশাল সার কারখানা, বাংলাদেশ মিলস এন্ড ফার্টিলাইজার, পলাশ সার কারখানা, টি.এস.পি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে এই অজৈব সার প্রস্তুত করা হয়।

অজৈব সারকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা হয়, যেমন :

(১) রাসায়নিক সার (chemical fertilizer) এবং

(২) কম্পোজড সার (composed fertilizer)।

এই সার দুটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ :

(১) রাসায়নিক সার : যে সার রাসায়নিক উপায়ে রাসায়নিক যৌগের সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়, তাকে রাসায়নিক সার বলে। উদাহরণস্বরূপ : ইউরিয়া, পটাশিয়াম, ফসফেট প্রভৃতি রাসায়নিক সার হিসেবে খ্যাত।

(২) কম্পোজড সার : যে সার মাটির নিচে সারের উপাদানগুলোকে চাপা দিয়ে নির্দিষ্ট সময় রেখে অবস্থার রূপান্তরের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়, তাকে কম্পোজড সার বলে। সাধারণত কচুরিপানা, আগাছা, গোবর, ঘাস পাতা, আঁখের ছোবড়া, বর্জ্য পদার্থ প্রভৃতি একত্রে মিশিয়ে পচনশীল দ্রব্যের সমন্বয়ে পচিয়ে বা মাটির নিচে বেশ কিছু দিন চাপা দিয়ে রেখে দিলে এ সার প্রস্তুত হয়। এ সার দেখতে ধূসর বর্ণের এবং ঝরঝরে দানাবিশিষ্ট হয়।

সারা বিশ্বে তথা বাংলাদেশে সারের ব্যবহার প্রতিদিনই বাড়ছে। আমাদের দেশে জৈব সারের ব্যবহার সর্বাধিক। গোবর সার গ্রামে গঞ্জে প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং এ সার ক্ষেতখামার ও গাছপালার জন্য অধিক উপযোগী। গোবর সার ব্যবহারে কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া নেই। তবে, গোবর একটি স্থানে জমা করে পচিয়ে সার হলে তখন এটিকে ব্যবহার করা হয়। তাজা গোবর গাছের জন্য তেমন উপকার হয় না। তবে, চীনদেশে মানুষের মল এবং গোবর একত্র করে ফসল উৎপন্নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বিশেষ উপকার পাচ্ছে বলে জানা গেছে। এই সারকে কাঁচা অবস্থাতেই ক্ষেতে বা গাছপালার গোড়ায় প্রয়োগ করা হয়।

সারা বিশ্বে সারের গড় ব্যবহার ১৯৭৫ সালে হেক্টর প্রতি ৬২ কেজি ছিল। ১৯৮৫ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় হেক্টর প্রতি ৮৬ কেজি। জাপান ও চীনে সার ব্যবহারের পরিমাণ সর্বাধিক। ১৯৮৬ সালে ভারত হেক্টর প্রতি সার ব্যবহার করেছে যেখানে ৫৭ কেজি, সেখানে জাপান ব্যবহার করেছে ৪২৭ কেজি। পূর্বেই আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলন ছিল যে, অধিক সার ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। এই ধারণা বর্তমানে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানের ধারণা হলো– যত বেশি সার ব্যবহার করা যাবে, ক্ষেতের উর্বরতা তত বৃদ্ধি পাবে এবং ফসল উৎপাদনে ফলনও সেই হারে বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশে নিম্নবর্ণিত তিন ধরনের রাসায়নিক সার উৎপন্ন হয়, ১৯৮৭–৮৮ সালে এগুলোর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ :

ইউরিয়া	১২,৮৫,৮৫৮ মেট্রিক টন
টি. এস. পি	৭,৭৫,৩৪০ মেট্রিন টন এবং
অ্যামোনিয়াম ফসফেট	৫,৮৯৮ মেট্রিক টন

অজৈব সার ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া : ক্ষেত খামারের ফসলে এবং গাছপালাতে অজৈব সার ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধা নিম্নরূপ :

সুবিধা (Advantages)	**অসুবিধা** (Disadvantages)
১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে বাড়তি ফসল ফলানোর লক্ষ্যে রাসায়নিক বা অজৈব সার ব্যবহার করা হয়।	১. সাধারণত সার কারখানায় অজৈব সার প্রস্তুত করা হয়। সেখানে দামি যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনা ও কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। এজন্য এ সার উৎপাদনে মূল্য বেশি পড়ে।
২. অজৈব সার প্রস্তুত করতে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বাতাসের উপাদানকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই, এ সার অধিক হারে প্রস্তুত করা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।	২. অজৈব সার বিদেশ থেকে আমদানি করলে সারের সংগ্রহ মূল্য অনেক বেশি পড়ে। এ সার কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করলে গরীব কৃষকের উপর বাড়তি মূল্যের বোঝা আরোপিত হয়।

৩.	বাংলাদেশে অনেকগুলো গ্যাস খনি রয়েছে। এ গ্যাসকে জ্বালানি এবং সারের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করলে দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার হতে পারে।	৩.	গোবর পেস্টিসাইড হিসেবে বাড়ির উঠান ও মেঝে লেপন করা হয়। ফলে গোবরের সারও পেস্টিসাইড হয় এবং গোবরের সার দিলে ক্ষেতে পেস্টিসাইড ব্যবহার করতে হয় না বা কম ব্যবহার করলেই চলে। কিন্তু অজৈব সার ব্যবহারের জমিতে অধিক পরিমাণে পেস্টিসাইড ব্যবহার করতে হয়।
৪.	কাঁচা গোবর গাছপালা ও ফসলের জন্য ক্ষতিকর। এস্থলে অজৈব সারকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলে।	৪.	ক্ষেত্রবিশেষে অধিক পরিমাণে অজৈব সার ব্যবহার করলে ফসলের ক্ষতি হয়।
৫.	বছরে ২/৩টি ফসল ফলানোর জন্য অধিক সারের প্রয়োজন হয়। ফলে দেশে তৈরি এবং বিদেশ থেকে অজৈব সার আমদানি করে বাড়তি চাহিদা মিটানো সহজ হয়।	৫.	অজৈব সার ব্যবহারে উৎপন্নকৃত ফসলের স্বাদ ও ভিটামিন গোবর সার প্রয়োগের তুলনায় কম থাকে।

পেস্টিসাইড নিয়ন্ত্রণবিধি (Pesticides control) : পেস্টিসাইড ব্যবহারের উপকারিতা এবং অপকারিতা বিবেচনা করে ১৯৮৫ সালে পেস্টিসাইড ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ বিধি জারি হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশের মান উন্নয়ন, পরিবেশের দূষণ রোধকল্পে ১৯৯৫ ও ১৯৯৭ সালে এই নিয়ন্ত্রণ বিধি অর্ডিনেন্স আকারে পুনরায় বলবৎ করা হয়েছে। এটির আওতায় পেস্টিসাইড আমদানিকারক ও ব্যবহারকারীগণের লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়।

৪.১৩ বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা (Waste management)

যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব বর্জ্য পদার্থকে একটি নিয়ন্ত্রিত উপায়ে দূরে স্থানান্তর এবং বিপদমুক্ত করা হয়, তাকে বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা বলে। বর্জ্য পদার্থ তরল এবং কঠিন এ দুই প্রকারের হতে পারে। রাস্তা ও বাড়িঘরের আবর্জনা থেকে শুরু করে কারখানায় ফেলে দেয়া তরল বা কঠিন পদার্থ এর আওতাভুক্ত। গ্রাম, শহর ও শিল্প কারখানা থেকে উৎপন্ন বর্জ্যকে নিম্নবর্ণিত চারভাগে ভাগ করা হয়, যেমন :

(ক) গ্রামীণ বর্জ্য (Rural waste),

(খ) পৌর বর্জ্য (Municipal waste),

(গ) শিল্প বর্জ্য (Industrial waste) এবং

(ঘ) পারমাণবিক বর্জ্য (Nuclear waste)।

এই বর্জ্যসমূহের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :

(ক) গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Rural waste management) : গ্রামীণ বর্জ্য বলতে ঘর-বাড়ি ও রান্নাঘর থেকে পরিত্যক্ত তরকারির খোসা, মাছের আঁইশ, প্লাস্টিক ও টিনের

কৌটা, গরু-ছাগলের গোবর ও মূত্র, কাঁচা-পায়খানা, খোলা পায়খানা ইত্যাদি। আবার, পশুপাখির মরদেহ, আগাছা, পচনশীল দ্রব্য যত্রতত্র জমা রাখলে গ্রামে-গঞ্জে পরিবেশের দূষণ ঘটে।

এসব বর্জ্য ঢাকনাবিশিষ্ট একটি গর্তে জমা করলে এবং কাঁচা পায়খানার উপরেও ঢাকনা ব্যবহার করলে এগুলোর দুর্গন্ধ বাইরে ছড়াবে না। প্লাস্টিক ও টিনের কৌটা, ছেড়া কাগজ আলাদা পাত্রে রেখে জমা করলে এবং তা পুনঃচক্রের (recycle) মাধ্যমে ব্যবহার করলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হয়। পশুপাখির মরদেহ মাটিতে গর্ত করে রাখা, গোবর ও মলমূত্র একটি গর্তে জমা করে রাখলে সেটি পচে সার হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে তা ফসলের ক্ষেতে ব্যবহার করলে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয় এবং বর্জ্যও দূর হয়।

(খ) পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Municipal waste management) : পৌর বর্জ্য পদার্থের মধ্যে মূলত গৃহস্থালীর বর্জ্য দ্রব্য, গ্লাস, বোতল, প্লাস্টিক, কাঠ, কাঁচ, কংক্রিট, ইট পাথর, কাপড় মাটি ইত্যাদি। এগুলোকে প্রথমে ধাতব পদার্থ পৃথককরণের (metal separator) মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। ফলে ধাতব পদার্থসমূহ পৃথক হয়ে যায়। অতঃপর অবশিষ্ট থেকে বড় পাথর, বোতল, কাঁচের বড় টুকরা প্রভৃতি মাধ্যাকর্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে পৃথক করা হয়।

বর্জ্য পদার্থকে শোধনাগারে (treatment plant) প্রেরণ করা হয়। প্রেরণের পূর্বে হাত দিয়ে পৃথক করা হলে আবর্জনার তাপীয়মান (C.V) অনেক হ্রাস পায়। ফলে জ্বালানি খরচ বৃদ্ধি পায়। আবার আবর্জনায় জলীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকলেও তাপীয়মান হ্রাস পায়। সুতরাং আজকাল ময়লা ফেলার মূল জায়গায় হস্ত চালনার মাধ্যমে বিভিন্ন পদার্থ পৃথক করা হয়। পৌর বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন উপায়ে হয়।

ব্যবস্থাপনার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতিগুলো হচ্ছে :

(১) গ্যাসীভূতকরণ (Gasification),

(২) মিশ্র সারে পরিণতকরণ (Composting),

(৩) আয়তন হ্রাসকরণ (Pyrolysis) এবং

(৪) ভস্মীভূতকরণ। এগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ :

(১) গ্যাসীভূতকরণ : এ পদ্ধতিতে বাষ্প ব্যবহার করে বর্জ্য পদার্থকে বিভিন্ন গ্যাসে পরিণত করা হয়। এতে অতিরিক্ত বাতাসের প্রয়োজন হয়। গ্যাসীভূতকরণের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিম্নরূপ : বর্জ্য পদার্থ + বাষ্প = অক্সিজেন (O_2) → কার্বন মনোক্সাইড (CO) + কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) + তাপ (heat) + মিথেন (CH_4)।

(২) মিশ্র সারে পরিণতকরণ : এ পদ্ধতিতে বর্জ্য পদার্থকে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে মিশ্র সারের উপাদানসমূহকে উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকা ও পুষ্টিকর পদার্থে পরিণত করা হয়। এটি গ্রামাঞ্চলে অতি প্রচলিত কিন্তু শহরের বর্জ্যে কম থাকায় এ পদ্ধতি তেমন গ্রহণযোগ্য নয়।

(৩) আয়তন হ্রাসকরণ : এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যা বাতাসের অনুপস্থিতিতে বাহ্যিক তাপের সমন্বয়ে ঘটানো হয়। বর্জ্য পদার্থকে এ পদ্ধতির মাধ্যমে অধিক তাপ ও চাপে

কঠিন, তরল এবং বায়বীয় পদার্থে পরিণত করা হয়। ৪.১০ চিত্রে বর্জ্য পদার্থের আয়তন হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

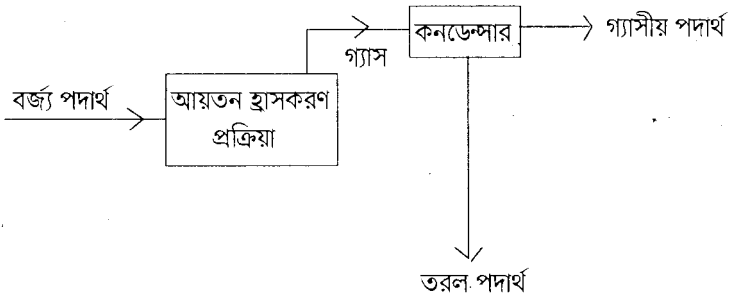

চিত্র ৪.১০ : বর্জ্য পদার্থের আয়তন হ্রাসকরণ প্রক্রিয়ার ডায়াগ্রাম।

(৪) **ভস্মীভূতকরণ :** এটি একটি সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি। এখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রকোষ্ঠ নামে দুটি কক্ষ থাকে। এ কক্ষদ্বয়ের তাপমাত্রা ৭০০° সেলসিয়াস থেকে ৯০০° সেলসিয়াস তাপে বর্জ্য পদার্থ থেকে জলীয়বাষ্প কার্বন মনোক্সাইড (CO), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), নাইট্রোজেন (N_2) প্রভৃতি ফ্লু গ্যাসে পরিবর্তিত হয়ে চিমনি দিয়ে বয়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। ৪.১১ চিত্রে বর্জ্য পদার্থ ভস্মীভূতকরণ প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

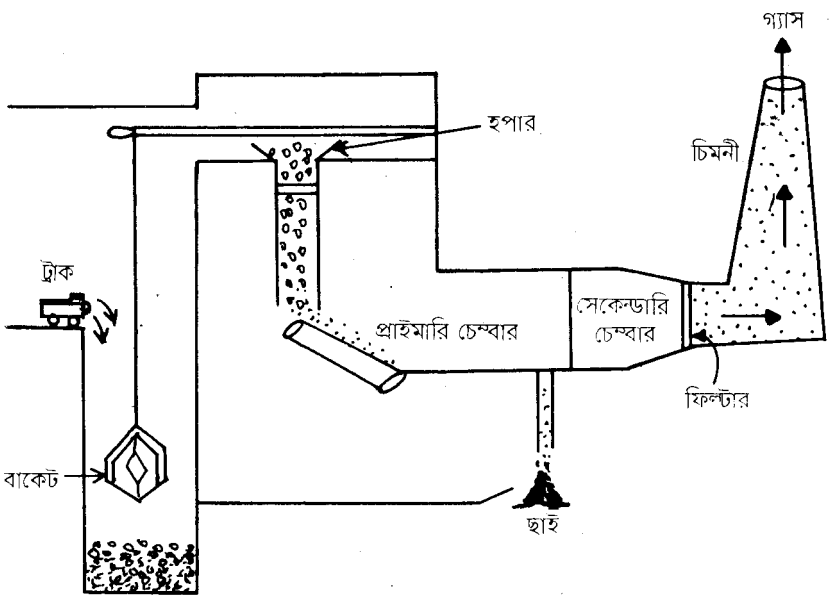

চিত্র ৪.১১ : বর্জ্য পদার্থ ভস্মীভূতকরণ প্রক্রিয়া।

(গ) শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Industrial waste management) : শিল্প কারখানায় বিভিন্ন ইঞ্জিন, টারবাইন, বৈদ্যুতিক মোটর, জেনারেটর, লেদ যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এগুলোতে জ্বালানি, তেল, গ্রিজ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় এবং তা থেকে উৎপন্ন ক্ষতিকর গ্যাস পরিবেশের দূষণ ঘটায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিয়ত শত, হাজার টন বর্জ্য পরিত্যক্ত হয়। এই বর্জ্য জড়ো করে না রেখে তা নিম্নবর্ণিতভাবে ব্যবস্থা করা হয়, যেমন :

(১) শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত ক্ষতিকর গ্যাস শোধন করে বায়ুমণ্ডলে ছাড়ার ব্যবস্থা করা।

(২) চিমনি থেকে নির্গত ফ্লু গ্যাস পুনরায় ব্যবহারের মাধ্যমে তা থেকে তাপ কমানো ও সদ্ব্যবহার করা।

(৩) তরল পদার্থের সাথে মিশ্রিত বর্জ্য আলাদা করে কঠিন বর্জ্যের দহন ঘটিয়ে সার ও বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত এবং তরল বর্জ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন করা।

(৪) বর্জ্য পদার্থ থেকে সংগৃহীত প্লাস্টিক, কাচ, পলিথিন, কাগজ, কাঠ প্রভৃতি পুনঃচক্রের মাধ্যমে ব্যবহার করে বর্জ্য দূর ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়।

(৫) দুর্গন্ধ এবং বিষাক্ত বর্জ্য ঢাকনাবিশিষ্ট গর্তে জমা করা অথবা মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হয়।

(ঘ) পারমাণবিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Nuclear waste management) : পারমাণবিক প্ল্যান্টে বা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের চুল্লিতে যে পারমাণবিক জ্বালানি বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ উৎপাদন করে, সে চুল্লিতে জ্বালানির ছাই জাতীয় বর্জ্য প্রস্তুত হয়। এ বর্জ্যের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা থাকে, যা জীবজন্তু, পশুপাখির জীবনের হুমকিস্বরূপ। তাই, এই বর্জ্যকে মাটির অনেক নিচে পুঁতে দেয়া হয়। বর্জ্যকে অনেক সময় সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। এটি মোটেই ঠিক নয়, কারণ তেজস্ক্রিয়তা বিনষ্ট হয় না এবং জনস্বাস্থ্যসহ অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য হুমকিস্বরূপ।

স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং (Sanitary Engineering) : স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বর্জ্য পদার্থ দ্রুত স্থানান্তর, সুষ্ঠু ও নিরাপদ নিষ্কাশন প্রয়োজন। এ কাজের চারটি অংশ :

১. সব বর্জ্য পদার্থের সহজ ও সুষ্ঠু একত্রকরণ,

২. একত্রকরণ বর্জ্য পদার্থ নর্দমা ও নলের মধ্য দিয়ে শোধন ও অপসারণ কেন্দ্রে দ্রুত ও নিরাপদ বহন,

৩. শোধন ও অপসারণ কেন্দ্রে ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থকে অক্ষতিকর অবস্থায় রূপান্তর (purification and modification) এবং নিরাপদ স্থানে অপসারণ,

৪. অপসারণকৃত পদার্থ থেকে দূষিত গ্যাস দূরীকরণ ও বাতাস অনুকূলকরণ।

বর্জ্য পদার্থ অপসারণ (Disposal of wastes) : আবাসিক এলাকা থেকে কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করার কাজকে দুভাগে ভাগ করা হয়, যেমন :

১. বর্জ্য আবর্জনা সংরক্ষণ পদ্ধতি (Convergency Systems of waste)

২. পানি দ্বারা বর্জ্য পদার্থ বহন পদ্ধতি (Water carriage system of waste)।

এই পদ্ধতি দুটির চিত্রসহ বর্ণনা নিচে দেয়া হয়েছে।

১. বর্জ্য আবর্জনা সংরক্ষণ পদ্ধতি : বর্জ্য আবর্জনা সংরক্ষণে এটি একটি পুরাতন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলা হয় এবং একত্র করে সংরক্ষণ করা হয়।

আবর্জনা ঠেলা গাড়িতে ভরে আবাসিক এলাকা থেকে দূরে কোনো বসতিহীন এলাকায় সরিয়ে ফেলা হয়। সেখানে আবর্জনার পচনযোগ্য অংশ মাটির সাথে মিশে যায় এবং বাকি অংশ পুড়িয়ে ফেলা হয়। এতে পচনযোগ্য দ্রব্য এবং দহনকৃত ছাই ভস্মের সমন্বয়ে সার প্রস্তুত হয় যা ক্ষেতে প্রয়োগ করলে ফসলের ভাল ফলন পাওয়া যায়। ৪.১২ চিত্রে বর্জ্য আবর্জনা সংরক্ষণ প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। ঘর থেকে ধোয়া-মোছা পানি এবং বৃষ্টির পানি কাঁচা অথবা পাকা নর্দমা দিয়ে বসত এলাকার অদূরে কোনো ডোবা অথবা খালে ফেলা দেয়া হয়।

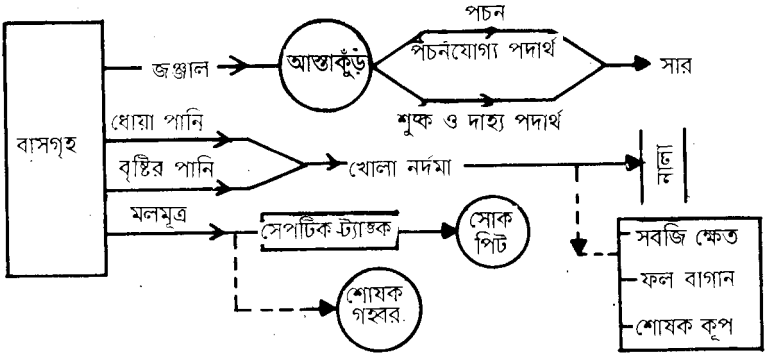

চিত্র ৪.১২ : বর্জ্য আবর্জনা সংরক্ষণ।

মলমূত্র বা সিউয়েজ (sewage) অংশ সেপটিক ট্যাংকে (septic tank) জমা করা হয় এবং সেখানে সোকপিট (Soak pit) অথবা শোষক গহ্বর-এর সমন্বয়ে গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানে স্লাজ সংরক্ষিত থাকে। অবশ্য গ্রামগঞ্জের লোক বাড়িঘরের পায়খানা থেকে বালতি ভরে পায়খানা নিয়ে যায় এবং বসত এলাকার বাইরে বেশ দূরে সংরক্ষণ করে। তবে, এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা অস্বাস্থ্যকর এবং পরিবেশ দূষিত করে বলে এর ব্যবহার দিন দিন কমে যাচ্ছে।

আমরা সকলেই জানি যে, বর্জ্য পদার্থ অপসারণ এবং সংরক্ষণ দুটি কাজই অস্বাস্থ্যকর। মশা, মাছি, কীটপতঙ্গ দ্বারা এসব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ফলে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি মারাত্মক রোগের উদ্ভব ঘটে। বাড়িঘরের কাছাকাছি নালা-নর্দমা থাকলেও একইভাবে পরিবেশ দূষিত হয়। তাই স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণ করা ও পুড়িয়ে ফেলা যুক্তিযুক্ত।

২. পানি দ্বারা বর্জ্য পদার্থ বহন পদ্ধতি : সাধারণত শহর এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণ পানির সমন্বয়ে বর্জ্য পদার্থ বা মলমূত্র প্রভৃতি দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতিকারক পদার্থ বসত এলাকার বাইরে স্থানান্তর, সংরক্ষণ ও নিষ্কাশন করা হয়।

৪.১৩ চিত্রে এ ধরনের পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। বাড়িঘরের এসব পানি মিশ্রিত বর্জ্য পদার্থ বাড়ির নালা বা নর্দমার মাধ্যমে বাইরে নেয়া হয় এবং ভূ-গর্ভস্থ সিউয়ার পাইপ (Sewer pipe) এর মধ্য দিয়ে শোধন ও অপসারণ কেন্দ্রে (treatment and disposal centre) নিয়ে যাওয়া হয়।

সিউয়েজের অন্তর্গত জৈব পদার্থ সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক ও অতি সহজে পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়। শোধন কেন্দ্রে এ জৈব পদার্থ জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে অক্ষতিকর যৌগ পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

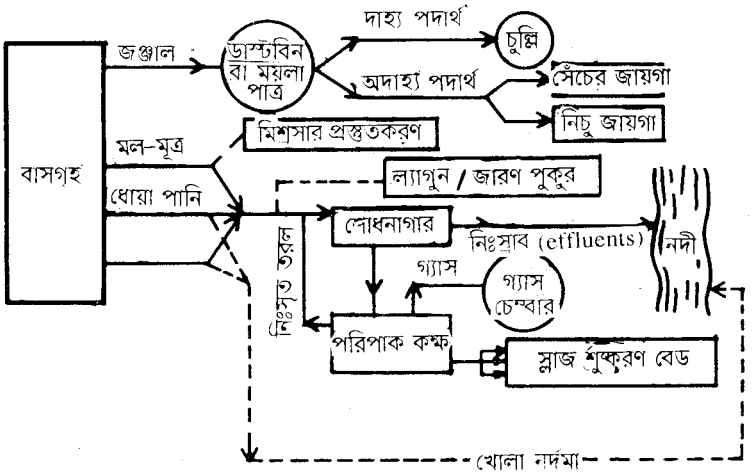

চিত্র ৪.১৩ : শহর এলাকায় পানিবাহিত পদ্ধতিতে বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণ ও নিষ্কাশন পদ্ধতি।

এ পদ্ধতিতে সিউয়েজের তরল অংশ আলাদা হয়ে খাল, নদী বা জলাশয়ে পতিত হয়। অবশিষ্ট অংশ স্লাজ বা কাদাযুক্ত মল হিসেবে শোধন কক্ষে থিতিয়ে পড়ে। এই স্লাজ পরে বিশেষ শোধন কক্ষে থিতিয়ে পড়ে এবং বিশেষভাবে শোধনের জন্য পরিপাক কক্ষে (digestion chamber) উপনীত হয়। এ কক্ষে জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে স্লাজের আয়তন অনেক কমে যায়। অতঃপর এ স্লাজ উন্মুক্ত বালি শোধনাগারে (sand drying bed) নেয়া হয় এবং সেখানে রৌদ্রতাপ ও বাতাসে শুকিয়ে শুষ্ক আকার ধারণ করে। পরবর্তীতে এগুলো জমিতে জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্লাজ পরিপাক কক্ষে স্লাজ থেকে জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রাপ্ত গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাড়ি থেকে যেসব শুষ্ক আবর্জনা বের হয়, তা বহন করে একত্রে সংরক্ষণ করে পুড়িয়ে সার প্রস্তুত করা হয়। বাড়ির ধোয়া মোছার পানি ও বৃষ্টির পানি একত্র করে কাঁচা অথবা পাকা নর্দমা দিয়ে কোনো খাল অথবা নদীতে নিষ্কাশন করা হয়। কিছু পানি শোধনাগারের পরিপাক কক্ষে নেয়া হয় যা স্লাজ পরিপাক কাজে সাহায্য করে এবং যেখানে স্লাজ পরিপাকের ব্যবস্থা নেই, সেখানে মলমূত্রকে সেপটিক ট্যাংকে নেয়া হয়। মলমূত্র থেকে উৎপন্ন দুর্গন্ধ গ্যাস সংযুক্ত পাইপ দিয়ে বের হয়ে যায়। স্যানিটারি পায়খানাতে এ ধরনের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকে।

ধোয়া মোছার পানি এবং বৃষ্টির পানি খালে না ফেলে অনেক সময় তরিতরকারি অথবা ফসলের ক্ষেতে সরবরাহ করা হয়। পানিবাহিত বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা একটি স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিক ব্যবস্থা। প্রাথমিকভাবে এ ব্যবস্থা ব্যয়সাপেক্ষ মনে হলেও মূলত এর মাধ্যমে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ স্বাস্থ্যকর থাকে।

৪.১৪ গ্রাম্য পায়খানা ব্যবস্থা (Rural Sanitation)

বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই। আবার, অনেক বাড়িতে হয়তো পায়খানাই নেই, এটি খুবই অস্বাস্থ্যকর। অনেকে খোলা স্থানে বা নালা, খাল, নদী, পুকুরপাড় প্রভৃতি স্থানে পায়খানা করে। এতে পুকুরের পানি দূষিত হয়। সে পানি গোসল করা, হাড়ি-পাতিল ধোয়া এবং রান্নার কাজেও ব্যবহৃত হয়। এতে রোগ জীবাণু ছড়ায় এবং কলেরা, টাইফয়েড ও আমাশয় প্রভৃতি রোগে গ্রামের সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হয়। গ্রামে-গঞ্জে মানুষের সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত চার ধরনের পায়খানা ব্যবহৃত হয়। যেমন :

১. কাঁচা পায়খানা (Trench latrine),

২. কুয়ো পায়খানা (Well Latrine),

৩. দুটি শোষক গহ্বর বিশিষ্ট পায়খানা (Two Soakage pit Latrine) এবং

৪. কম্পোস্টিং পায়খানা (Composting Latrine)।

পায়খানা ব্যবস্থার চিত্রসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হয়েছে।

১. কাঁচা পায়খানা (Trench latrine) : সাধারণত গ্রামে বাড়ির পিছনের দিকে এবং পানির কুয়ো থেকে অন্তত ৩০ মিটার দূরে এ ধরনের পায়খানা প্রস্তুত করা হয়।

৪.১৪ চিত্রানুযায়ী কাঁচা পায়খানা স্থাপনের জন্য জমিতে প্রায় ০.৬ মিটার থেকে ১ মিটার চওড়া, ১ মিটার থেকে ১.৫ মিটার লম্বা এবং ১.৫ মিটার থেকে ২ মিটার গভীর খাদ করতে হয়। ঐ গর্তের চারদিকে বাঁশ, তক্তা, টিন, কাঠ, চট প্রভৃতি দিয়ে ঘিরে এবং উপরে টিন, টালি, খড় প্রভৃতি দিয়ে ছাউনি দেয়া হয়।

গর্তের উপর তক্তা বা বাঁশ দিয়ে চরাট তৈরি করে স্থাপন করা এবং মাঝখানে ২০ সেমি. আকারের ফাঁকা জায়গা রাখা হয়। এ ফাঁকা জায়গার মধ্য দিয়ে মলমূত্র ও পানি গর্তের মধ্যে পতিত হয়। এই পায়খানা প্রতিবার ব্যবহারের পর অথবা প্রতিদিন জমাকৃত মলমূত্রের উপর

ছাই ফেলা প্রয়োজন। কারণ, ছাই দুর্গন্ধ ও জীবাণু নাশকের কাজ করে। এ পায়খানা তৈরি করা সহজ এবং খরচও কম। তবে, এ পায়খানা তেমন স্বাস্থ্যকর নয়।

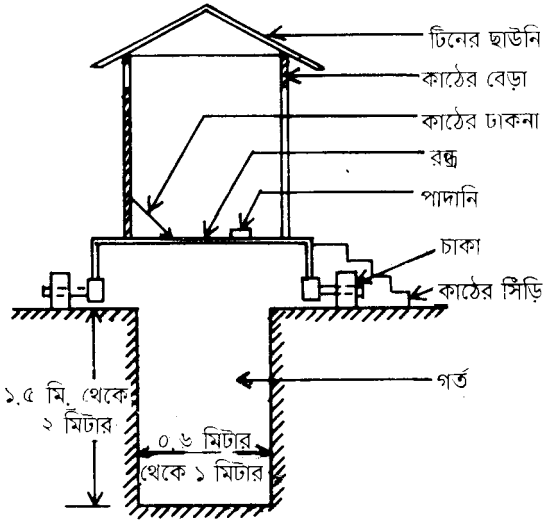

চিত্র ৪.১৪ : কাঁচা পায়খানা স্থাপনের কর্তিত নকশা।

২. কুয়ো পায়খানা (Well Latrine) : এ ধরনের পায়খানা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামে এবং কিছু কিছু শহরে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের পায়খানা স্বাস্থ্যসম্মত এবং স্থাপনের খরচও খুব বেশি নয়। কুয়ো পায়খানা প্রস্তুতের জন্য পায়খানার ঘর থেকে কিছু দূরে একটি কুয়ো খোঁড়া হয়। এই কুয়োর ব্যাস থাকে ০.৬ মিটার থেকে ১ মিটার এবং গভীরতা ৩ থেকে ৫ মিটার পর্যন্ত রাখা হয়। একটি ছোট সংসারে আট থেকে দশ বছর এ ধরনের পায়খানা ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ধরনের পায়খানা মূলত অস্থায়ী হলেও কাঁচা পায়খানার চেয়ে অনেক ভালো এবং স্থায়ী।

৪.১৫ চিত্রানুযায়ী এ ধরনের পায়খানার ঘর, ওয়াশিং কমোড (W. C.) এর প্যান, পাইপ লাইন, কুয়ো ঢাকনা গ্যাস পাইপ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। পায়খানা ঘরটি থেকে কুয়ো ২ থেকে ৩ মিটার দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। কুয়োর পাট সিমেন্ট ও চিকন রডের তৈরি। কোনো কোনো কুয়োর পাট আবার মাটি দিয়ে তৈরি করে পুড়িয়ে শক্ত করা হয়। আবার মাটির নিচ থেকে ইট দিয়ে গেঁথেও এ কুয়ো প্রস্তুত করা হয়।

কুয়ো পায়খানার একটি দোষ হলো, এটি অনেকটা স্যানিটারি পায়খানার মতো মনে হলেও কুয়োর নিচে কাঁচা থাকে বলে ভূ-গর্ভস্থ পানি এর মলমূত্র দ্বারা দূষিত হয়।

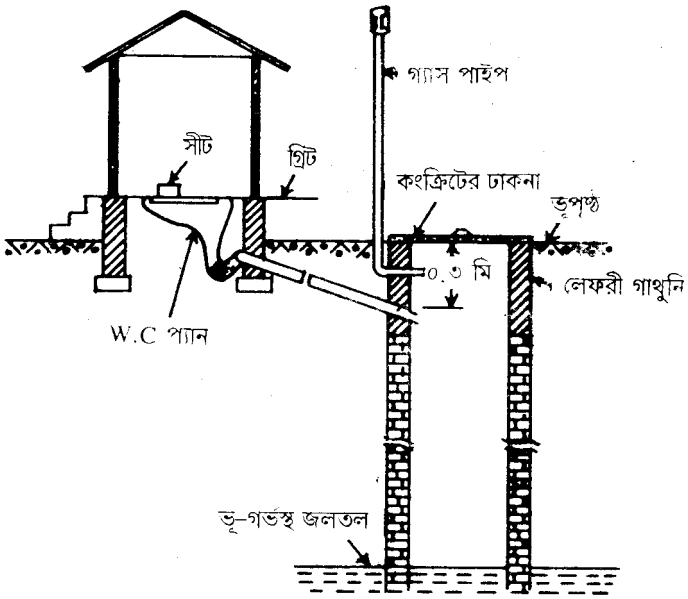

চিত্র ৪.১৫ : কুয়ো পায়খানা স্থাপনের কর্তিত নকশা।

৩. **দুটি শোষক গহ্বরবিশিষ্ট পায়খানা** (Two Soakage pit-Latrine) : এটি এক ধরনের কুয়ো পায়খানা, যাতে দুটি কুয়ো পাশাপাশি প্রস্তুত করা হয়। এ কুয়ো দুটিকে শোষক গহ্বর বলে। প্রতিটি কুয়োর শোষক গহ্বরের গভীরতা ১ থেকে ৩ মিটার এবং ব্যাস থাকে ১ মিটার।

দুটি শোষক গহ্বর পাইপ দিয়ে সংযুক্ত করা থাকলেও দুটি এক সাথে কাজ করে না। একটি কুয়ো (গহ্বর) নষ্ট হলে মলমূত্র ও পানি অন্য কুয়োতে জমা হয়। এর যে কোনো একটিতে গ্যাস পাইপ সংযুক্ত করা থাকে। ৪.১৬ চিত্রে এরূপ পায়খানার সম্মুখ ও প্ল্যান নকশা দেখানো হয়েছে।

কুয়ো পায়খানাতে পায়খানা ঘরের মধ্যে পানি স্থাপন করা থাকে এবং প্যানের নিচের দিক থেকে পাইপ সংযুক্ত করে একটি শোষক গহ্বরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়। পাঁচ-ছয় জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের একটি গহ্বর ভর্তি হতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লাগে। শেষে গহ্বরের মধ্যে মলমূত্র ও পানি একত্রে জারণের ফলে উদ্ভূত গ্যাস পাইপের মধ্য দিয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। মাটি পানি শুষে নেয় এবং স্লাজ কূপের নিচে জমা হতে থাকে। একটি কুয়োতে স্লাজ ভরে গেলে সেটি পরিষ্কার করে পুনরায় ব্যবহার করা হয়।

এ ধরনের পায়খানা সস্তা, টেকসই এবং নির্মাণ কৌশলও সহজ। এর দ্বারা বায়ুদূষণও ঘটে না। তবে কূপ দুটির তলদেশে মলমূত্র ও স্লাজ জমা হতে থাকে এবং কুয়োর পাটের ফাঁক

দিয়ে জলীয় পদার্থ মাটি শুষে নেয় বলে ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষিত হয়। গ্রামে বসবাসরত শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তি স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহার করে থাকেন।

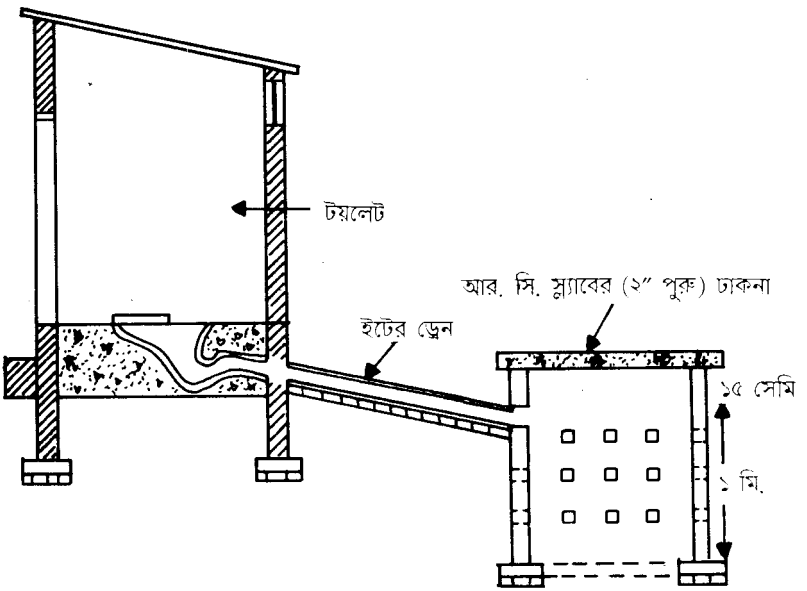

চিত্র ৪.১৬ : দুটি শোষক গহ্বরবিশিষ্ট পায়খানার সম্মুখ ও প্ল্যান নকশা।

৪. **কম্পোস্টিং পায়খানা** (Composting Latrine) : এটি একটি নতুন ধরনের পায়খানা, যা ভিয়েতনাম, কম্পোডিয়া এবং বাংলাদেশের সিলেট জেলার গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কম্পোস্টিং পায়খানা একটি স্থানান্তরযোগ্য পায়খানা। ৪.১৭ চিত্রানুযায়ী এ পায়খানার প্যানের নিচে একটি গর্ত থাকে এবং এ গর্তের মধ্যেই মলমূত্র জমা হয়। মলমূত্র ছাড়া লতাপাতা, রান্নাঘরের তরকারির খোসা, ফলমূলের খোসা এবং অন্যান্য বর্জ্য উপাদান প্রায় ৩ মাস যাবৎ জমা করা হয়। অতঃপর কম্পোস্টিং পায়খানার স্থান পরিবর্তন করা হয় এবং পুরাতন পায়খানায় জমাকৃত পচা মলমূত্র ও আবর্জনা সারের আকারে জমিতে প্রয়োগ করা হয়।

৪.১৫ শহরের পায়খানা ব্যবস্থা (Urban Sanitation)

গ্রামের কোনো বাড়িতে পায়খানা ব্যবস্থার ত্রুটি থাকলে তা কেউ খেয়াল করে না। কিন্তু শহরের পায়খানা ব্যবস্থা অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত হতে হয়। শহরে পৌরসভার নির্দেশমত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা প্রস্তুত করতে হয়। শহরে ইতিপূর্বে পায়খানা ব্যবস্থাপনায় কিছু

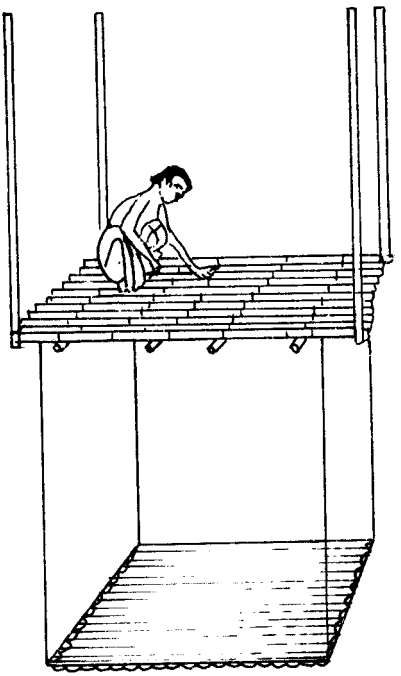

চিত্র ৪.১৭ : কম্পোস্টিং পায়খানা।

অসতর্কতা থাকলেও বর্তমানে এ ব্যাপারে পৌর কর্তৃপক্ষ বেশ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। শহরের পৌর এলাকা এবং শহরতলিতে নিম্নবর্ণিত পায়খানাসমূহ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

১. খাটা পায়খানা (Tub Latrine),

২. কুয়ো পায়খানা (Well Latrine),

৩. দুটি শোষক গহ্বর বিশিষ্ট পায়খানা (Two soakage Pit Latrine) এবং

৪. স্যানিটারি পায়খানা (Sanitary Latrine), এটি আবার দুই প্রকার, যথা :

ক. অ্যাকোয়া প্রিভি (Auqa privy) ও

খ. সেপটিক ট্যাংক পায়খানা (Septic tank Latrine)।

এই পায়খানাসমূহের চিত্রসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো।

১. খাটা পায়খানা : এটি পাকা বাড়িতে ব্যবহৃত পাকা পায়খানা হলেও দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং অস্বাস্থ্যকর। অথচ, পূর্বে এ পায়খানার অধিক প্রচলন ছিল এবং কিছু কিছু শহর বা শহরতলিতে এখনও এ ধরনের পায়খানার প্রচলন আছে। এটি দেখতে একটি সাধারণ পায়খানা ঘরের মতো।

এ পায়খানার মেঝ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ০.৭৫ থেকে ১ মিটার উপরে থাকে। অধিকাংশ মেঝ কংক্রিট নির্মিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে কাঠেরও থাকে। মেঝেতে একটি ছিদ্র থাকে এবং ছিদ্রের

ঠিক সোজা নিচে মল ধারণের একটি পাত্র থাকে। বিশেষ শ্রেণীর লোক নির্দিষ্ট সময় পর পর মলমূত্র থেকে মল সংগ্রহ করে মলবাহিত গাড়িতে করে দূরে বসতবাড়িবিহীন স্থানে জমা করে। এ পায়খানা রোগজীবাণু ছড়ায় এবং এর দ্বারা মশা, মাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। গাফিলতির কারণে নির্দিষ্ট সময়ে মল না সরালে পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। পরিবেশগত কারণে এ পায়খানার প্রচলন দিন দিন কমে যাচ্ছে।

(২–৩) কুয়ো ও দুটি শোষকবিশিষ্ট পায়খানা ৪.১৫ এবং ৪.১৬ চিত্রে প্রদর্শন ও বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. স্যানিটারি পায়খানা : ইংরেজি স্যানিটারি কথাটির বাংলা অর্থ স্বাস্থ্যসম্মত। এ পায়খানায় পরিবাহিত মলমূত্র কংক্রিট নির্মিত আধারের মধ্যে জমা হয় বলে পার্শ্ববর্তী এবং মাটির নিচে দূষণ ঘটাতে পারে না। ফলে এর দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ পানিও দূষিত হয় না। স্যানিটারি পায়খানার বর্ণনা নিম্নরূপ :

ক. অ্যাকোয়া প্রিভি : এটি এক প্রকার স্যানিটারি পায়খানা। এই পায়খানার প্যানটি যেখানে বসানো হয়, সেটি সেপটিক ট্যাংকের মতো করে প্রস্তুত করা হয়।

এই ট্যাংকটি ইট ও কংক্রিটের গাঁথুনি দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। এ ট্যাংক বা কক্ষটির মেঝেও কংক্রিটের। পায়খানা ঘরটি সরাসরি কক্ষের উপরেই নির্মিত। এটি আর. সি. সি. (R.C.C) দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং মেঝেতে শঙ্কু (Shanku) আকারের প্যান বসানো থাকে।

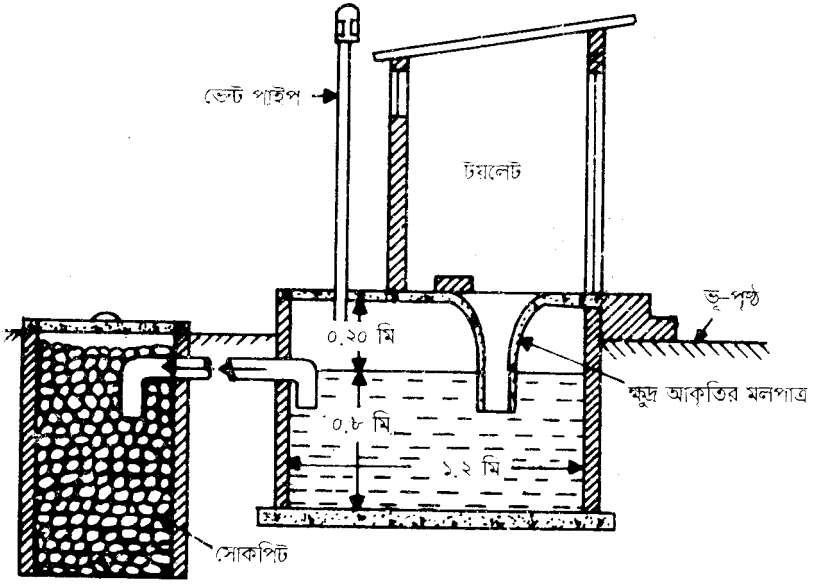

৪.১৮ : অ্যাকেয়া প্রিভি পায়খানা।

এই প্যানের নিচের সরু দিকটি সরাসরি লম্বভাবে কক্ষের পানিতে ডুবানো থাকে। ফলে, দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস কক্ষ থেকে পায়খানা ঘরে যেতে পারে না। কক্ষের ঢাকনার প্রায় ১৫ সে.মি. নিচে একদিকের দেয়ালে একটি নির্গম নল এবং ৪.১৭ চিত্রের ন্যায় পায়খানা ঘর সংলগ্ন একটি গ্যাস পাইপ সংযুক্ত থাকে।

পায়খানাটি প্রথম ব্যবহারের পূর্বে কক্ষটিতে পানি ভর্তি করে নিতে হয়। কক্ষের মধ্যে এক প্রকার জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে মলের শোষণ ঘটে। এর ফলে মলের কঠিন অংশের শতকরা ৭৫ ভাগই তরল ও গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। তরল অংশ নির্গমন পথ দিয়ে সোকপিট দ্বারা শোষিত হয় এবং গ্যাসের ভেন্ট পাইপ (Vent pipe) দিয়ে গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। অবশিষ্ট কর্দমাক্ত অংশ কক্ষের মধ্যে পানির নিচে স্লাজ আকারে জমা হয়। এ স্লাজগুলো এক বা দুই বছর অন্তর পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। এ পায়খানা স্বাস্থ্যকর কিন্তু খরচ তুলনামূলকভাবে একটু বেশি পড়ে।

খ. সেপটিক ট্যাংক পায়খানা : এ ধরনের পায়খানা অনেকটা অ্যাকোয়া প্রিভি পায়খানার মতোই। পার্থক্য হলো এতে পায়খানা প্যানের নিচে সাধারণত মল ধারণের কোনো ট্যাংক বা কক্ষ থাকে না। এই সেপটিক ট্যাংকটি পায়খানা ঘরের বাইরে, সিঁড়ি ঘরের নিচে অথবা পার্শ্ববর্তী স্থানে নির্মাণ করা হয়। পায়খানার প্যানটি পায়খানা ঘরের মেঝেতে বসানো থাকে এবং পাইপের সমন্বয়ে মলমূত্র সেপটিক ট্যাংকে জমা হয় এবং সেখান থেকে রাসায়নিক ক্রিয়ায় মল ভেঙ্গে যায়। ফলে, ভেন্ট পাইপের মধ্য দিয়ে গ্যাস বাইরে চলে যায় এবং মল মিশ্রিত পানি পাইপের মধ্য দিয়ে সোকপিটে শোষিত হয়। স্লাজগুলো বড় ট্যাংটিতেই জমা থাকে এবং ৫–৬ বছর পর পর এ স্লাজ পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়।

এ ধরনের পায়খানা সবচেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। এ পায়খানা ব্যবহারের পর পানি দ্বারা ফ্লাশ করলে এতে কোনো দুর্গন্ধ হয় না, বাতাস, ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত হয় না।

গ্রামে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (Rural Water supply System) : পানি প্রকৃতির দান। পানি ছাড়া জীবন বাঁচে না, তাই এর অপর নাম জীবন। পানিকে দু'ভাবে আমরা পেয়ে থাকি। যেমন : ভূ উপরিভাগের পানি (surface water) এবং ভূ-তলের পানি (ground water)। গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে বাড়িঘর অবস্থিত এবং বাড়ির এদিক ওদিক ক্ষেত খামারের আবাদ থাকে। তাই গ্রামে পানি সরবরাহের বা সংগ্রহের জন্য পুকুর, নদী, খাল, কূপ প্রভৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। তবে গ্রামে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য নিম্নবর্ণিত নলকূপ ও পাম্পের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন :

(১) অগভীর নলকূপ বা টিউবওয়েল (Low Lift pump or tubewell),

(২) গভীর নলকূপ (Deep tubewell)।

(ক) সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প (Centrifugal pump) এবং

(খ) টারবাইন পাম্প (Turbine pump)।

পূর্বে গ্রামের অধিকাংশ ছোট বাড়িতে কূপ এবং বড় বাড়িতে ইন্দারা ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এ পানি খোলা অবস্থায় থাকে বলে এতে ময়লা মিশে যায়। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষ

কূপের পরিবর্তে টিউবওয়েল বা নলকূপ ব্যবহার শুরু করে। কারণ, নলকূপে পানি মাটির ২৫ থেকে ৫০ মিটার নিচু থেকে উত্তোলিত হয়। এতে কোনো রোগ জীবাণু মিশ্রিত হবার ভয় থাকে না। হাতলে চাপ দিয়ে পানি তোলা হয়। এটি এক প্রকার লিফট পাম্প। হাতল, ব্যারেল, পিস্টন বা প্লাঞ্জার, বাকেট গ্রহণ নল, বাকেট ভালভ, ফুট ভালভ প্রভৃতির সমন্বয়ে এ লিফট পাম্প কাজ করে। এ পাম্পকে সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠের উপরে অথবা নিচে স্থাপন করা হয়।

ধনী কৃষকের বাড়িতে লিফট ও ফোর্স উভয় প্রকার পাম্প ব্যবহৃত হয়। ফোর্স পাম্প (force pump) বৈদ্যুতিক মটর দ্বারা চালিত হয়। এ পাম্প দ্বারা ফসলের ক্ষেতে পানি সরবরাহ করা হয়, পাইপের মধ্য দিয়ে সরবরাহ করে এই পানি গোসলখানা, পায়খানা, রান্নাঘর, বেসিনেও ব্যবহার করা হয়। ৪.১৯ চিত্রে গ্রামে ফসলের ক্ষেতে পানি সরবরাহকারী সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প দেখানো হয়েছে।

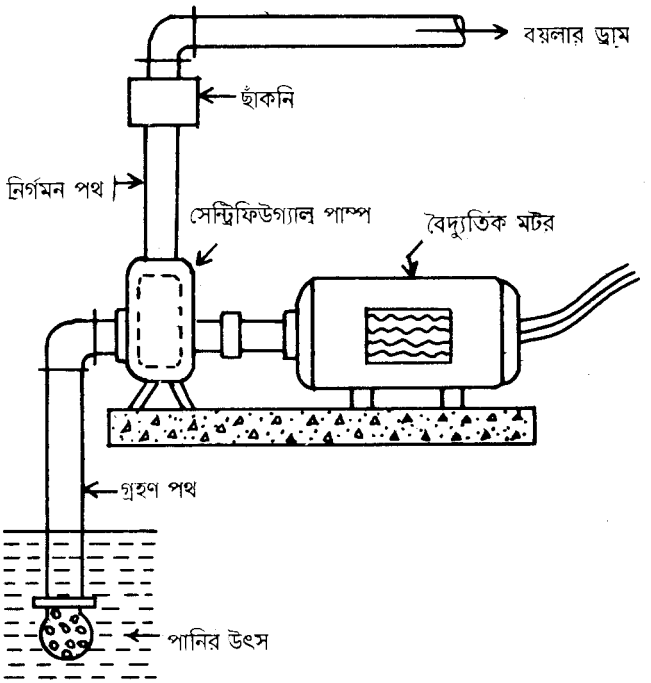

চিত্র ৪.১৯ : ফসলের ক্ষেতে ও বাড়িতে পানি সরবরাহকারী সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প।

গ্রামে সহজে প্রাপ্ত নদীর পানি, পুকুর ও খালবিলের পানি দিয়ে অনেকে থালা-বাসন ধোয়া, গোসল করা এবং রান্নার কাজ করে থাকে। এ পানি রোগজীবাণু বহন করে বিধায় ফুটিয়ে খেলে অসুবিধা নেই। কিন্তু ফুটিয়ে না খেলে এ পানি দ্বারা আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

৪.১৬ শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (Urban water supply system)

গ্রামে উচ্চ দালানকোঠা না থাকায় সাধারণ পাম্প নলকূপ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শহরে উচ্চ দালানকোঠার জন্য টিউবওয়েল বা নলকূপ ছাড়াও ফোর্স পাম্প ব্যবহার করা হয়। সাধারণত বৈদ্যুতিক মোটর চালিত পাম্পকেই ফোর্স পাম্প, সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এসব পাম্পের ধাক্কায় পানি একশ তলা বা তার চেয়েও উঁচু স্থানে সরবরাহ করা হয়।

সুতরাং শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণিত পাম্প ব্যবহৃত হয়।

১. নলকূপ (Tube well),

২. রেসিপ্রোকেটিং পাম্প (Reciprocating pump),

৩. নিমজ্জিত প্রকৃতির সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প (Deep well or Submersible type centrifugal pump),

৪. টারবাইন পাম্প (Turbine pump) প্রভৃতি।

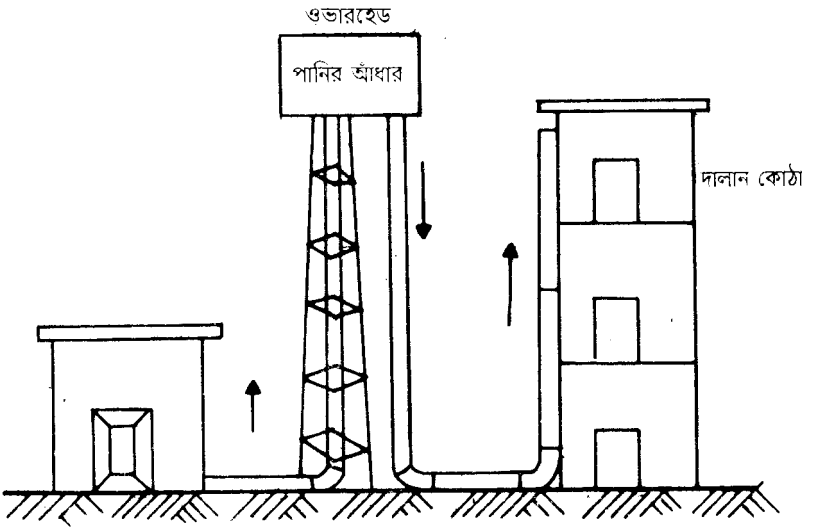

চিত্র ৪.২০ : ফোর্স পাম্প দ্বারা টাওয়ারে পানি তুলে সেখান থেকে পানি সরবরাহ করার পদ্ধতি।

দুই অথবা ততোধিক তলাবিশিষ্ট দালানকোঠায় পানি তুলতে রেসিপ্রোকেটিং পাম্প, নিমজ্জিত প্রকৃতির সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প অথবা টারবাইন পাম্প ব্যবহৃত হয়। কম জনসংখ্যা এবং চার-পাঁচতলা বিল্ডিং এর জন্য রেসিপ্রোকেটিং পাম্প, তার চেয়ে অধিক লোকজনের জন্য নিমজ্জিত প্রকৃতির সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প, উঁচু দালানকোঠায় অধিক

সংখ্যক লোকের জন্য পানি সরবরাহ এবং সর্বোপরি ১০০ থেকে ২০০ মিটার মাটির তলদেশ থেকে পানি উত্তোলনের জন্য টারবাইন পাম্প ব্যবহৃত হয়।

এ ধরনের পাম্পের সমন্বয়ে মাটির নিচ থেকে পানি তুলে বড় আধারে জমা করা হয়। শহর এলাকায় লোকসংখ্যা হিসাবে জায়গায় জায়গায় পানি সরবরাহের আধার (water tank) নির্মাণ করা হয়। সে আধার থেকে মোটা এবং পরে সরু পাইপের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকা ও বাড়িতে পানি সরবরাহ করা হয়। ৪.২০ চিত্রে এরূপ ফোর্স পাম্পের সমন্বয়ে টাওয়ারের পানির আধারে পানি জমা করা হয় এবং সেখান থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও পানির চাপে বিভিন্ন এলাকায় পানি সরবরাহ প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। তবে, বড় বড় শহরে পানি সরবরাহের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানি বিশুদ্ধ করে সরবরাহ করা হয়।

পানি বিশুদ্ধকরণ (Water treatment) : বাতাস ও পানি দ্বারা রোগজীবাণু অধিক হারে ছড়ায়। তাই, বাতাস ও পানি দূষণ থেকে সতর্ক থাকলে অনেক সংক্রামক রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। নলকূপ এবং গভীর নলকূপের পানি বিশুদ্ধ তাই এ পানি উঠিয়ে আমরা অনায়াসে পান করতে পারি। সমুদ্র, নদী, খালবিল ও পুকুরের পানি প্রভৃতিতে নানারকম ক্ষতিকারক পদার্থ থাকে। এসব পানি বিশুদ্ধ না করে পান করা ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়। আবদ্ধ পুকুরের পানি একটি স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে উঠিয়ে আমরা সে পানির গুণাগুণ খালি চোখেই যাচাই করতে পারি। সে পানি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করলে তাতে হাজার হাজার কীটপতঙ্গ দেখতে পাওয়া যাবে।

পানিকে বিশুদ্ধ করার জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়। যেমন :

১. ছাঁকন প্রণালি (Filtration System),

২. থিতানো প্রণালি (Sedimentation process),

৩. বাষ্পীভবন প্রণালি (Evaporation system),

৪. রাসায়নিক প্রণালি (Chemical system) প্রভৃতি।

এগুলোর মধ্যে ছাঁকন ও থিতানো প্রণালি একবারে কাঁচা পদ্ধতি। ছাঁকন পদ্ধতিতে পানিতে উপস্থিত ময়লা কাপড়, কাঁকর, বালি প্রভৃতিতে আটকে যায় এবং থিতানো পদ্ধতিতে পানিতে ফটকিরি মিশালে ময়লা ও কাদামাটি পাত্রের তলায় জমে। কিন্তু সে পানির মধ্যে সূক্ষ্ম জীবাণু থেকেই যায়। বাষ্পীভবন বা পাতন প্রণালিতে পানিকে একটি পাত্রে উত্তপ্ত করা হয়। পানিকে উত্তপ্ত করে ঠাণ্ডা করার পর সে পানি অনায়াসে পান করা যায়। শহরের অধিকাংশ লোক নলকূপের পানি সংগ্রহ করতে না পারলে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানিকে বিশুদ্ধ করে সে পানি পান করে থাকে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পানি পরিশোধন করতে হলে নদী অথবা জলাশয়ের পানি একটি বড় বেসিনের মধ্যে নিয়ে পর্যায়ক্রমে তার মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্য মিশানো হয়। পানিতে যেসব ময়লা ও অপদ্রব্য উপস্থিত থাকে, তা নিম্নরূপ :

(i) জীবাণু (Bacteria), ক্ষেত্রবিশেষে এটি অপকার ও উপকার করে,

(ii) দ্রবীভূত গ্যাস (Dissolved gases),

(iii) আয়রন বা লৌহঘটিত উপাদান, ম্যাঙ্গানিজ (Manganese) এবং এদের লবণ,

(iv) রং (Colour),

(v) দ্রবীভূত অজৈব ময়লা (Dissolved inorganic impurities) প্রভৃতি।

ক. পানি থেকে জীবাণু নাশ করা, এটি দুভাবে করা যায় :

(i) চরম পদ্ধতি হিসেবে ক্লোরিন গ্যাসের প্রয়োগ (By chlorination as a major process) এবং

(ii) মাইনর বা হালকা পদ্ধতি হিসেবে অন্যান্য পদ্ধতির প্রয়োগ (By miscellanious method or minor scales)।

খ. (i) রং, গন্ধ এবং স্বাদ দূর করা (Removal of colour, odour and taste)

(ii) লৌহঘটিত পদার্থ ও ম্যাঙ্গানিজ দূরীকরণ (Removal of iron and manganese) এবং

(গ) মৃদু পানিতে রূপান্তর।

পানিতে যে জীবাণুগুলো উপস্থিত থাকে, তাকে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া (Pathogenic bacteria) বা রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু বলে। পানি বিশুদ্ধ করতে এবং জীবাণু নাশ করতে তাই পানিতে ক্লোরিন মিশানোর প্রয়োজন হয়। এটিকে পরিমাণ মতো মিশালে পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদ (Colour, odour and taste) সবই অক্ষুণ্ন থাকে। পানিতে ক্লোরিন (Cl_2) মিশানোতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পরিষ্কার পানি পাওয়া যায়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$HOCl + NC_3 = NH_2CI + H_2O \text{ (মনোক্লোরোমাইন) এবং}$$

$$2HOCl + NH_3 = NHCl + 2H_2O \text{ (ডাইক্লোরোমাইন)}$$

ঢাকা জেলার ডেমরাতে যে পানি বিশোধন প্রকল্প (Dhaka-Demra water treatment project) রয়েছে, সেখানে বুড়িগঙ্গা নদীর পানিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই বিশুদ্ধ করা হয়।

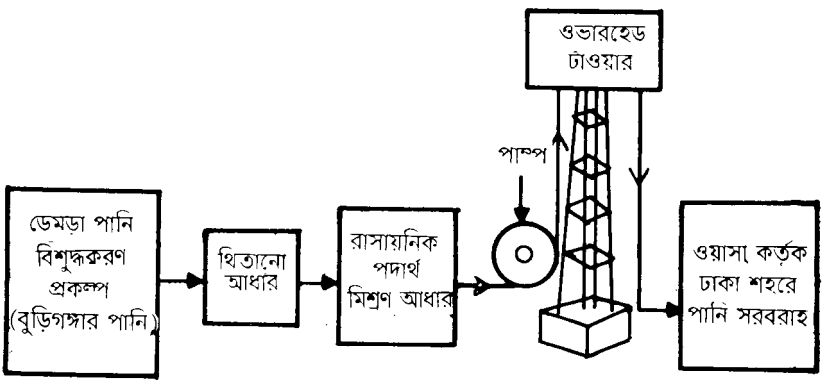

চিত্র ৪.২১ : ঢাকা-ডেমরা প্রকল্পে পানি বিশোধনে ওয়াশা কর্তৃক পানি সরবরাহের রেখাচিত্র।

ডেমরা পানি বিশোধন প্রকল্পে প্রথমে পানিকে একটি প্রকাণ্ড আধারে থিতানো হয় এবং সে আধারের নিচে কিছু ময়লা আটকে যায়। পরবর্তী আধারে পানির সাথে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশানো হয়। সোডা-এসিড, ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরিন প্রভৃতি মিশানোর ফলে পানি থেকে জীবাণু এবং অন্যান্য ময়লা দূরীভূত হয়। পরিষ্কার পানিকে পাম্পের ধাক্কায় ওভারহেড ট্যাংকের বা টাওয়ার-এ তোলা হয়। সেখান থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ করা হয়। এ সরবরাহকৃত পানি ভূ-উপরিস্থিত আধারে এসে জমা হয় এবং নিজস্ব পাম্প দ্বারা পানি ওভারহেড আধারে উঠানো হয়।

ঢাকা ওয়াসা পানি বিশোধন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ৪.২১ চিত্রে ঢাকা-ডেমরা প্রকল্পে পানি বিশোধনে ওয়াসা কর্তৃক পানি সরবরাহের সাধারণ রেখাচিত্র দেখানো হয়েছে।

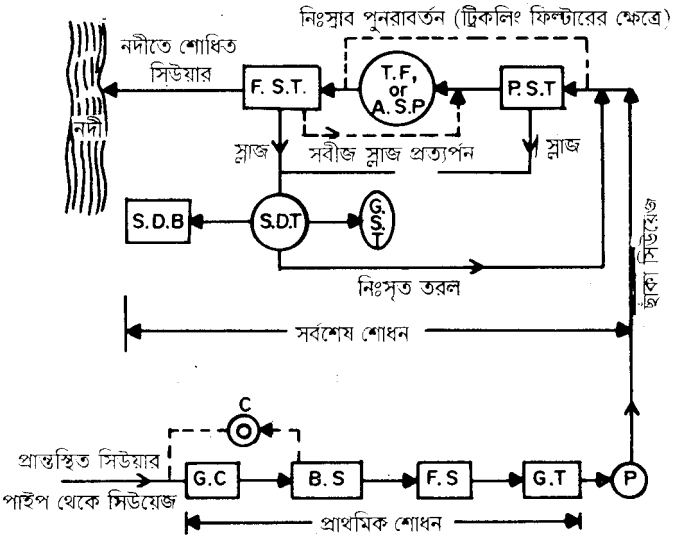

GC —কাঁকর দূরীকরণ কক্ষ
B.S — মোটা ছাঁকনি
F.S — সরু ছাঁকনি
C —কমিউনিটর
G.T — তেল ট্র্যাপ
P — পাম্প
P.S.T - প্রাথমিক অবক্ষেপ কক্ষ
T.F — অনুস্রবণ ফিল্টার
A.S.P — সবীজ স্লাজ শোধন কক্ষ
F.S.T - সর্বশেষ অবক্ষেপ কক্ষ
S.D.T - স্লাজ পরিপাক কক্ষ
S.D.B - স্লাজ শুষ্ককরণ কক্ষ
G.S.T - গ্যাস মজুদ কম

চিত্র ৪.২২ : একটি আদর্শ সিউয়েজ শোধনাগার-এর রেখাচিত্র প্রদর্শন।

৪.১৭ সিউয়েজ শোধন (Sewage treatment)

মলমূত্র মিশ্রিত ময়লা পানিকে সিউয়েজ বলা হয়। এই পানি বিশুদ্ধ করে নদীর পানির সাথে ... **বাড়ি, কলকারখানা,** *অফিস-আদালত, হাসপাতাল, সিনেমা*

হল এবং বাজার এলাকার মলমূত্র ও অন্যান্য ময়লাযুক্ত পানি বিভিন্ন নলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই সিউয়েজকে প্রয়োজনমতো শোধন করে নদী, সমুদ্র, জলাশয় বা অন্য কোনো খালে ফেলা হয়। সিউয়েজের মধ্যে পানি ৯৯.৯% এবং ভাসমান কঠিন কণা থাকে ০.১%।

সিউয়েজ শোধন না করে, সরাসরি ঐসব জায়গায় অপসারণ করলে পানি আরও দূষিত হতে পারে. সিউয়েজ শোধনের মাধ্যমে ময়লা পানি থেকে দুর্গন্ধ উৎপাদনকারী ও ক্ষতিকারক উপাদানকে দুর্গন্ধহীন অবস্থায় রূপান্তর করা হয়। এতে নদী বা জলাশয়ের পানি বিশুদ্ধ থাকে যাতে জনস্বাস্থ্য রক্ষিত হয়।

৪.২২ চিত্রে একটি আদর্শ সিউয়েজ শোধনাগারের রেখাচিত্র দেখানো হয়েছে।

সিউয়েজ শোধনের জন্য দুটি ধাপ রয়েছে, যেমন :

১. প্রাথমিক শোধন (Primary treatment) এবং

২. মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত শোধন (Secondary or Final treatment)।

এ দুটি শোধন পদ্ধতির বর্ণনা নিম্নরূপ :

১. প্রাথমিক শোধন (Primary treatment) : এ শোধন পদ্ধতির মাধ্যমে সিউয়েজের সাথে অজৈব কঠিন পদার্থ, যেমন : পাথরকুচি, কাঁকর, বালি, কাদামাটি এবং তার সাথে তেল, চর্বি, গ্রিজ জাতীয় পদার্থ দূর করা হয়। এ কাজের জন্য এ পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে কাঁকর ও পাথরকুচি দূরীকরণ কক্ষ, মোটা ছাঁকনি, সরু ছাঁকনি, স্কিমিং ট্যাংক এর সংযোগ থাকে। এগুলোর মধ্য দিয়ে সিউয়েজকে প্রবাহিত করে একে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত শোধনাগারে প্রেরণের উপযুক্ত করা হয়।

২. মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত শোধন (Secondary or Final treatment) : প্রাথমিক শোধন প্রকোষ্ঠ থেকে আগত ছাঁকা সিউয়েজকে মাধ্যমিক শোধনের প্রাথমিক থিতানো প্রকোষ্ঠে ঢুকানো হয়। এখানে, অপেক্ষাকৃত ভারি অথচ থিতানো যোগ্য সঠিক পদার্থ তলদেশে স্লাজ বা কাদার আকারে থিতিয়ে পড়ে। স্লাজের উপরের অধিকতর স্বচ্ছ তরল পদার্থ অপেক্ষাকৃত হালকা ও সূক্ষ্ম কলোয়েড কণা দিয়ে পরবর্তী শোধন কক্ষ বা ট্রিকলিং শোধনাগার (trickling filter) অথবা সজীব স্লাজ কক্ষে (activated sludge plant) বিয়োজনের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত হয়। এরপর বিয়োজিত তরল একটি থিতানো প্রকোষ্ঠে উপনীত হয়। এখান থেকে নির্গত তরল পদার্থ প্রায় ৮০% থেকে ৯০% বিশুদ্ধ হয়। ফলে, এ তরলকে সরাসরি নদী বা অন্য কোনো জলাশয়ে নিষ্কাশন করা যায়।

৪.১৮ বাতাস ও পানির গুণগতমানের বিশ্লেষণমূলক ধারণা (Analytical concepts on air and water quality)

বাতাসের মধ্যে মূলত ৭৮.০৮৪% নাইট্রোজেন (N_2), ২০.৯৪৬% অক্সিজেন (O_2). ০.৯৩৪% আর্গন (A), ০.০৩৩% কার্বন ডাই–অক্সাইড (CO_2) এবং অবশিষ্ট ০.০০৩% নিয়ন (Ne), হিলিয়াম (He), ক্রিপ্টন (Kr), জেনন (Xe), হাইড্রোজেন (H_2), মিথেন (CH_4) এবং নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) থাকে। বাতাসে বিভিন্ন গ্যাস ব্যতীত দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো জলীয় বাষ্প। জলীয় বাষ্পের অণুগুলো নাইট্রোজেন বা অক্সিজেন গ্যাসের অণুগুলোর মতোই

বাতাসে ঘোরে। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঋতু অনুসারে এবং অঞ্চল হিসেবে কম বেশি হয়ে থাকে।

বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ওজোন (O_3) গ্যাস অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। এ গ্যাস বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ওজোন গ্যাসটি সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে। বায়ুমণ্ডলীয় বাতাসকে বিভিন্ন পরীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করলে এ তথ্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা জন্মে।

পানি গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন (H_2) এবং অক্সিজেন (O_2)। দুটি হাইড্রোজেন অণু এবং একটি অক্সিজেন অণু মিলে একটি পানির কণা গঠিত হয়। তদুপরি পানি স্বল্প পরিমাণে খনিজ পদার্থ, ক্লে-সয়েল (clay soil), রোগজীবাণু, দ্রবীভূত গ্যাস (dissolved gases), জৈব এসিড (organic acids) প্রভৃতি ধারণ করে। পানিকে বিভক্ত করলে নিম্নবর্ণিত গুণাগুণগুলো পাওয়া যায়। যেমন :

ক. পাহাড়ি এলাকায় প্রবাহমান পানিতে খুব অল্প সবজিকণা বিদ্যমান থাকে।

খ. ঝর্ণার পানির মধ্যে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

গ. পলিমাটির সংস্পর্শে প্রবাহিত হলে পানি ক্লে-সয়েল বা কাদা পজিকল গ্রহণ করে।

ঘ. পানির প্রবাহ যখন কোনো কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন সেটি জীবাণু মিশ্রিত দ্রব্য ধারণ করে।

ঙ. পানি যখন সবজিকণা ধারণ করে, তখন এর রং পরিবর্তিত হয় এবং স্বাদ ও গন্ধও পরিবর্তিত হতে দেখা যায়।

চ. পানি যখন কোনো ঘনবসতি এলাকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন সেটি ময়লা পানির সাথে মিশে দূষিত হয়ে যায়।

ছ. শহর থেকে যখন সিউয়েজ প্রবাহিত হয় এবং যদি বিশোধনের মাধ্যমে পানিকে পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত করা না হয়, তাহলেও সে প্রবাহিত পানি জনস্বাস্থ্যের জন্য ত্রুটিমুক্ত থাকে না।

সে কারণে শোধনাগারে পানি বিশুদ্ধ করে তার মধ্যে উন্নত উপাদান বা উপাদানসমূহ মিশাতে হয়। বাতাস এবং পানির মধ্যে উপস্থিত উপাদানগুলোর পরিমাণ জানার জন্য নিম্নবর্ণিত উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন :

১. **ভৌত পরীক্ষা** (Physical test) : এ পরীক্ষার মাধ্যমে বায়বীয় ও তরল পদার্থের তাপমাত্রা, বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ জানা যায়।

২. **রাসায়নিক পরীক্ষা** (Chemical test)

ক. বায়বীয় ও তরল পদার্থের অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয়,

খ. পানির মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করতে রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা (Chemical Oxygen demand) পরীক্ষা করা হয়। বাতাসে উপস্থিত অক্সিজেনের পরিমাণও সি. ও. ডি (COD) পদ্ধতি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

গ. জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (Biochemical Oxygen Demand or B.O.D.) পরীক্ষণ প্রণালিতে বাতাসে ও পানির মধ্যে উপস্থিত রোগজীবাণুর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়।

ঘ. বাতাস ও পানির মধ্যে উপস্থিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এ পরীক্ষার মাধ্যমে বাতাস ও পানির দূষণ কতটুকু তা ধরা পড়ে।

ঙ. পানির অম্ল (Acid) এবং ক্ষার (Base) ধর্ম যাচাই এর জন্য পানির পি.এইচ. (pH) পরীক্ষা করা হয়। pH-এর মান পানিতে দ্রবীভূত হাইড্রোজেন আয়ন (H^+ আয়ন) এর পরিমাণ নির্দেশ করে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization or WHO) জীবজন্তুর জীবন ধারণের উপর বাতাস ও পানির আদর্শ গুণগত মান নির্ধারণ করেছে। আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এ মান বাস্তবায়নে সচেষ্ট। পানি ও বায়ুর গুণগত আদর্শ মানের সারণি নিচে দেয়া হলো :

পানির গুণগত আদর্শমান

ক্র.নং.	উপস্থিত দূষক	দূষকের পরিমাণ	একক	মন্তব্য
১.	অজৈব উপাদান : আর্সেনিক (As)	০.০৫০	মি:গ্রা:/লিটার	এটি এক লিটার পানির ক্ষেত্রে
২.	বেরিয়াম (Ba)	০.০০০	মি:গ্রা:/লিটার	
৩.	ক্যাডমিয়াম Cd)	০.০৫০	মি:গ্রা:/লিটার	
৪.	ক্রোমিয়াম Cr)	০.০৫০	মি:গ্রা:/লিটার	
৫.	ফ্লোরাইড (F)	০.০৫০	মি:গ্রা:/লিটার	
৬.	সীসা (Pb)	০.০০১	মি:গ্রা:/লিটার	
৭.	পারদ (Hg)	১০.০০০	মি:গ্রা:/লিটার	
৮.	সিলভার (Ag)	০.০০০	মি:গ্রা:/লিটার	
৯.	ক্লোরাইড (Cl)	২৫০.০০	মি:গ্রা:/লিটার	
১০.	রঙ	১৫.০০	মি:গ্রা:/লিটার	
১১.	তামা	১.০০	মি:গ্রা:/লিটার	
১২.	লোহা (Fe)	০.৩০	মি:গ্রা:/লিটার	
১৩.	পি.এইচ (pH)	৭.৫ ± ১	মি:গ্রা:/লিটার	
১৪.	কঠিন ভাসমান পদার্থ	১০.০০	মি:গ্রা:/লিটার	

বাতাসের গুণগত আদর্শমান : জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা প্রভৃতির জন্য আদর্শমান দরকার। স্বল্প প্রশ্বাসের জন্যও আদর্শমান সম্পন্ন বাতাসের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশের মূল উপাদান হচ্ছে : বাতাস, পানি ও মাটি। বাতাসের গুণগত আদর্শমান নিম্নরূপ যা পরিবেশগত সংরক্ষণ সংস্থা (Environmental Protection Agency) কর্তৃক নির্ধারিত :

বাতাসের উপাদান (Element of Air)		উপাদানের ঘনত্ব (Density of element)	মন্তব্য
	Pg/m^3	ppm	
১. কণা (Dust)	৭৫ ২৬০	-- --	বাৎসরিক জ্যামিতিক গড় ২৪ ঘণ্টা
২. SO_2	৮০ ৩৬৫	০.৮৩ ০.১৪	বাৎসরিক গড় ২৪ ঘণ্টা
৩. CO	১০০০০ ৪০০০০	০৯ ৩৫	৮ ঘণ্টা (বছরে ১ বার) ১ ঘণ্টা (বছরে ১ বার)
৪. NO_x	১০০	০.০৫	বাৎসরিক
৫. OZONE	২.৩৫	০.১২	১ঘণ্টা (বছরে ১ বার)
৬. নন-মিথেন হাইড্রোকার্বন	১৬০	০.২৫	৬-৯ ঘণ্টা (বছরে ১ বার)
৭. সীসা (Lead)	১.৫	--	৩ মাসে গড়ে
	উৎস : এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি।		

৪.১৯ পরিবেশের গুণগত আদর্শমান (Environmental Quality Standard)

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের জৈব সম্পদকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা, বেড়ে উঠা, স্বাচ্ছন্দে চলাফেরার নিশ্চয়তার জন্য পরিবেশের গুণগত আদর্শ মান বজায় থাকা প্রয়োজন। পরিবেশের এই গুণগত আদর্শমানের শর্তগুলো নিম্নরূপ :

(১) বিশুদ্ধ পানি (Clean Water) : জৈব সম্পদের জন্য বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন হয়। অন্যথায়, রোগে ব্যাধিতে জীবন বিপন্ন হয়। সে কারণে পানির অপর নাম জীবন।

(২) বিশুদ্ধ বাতাস (Clean air) : জৈব সম্পদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য মুক্ত বাতাস অপরিহার্য। অন্যথায়, জীবন বিপন্ন হয়। চাঁদে বাতাস ও পানির অস্তিত্ব নেই বলে সেখানে জীব বাঁচতে পারে না।

(৩) পুষ্টিকর খাবার (Nutritions food) : জৈব সম্পদের জীবন ধারণ, বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজন। অন্যথায়, রোগে-শোকে জীবনহানী ঘটে।

(৪) **সুষ্ঠু পরিবেশ** (Normal environment) : আবহাওয়া ভালো থাকলে জৈবিক সম্পদ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে। যেমন অতি ঠাণ্ডা, অতি গরম, অতি বৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদিতে জীবনহানী ও পরিবেশ বিপন্ন হয়।

(৫) **মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা** : অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা। সভ্য সমাজে চলতে এবং বেঁচে থাকতে মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা থাকতে হয়। অন্যথায়, জনজীবন বিপন্ন ও দুর্বিষহ হয়।

(৬) **যথাযথ যোগাযোগ মাধ্যম** (Appropriate Communication) : মানুষ একা বাঁচতে পারে না। তার জন্য মানুষে মানুষে যোগাযোগের রাস্তাঘাট, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, আদান-প্রদান, সংস্কৃতি বিনিময় প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। অন্যথায় পরিবেশের আদর্শ মান ব্যাহত হয়।

(৭) **অসামাজিক কার্যকলাপ রোধ** (Protection of uncivilized work) : মদ, গাঁজা, হেরোইন, ফেনসিডিল, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি রোধ করতে পারলে সামাজিক জীবনযাত্রার মান বাড়ে। অন্যথায়, সমাজ ও দেশ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। দূষণ (Pollution) কি?

উত্তর : ক্ষতিকর কোনো কিছুর উপস্থিতিকেই দূষণ বলে। যেমন : মলমূত্র, ধুলাবালি, ক্ষতিকর গ্যাস ইত্যাদি।

২। আর্সেনিক (Arsenic) কি?

উত্তর : আর্সেনিক এক প্রকার বিষ। এটি নলকূপের পানির সাথে উঠে আসে এবং তা ব্যবহারকারী মানুষজন আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

৩। ওজোন গ্যাস (O_3) কি?

উত্তর : ওজোন গ্যাস বায়ুমণ্ডলের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু পরিমাণের তুলনায় বেশি থাকলে ক্ষতির কারণ হয়। বাতাসের মধ্যে এ গ্যাসের পরিমাণ থাকা উচিত ০.১২ পি.পি.এম। এটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশকৃত সূর্যরশ্মির অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে।

৪। শব্দ দূষণ কখন ঘটে?

উত্তর : মোটরযান, রেলগাড়ি, মেশিনগান, বিমান প্রভৃতি চলার শব্দে শব্দ দূষণ ঘটে, যার মাত্রা ৯০ থেকে ১৯০ ডেসিবেল পর্যন্ত হয়।

৫। পাঁচটি দূষিত শিল্প কারখানার নাম লিখ।

উত্তর : পাঁচটি দূষিত শিল্প কারখানার নাম হলো : এসবেসটস (asbestos), সিমেন্ট (cement), সিরামিক (ceramic), রাসায়নিক (chemical), কয়লা (coal) শিল্প প্রভৃতি।

৬। পেস্টিসাইড (Pesticides) ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া কি?

উত্তর : পেস্টিসাইড ব্যবহারের সুবিধা হলো এটি ব্যবহারে ক্ষতিকর পোকামাকড়, ইঁদুর ইত্যাদি মারা যায়। আবার এটি দ্বারা উপকারী পশুপাখি, কীটপতঙ্গ মারা যায় যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

৭। কম্পোজড (Composed) সার কি?.

উত্তর : কচুরিপানা ও বর্জ্য পদার্থ নির্দিষ্ট সময়ে মাটির নিচে চাপা দিয়ে রাখলে এগুলো পচে কম্পোজড সার প্রস্তুত হয়।

৮। বর্জ্য (waste) কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : বর্জ্য চার প্রকার, যথা :

(ক) গ্রামীণ (Rural) বর্জ্য, (খ) পৌর (municipal) বর্জ্য, (গ) শিল্প (industrial) বর্জ্য এবং (ঘ) পারমাণবিক (nuclear) বর্জ্য।

৯। গ্রামে-গঞ্জে কি কি ধরনের পায়খানা ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : গ্রামে-গঞ্জে নিম্নবর্ণিত চার ধরনের পায়খানা ব্যবহৃত হয়, যেমন :

(ক) কাঁচা পায়খানা, (খ) কুয়ো পায়খানা, (গ) কম্পোস্টিং পায়খানা ও (ঘ) দুটি শোষক গহ্বরবিশিষ্ট পায়খানা প্রভৃতি।

১০। স্বাস্থ্যসম্মত ও দুর্গন্ধবিহীন পায়খানা কোনটি?

উত্তর : স্যানিটারি পায়খানা, এটি আবার দুই প্রকার, যথা :

(ক) অ্যাকোয়া প্রিভি (aqua privy) এবং (খ) সেপটিক ট্যাংক (septic tank) পায়খানা।

১১। পানিকে কিভাবে বিশুদ্ধ করা হয়, লিখ।

উত্তর : পানিকে নিম্নবর্ণিত চারটি পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ করা হয়, যেমন :

(ক) ছাঁকন প্রণালি, (খ) থিতানো প্রক্রিয়া, (গ) বাষ্পীভবন প্রণালি এবং (ঘ) রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

১২। সিউয়েজ কি এবং এটি কিভাবে শোধন করা হয়?

উত্তর : মলমূত্রকে সিউয়েজ বলে। এটিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শোষণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপাদান আলাদা করে শোধন করা হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। পরিবেশ দূষণ (Environmental pollution) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : আমাদের বসতবাড়ি, অফিস-আদালত, রাস্তাঘাট প্রভৃতি এলাকায় বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস, মলমূত্র, থুথু, কফ, আর্সেনিক, পেস্টিসাইড, তেজস্ক্রিয়তা প্রভৃতি পরিবেশে বসবাস উপযোগিতা নষ্ট করলে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে। পরিবেশ দূষণ ঘটলে বাতাস, পানি, মাটি সবকিছুই দূষিত হয় এবং জীবজগতের স্বাস্থ্যহানী ও জীবনহানী ঘটে।

২। বায়ু দূষণ রোধ ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝ?

উত্তর : বায়ু দূষণ রোধ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বায়ু দুষণ রোধ করা যায়। এ ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপ :

(ক) যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করা,

(খ) থুথু কফ ফেলার জন্য বালি ভর্তি ডাস্টবিন ব্যবহারের ব্যবস্থা করা,

(গ) দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট এবং অধিক পুরাতন মোটরযান ব্যবহার বন্ধ করা,

(ঘ) পতিত জমি ও রাস্তার ধারে বনায়নের ব্যবস্থা করা,

(ঙ) পচন ও গন্ধযুক্ত দ্রব্য মাটিতে পুঁতে দেয়া বা লোকালয়ের বাইরে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা,

(চ) শিল্প কারখানার চিমনি শহরের উঁচু দালান কোঠার চেয়ে বড় করার ব্যবস্থা করা।

৩। পানি দূষণ রোধ করার উপায় কি?

উত্তর : পানি দূষণ রোধের উপায়গুলো নিম্নরূপ :

(১) খাবারের জন্য কূপ অথবা ফুটানো পানি ব্যবহার করা এবং পানি পরিষ্কার পাত্রে ঢেকে রাখা।

(২) জলাশয়ের সাথে নর্দমার সংযোগ না দেয়া।

(৩) রাসায়নিক দ্রবযুক্ত পানি জলাশয়ে না ছাড়া,

(৪) গরু–বাছুর পুকুরে গোসল না করানো,

(৫) পানির লাইনকে সিউয়েজ লাইনের পাশ দিয়ে না নেয়া,

(৬) পারমাণবিক বর্জ্য পানিতে না মিশানো,

(৭) জলাশয়ে পচা দ্রব্য ও গরম ভাতের মাড় না ফেলা ইত্যাদি।

৪। শব্দ দূষণ রোধের উপায় বর্ণনা কর।

উত্তর : শব্দ দূষণ রোধের উপায়গুলো নিম্নরূপ :

(১) কথাবার্তায় নম্রতা বজায় রাখা,

(২) মোটরযানের সাইলেন্সার পাইপে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ব্যবহার করা,

(৩) স্কুল, হাসপাতাল ও আবাসিক এলাকায় মোটরযানের হর্ন না বাজানো,

(৪) লোকালয় থেকে বাসস্ট্যান্ড দূরে রাখা,

(৫) জোর শব্দ দিয়ে টিভি/রেডিও না চালানো,

(৬) বিশ্রামের সময় মাইকিং না করা,

(৭) ঘুমন্ত লোককে তড়িঘড়ি না ডেকে তোলা,

(৮) ককটেল, হাতবোমা প্রভৃতি ফাটানোর সীমাবদ্ধতা আনয়ন করা।

৫। পাট শিল্প ও চামড়া শিল্পের তিনটি দূষণ লিখ।

উত্তর : (১) পাট শিল্পে দূষণ নিম্নরূপ :

(ক) পাটের উড়ন্ত আঁশ পরিবেশ দূষণ ঘটায়,

(খ) পাটকলের বয়লারের জ্বালানি পরিবেশ দূষণ ঘটায়,

(গ) এ শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশ দূষণ ঘটায়।

(২) চামড়া শিল্পে দূষণ নিম্নরূপ :

(ক) চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার সময় প্রচণ্ড গন্ধ পরিবেশের দূষণ ঘটায়,

(খ) চামড়া বায়ু ও পানি দূষিত করে,

(গ) এ শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশের দূষণ ঘটায়।

৬। পেস্টিসাইড ব্যবহারের তিনটি করে সুবিধা ও অসুবিধা লিখ।

উত্তর : পেস্টিসাইড ব্যবহারের তিনটি সুবিধা ও অসুবিধা নিম্নরূপ :

সুবিধা (Advantages)	**অসুবিধা** (Disadvantages)
১। পেস্টিসাইড দ্বারা ক্ষতিকর পোকামাকড়, ইঁদুর প্রভৃতি হ্রাস ও নাশ হয়।	১। পেস্টিসাইড দ্বারা পরিবেশের জন্য উপকারী কিছু কিছু পোকামাকড়ও মারা যায় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়।
২। এটি ব্যবহারে ক্ষেত পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় এবং ভালো ফলন পাওয়া যায়।	২। এটি প্রয়োগ করলে বৃষ্টি ও পানির সাথে পার্শ্ববর্তী খাল-বিল দূষিত হয় এবং মৎস্য সম্পদ বিনষ্ট হয়।
৩। ঘরবাড়িতে ইঁদুর, তেলাপোকা মারতে পেস্টিসাইড ব্যবহার করা হয়।	৩। বাড়িতে ও তরকারি ক্ষেতে পেস্টিসাইড ব্যবহার করলে খাদ্যদ্রব্যে দূষণ ঘটে।

৭। বর্জ্য পদার্থ (Waste) কত প্রকার ও কি কি? বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝ?

উত্তর : বর্জ্য পদার্থ সাধারণত চার প্রকার, যথা :

(১) গ্রামীণ বর্জ্য, (২) পৌর বর্জ্য, (৩) শিল্প বর্জ্য এবং (৪) পারমাণবিক বর্জ্য।

যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব বর্জ্য পদার্থকে একটি নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সংরক্ষণ, স্থানান্তর এবং বিপদমুক্ত করা হয় তাকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলে।

৮। স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং কি, বুঝিয়ে লিখ।

উত্তর : জনজীবনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বর্জ্য পদার্থ দ্রুত স্থানান্তর এবং সুষ্ঠু ও নিরাপদ নিষ্কাশনের পথ যে বিদ্যায় পাওয়া যায় তাকে স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। এ কাজের চারটি অংশ, যেমন :

(১) সব বর্জ্য পদার্থের সহজ ও সুষ্ঠু একত্রকরণ,

(২) বর্জ্য নর্দমা ও নিষ্কাশন পাইপের মধ্য দিয়ে নিরাপদ বহন ও শোধন,

(৩) শোধিত বর্জ্য অক্ষতিকর অবস্থায় রূপান্তর,

(৪) অপসারণ পদার্থ থেকে দূষিত গ্যাস দূরীকরণ ও বাতাস অনুকূলকরণ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। (ক) পরিবেশ দূষণ বলতে কি বুঝ?

(খ) বাতাস দূষণের কারণ কি কি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। (ক) পানি দূষণ ঘটে কি কি কারণে?

(খ) বাতাস ও পানি দূষণ কিভাবে রোধ করা যায় সংক্ষেপে লিখ।

৩। (ক) শব্দ দূষণ ও রোধের উপায় কি কি?

(খ) প্রধান প্রধান দূষিত শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত কর।

৪। (ক) বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা (waste management) বলতে কি বুঝ?

(খ) বর্জ্য পদার্থ অপসারণ (disposal of waste) ব্যবস্থা চিত্রসহ বর্ণনা কর।

৫। (ক) গ্রাম্য পায়খানা ব্যবস্থা (rural sanitation) কত প্রকার ও কি কি?

(খ) গ্রাম্য ও শহর পায়খানা ব্যবস্থায় যেটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, সেটি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

৬। (ক) গ্রামের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (rural water supply) কি কি, বর্ণনা কর।

(খ) শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (urban water supply system) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। (ক) পানি বিশুদ্ধকরণ (water purification) এর প্রয়োজনীয়তা কি?

(খ) পানি বিশুদ্ধকরণে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, লিখ।

৮। (ক) বিশ্ব পরিবেশ এবং আঞ্চলিক পরিবেশের মূল পার্থক্যগুলো কি কি?

(খ) বাতাস ও পানির গুণগত মানের বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা দাও।

৯। (ক) "একটি অঞ্চলের সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবেশ নষ্ট বা সুন্দর করার উপায়ে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে"—কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

১০। (ক) "যানজট এবং গাড়ির ধোঁয়া শহরাঞ্চলের নাগরিক জীবনের ক্ষতির ধারক"—কথাটির ব্যাখ্যা দাও।

(খ) উক্ত সমস্যা কি উপায়ে দূর করা যায় বলে তুমি মনে কর?

১১। পরিবেশের গুণগত আদর্শমান সম্পর্কে বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূ-মণ্ডল ও আঞ্চলিক পরিবেশগত বিষয়

(The Earth and the Regional Environmental affairs)

৫.১ ভূমিকা

পৃথিবী মূলত বায়ুমণ্ডলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে শূন্যে ভেসে আছে। এর অভ্যন্তরে অলৌকিভাবে মাটি, খনিজ পদার্থ, পানি, গ্যাস এবং বহির্দেশে বায়ুমণ্ডল, ভূ-ত্বক, সমুদ্র, নদী, গাছপালা, প্রাণিজগৎ ইত্যাদি রয়েছে।

আমরা এশিয়া মহাদেশে বাস করি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসী। বাংলাদেশ, ভারত, চীন, পাকিস্তান, মিয়ানমার, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ। বঙ্গোপসাগর ও হিমালয় পর্বত এসব দেশের আবহাওয়াকে প্রভাবান্বিত করে। এসব দেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। সমুদ্র, পর্বত, নদ-নদী, বনজঙ্গল ও জনপদ নিয়ে আমাদের আঞ্চলিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের প্রায় সকল নদীই হিমালয় পর্বত থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং তা কয়েকটি দেশে যেমন : চীন, নেপাল, ভারত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

তাই, এসব দেশের আবহাওয়ার সামঞ্জস্যতা আছে। একটি দেশের বাতাস ও পানিতে দূষণ ঘটলে অন্য দেশগুলোও সংক্রমিত হয়। আবার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে তা যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তবে সারা বিশ্বের পরিবেশই কলুষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ- এইডস (AIDS) রোগ প্রথমে যে কোনো এক অঞ্চলেই সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভয়াবহ সংক্রমণের কারণে তা সারা বিশ্বের মানুষকে আক্রান্ত করছে। ফলে কোনো দেশের কোনো এলাকায় মারাত্মক কিছু ঘটলে তা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনায় এনে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা প্রয়োজন। যেমন : আজকাল বিশ্বের অনেক দেশই গভীর সমুদ্রে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়, পারমাণবিক বর্জ্য নিষ্কাশন করে। এ ব্যবস্থা মোটেই বিশ্বমানবতার জন্য সুখকর নয়। পৃথিবীর একটি সমুদ্রের সাথে অন্যান্য সমুদ্রের সংযোগ আছে। এক সমুদ্রের পানি দূষিত হলে অন্য সমুদ্র ও নদীর পানিও দূষিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমায় যে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হয়, তা শুধু সে দুটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে নি। পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগোষ্ঠী বছরের পর বছর দূষিত আবহাওয়ার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তাই পৃথিবী, মহাদেশ, দেশ তথা অঞ্চলের পরিবেশ ভালো রাখতে হলে বায়ুমণ্ডল, সমাজ ও পানিকে দূষণমুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়।

৫.২ গ্রীন হাউজ (Green House)

ইংরেজি শব্দ "Green House" এর বাংলা আভিধানিক অর্থ সবুজ ঘর। শীত প্রধান অঞ্চলে শীতের দিনে অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা থাকায় সেখানে অনবরত বরফ পড়ে। গাছপালা, ফুল–ফল, শাক–সবজি কিছুই বরফের জন্য জন্মাতে পারে না। এ সময় সবুজ ঘরের মধ্যে সে দেশের লোকজন ফুল, ফল ও সবজির চাষ করে থাকে। সবুজ ঘরের দেওয়াল এবং ছাদ কাচের তৈরি যাতে কাচের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো প্রবেশ করতে পারে এবং বের হতে না পারে। বরফ গাছপালার জন্য ক্ষতিকর এবং সূর্যের আলো ছাড়া গাছ ও জীবজন্তু বাঁচতে পারে না।

সূর্যের আলো সবুজ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রতিফলিত হয় না। বরং কাচের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে গাছপালা এবং মাটি দ্বারা শোষিত হয় যার ফলে তাপ বৃদ্ধি পায়, কাচের বাইরে যেতে সক্ষম নয় বিধায় গ্রীন হাউজের ভিতর থেকে যায়। এতে সবুজ ঘরে রক্ষিত গাছপালা ও পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। তদুপরি, শীত প্রধান দেশে সূর্যালোক অত্যন্ত কম বিধায় এ সবুজ ঘরের মধ্যে কৃত্রিম আলো জ্বালিয়ে তাপ সৃষ্টি করা হয়। এ তাপে গাছপালা জন্মে।

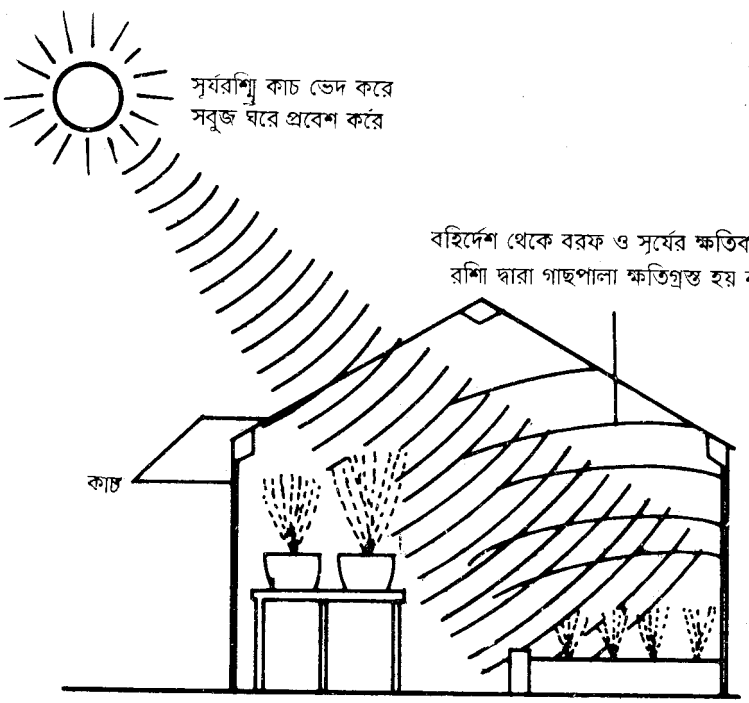

চিত্র ৫.১ : গ্রীন হাউজের চিত্র।

অন্যকথায়, ব্যাপক অর্থে গ্রীন হাউজ বা সবুজ ঘর বলতে আমাদের এই বসবাসের পৃথিবীকেই বুঝায়। কারণ, পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠে বাড়িঘর, কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বনজ সম্পদ, অফিস-আদালত, রাস্তাঘাট ইত্যাদি রয়েছে। মরুভূমিতে কোনো বাড়িঘর, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও গাছপালা থাকে না, তাই সেটিকে গ্রীন হাউজ বলা যায় না।

৫.৩ গ্রীন হাউজ গ্যাস (Green House Gas)

গ্রীন হাউজ থেকে যে গ্যাস নির্গত হয়, তাকে গ্রীন হাউজ গ্যাস বলে। সাধারণত রান্নাঘর, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ইটের ভাটা, মোটরযান প্রভৃতি থেকে যে ধোঁয়া নির্গত হয়, সে গ্যাসকে গ্রীন হাউজ গ্যাস বলে। গ্রীন হাউজ থেকে নিম্নবর্ণিত গ্যাস নির্গত হয়, যেমন :

(১) কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস,

(২) কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাস,

(৩) ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাস,

(৪) মিথেন (Methane, CH_4) গ্যাস;

(৫) নাইট্রাস অক্সাইড (Nitras Oxide, NO_2) গ্যাস,

(৬) ওজোন (Ozone, O_3) গ্যাস প্রভৃতি।

(১) কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস : গ্রীন হাউজে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টির জন্য মূলত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসই দায়ী। আবার কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের ধারণা যে, এ গ্যাস ক্ষতিকর প্রভাবের জন্য অর্ধেক দায়ী এবং বাকি অর্ধেকের জন্য অন্যান্য গ্যাস দায়ী। এক তথ্য বিবরণীতে জানা গেছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার জন্য ৪৯% দায়ী।

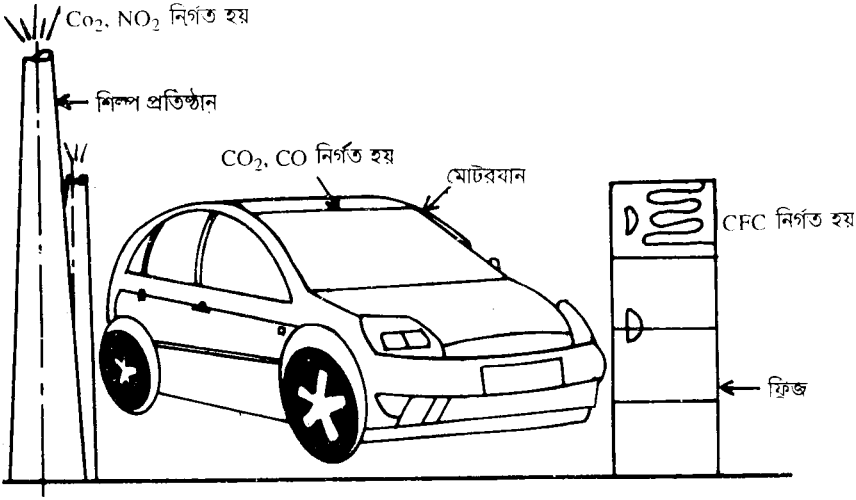

চিত্র ৫.২ : গ্রীন হাউজ থেকে উৎপন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের নির্গমন।

মূলত একটি কার্বনের অণু ও দুটি অক্সিজেনের অণু মিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়। ৫.২ চিত্রে গ্রীন হাউজ থেকে উৎপাদিত ক্ষতিকর গ্যাসের নির্গমন দেখানো হয়েছে।

জীবজন্তু, পশুপাখি, শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ এবং গাছপালা এ গ্যাস গ্রহণ করে। একজন মানুষ প্রতিদিন প্রায় ২ পাউন্ড কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে। আর পাশেপাশে গাছপালা থাকলেই সে গ্যাস গ্রহণ করতে পারে, অন্যথায় এ গ্যাস জমা হয়ে ভূ-মণ্ডলীয় পরিবেশ নষ্ট করে। ইটের ভাটাতে প্রতিদিন শত শত কেজি কয়লা এবং শত শত মন কাঠ পুড়ে থাকে। সেখান থেকেও প্রতিদিন কালো ধোঁয়ার সাথে শত শত কেজি কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হচ্ছে।

তদুপরি, গাছপালা ও বনজঙ্গল পুড়িয়ে প্রত্যহ কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমাদের দেশে যে হারে দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট এবং পুনঃমেরামতকৃত ইঞ্জিন ব্যবহৃত হচ্ছে, তা থেকে প্রতিদিন শত শত কেজি কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন এবং তা বায়ুমণ্ডলে গিয়ে জমা হচ্ছে। দেশে তথা বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) তৈরি হচ্ছে, এ গ্যাসকে নিঃশেষ করার জন্য সে হারে গাছের জন্ম হচ্ছে না। এক তথ্য বিবরণীতে জানা যায় যে, ১৮০০ সালে বিশ্বে শিল্প প্রতিষ্ঠান, মোটরযান, এ/সি, ফ্রিজার প্রভৃতি কম ছিল বিধায় তখন বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের পরিমাণও কম ছিল, যার মাত্রা ছিল ২৫০ পিপিএম। ১৮৫০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২৮০ পি.পি.এম, ১৯৯০ সালে ৩৫০ পি.পি.এম. এবং অনুমান করা হচ্ছে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের (CO_2) পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০০-৭০০ পি.পি.এম.।

মানুষের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েই চলেছে, ফলে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর বিরাট পরিবর্তন ঘটবে। বিশ শতকের শুরু হতে জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে বছরে যে পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে প্রায় ৯×১০^৯ টন CO_2 নির্গত হয়।

বায়ুমণ্ডলে CO_2 গ্যাস বৃদ্ধির প্রথম কারণ হচ্ছে জ্বালানি দহন। আবার, সিমেন্ট প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডলে এ গ্যাস নির্গমনের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। বায়ুমণ্ডলের CO_2 শোষণের মূল উপাদান দুটি, (১) একটি হলো গাছপালা যা CO_2 শোষণ করে, অপরটি হলো (২) পাথরের উপাদান যাতে কার্বনেটরূপে থাকে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের এ উপাদানগুলো যে মাত্রায় CO_2 শোষণ করে তার চেয়ে অধিক হারে CO_2 নির্গমনের ফলে প্রাকৃতিক কার্বনচক্র বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ, বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এ কারণে, প্রয়োজন আমাদের দেশে তথা সারা বিশ্বে ব্যাপকহারে বনায়ন। তা হলেই এ গ্যাস উৎপাদন ও নির্গমনের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং পৃথিবী ভবিষ্যতে অতীতের মতোই ব্যবহারোপযোগী থাকবে।

(২) কার্বন মনোক্সাইড (CO) : ইঞ্জিনের দহন প্রকোষ্ঠ, চুল্লি, বদ্ধ ঘর ইত্যাদির মধ্যে কাঠ, কয়লা, জীবাশ্ম জ্বালানি ইত্যাদির প্রায় পূর্ণ অথবা অর্ধদহন ঘটলে সেখানে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাস উৎপন্ন হয়। জ্বালানির অপোড়া

অথবা আধা পোড়া অবস্থায় দহন ঘটলেই সেখানে অধিক হারে কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাস উৎপন্ন হয়। দুই স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের মধ্যে পিচ্ছিলকরণ তেল ও জ্বালানি একত্রে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। এস্থলে, কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্নের পরিমাণ ভয়াবহভাবে বেড়ে যায়। সে কারণে, দুই স্ট্রোক পেট্রোল ও ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার দিন দিন কমে যাচ্ছে। কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস জীবজন্তুর শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এ গ্যাস জীবজন্তুর নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ, এ গ্যাসের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের পরিমাণ যখন কমে যায় তখন জীবজন্তু দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে লাকড়ি জ্বালানো হলে, সেখানে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়ে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়।

উন্নত বিশ্বে দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় না। অটো টেম্পো সাধারণত দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট হয়। সে কারণে, অনুন্নত দেশ ছাড়া উন্নত দেশে অটো টেম্পো দেখা যায় না। ভেজা অথবা কাঁচা লাকড়ি জ্বালানো উচিত নয়, সর্বদা শুষ্ক জ্বালানি পোড়াতে হয়। এতে ধোঁয়া ও কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাস উৎপন্ন হতে পারে না। বদ্ধ গোয়ালে মশা তাড়ানোর জন্য সাঁজাল (খড় কুটা ইত্যাদিতে অগ্নি সংযোগ করে পর্যাপ্ত ধোঁয়া সৃষ্টি করা) দিয়ে এ গ্যাস উৎপন্ন হয় বলে অনেক সময় গরু-ছাগল মরে যায়।

(৩) ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন (CFC) গ্যাস : ফ্রিজ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (A/C Unit), অ্যারোসল প্রভৃতিতে ব্যবহৃত তরল ও আধাতরল পদার্থ থেকে সি. এফ. সি গ্যাস উৎপন্ন হয়। এ গ্যাস উল্লিখিত যন্ত্রের শীতলীকরণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কাজ করে। লিকেজের কারণে এগুলি থেকে সি.এফ.সি গ্যাস নির্গত হয় এবং পরিবেশ দূষিত করে।

সি.এফ.সি গ্যাস অপরিহার্য বিধায় এটি প্লাস্টিক ফোমের অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ গ্যাসের চাপ কমালে তরল হয় এবং চাপ বাড়ালে বাষ্পীভূত হয়। সি.এফ.সি গ্যাসের ভালো ও খারাপ গুণাগুণ নিম্নরূপ :

(ক) সি.এফ.সি গ্যাসকে মাইক্রোইলেকট্রিক সার্কিট পরিষ্কার করার দ্রবণ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়,

(খ) এটি বুদবুদ প্রস্তুতকারক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়,

(গ) এ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে অক্ষত অবস্থায় রয়ে যায় এবং স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারে (stratosphere) গিয়ে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির (ultraviolet ray) প্রভাবে ভেঙ্গে যায়। তখন এটি থেকে মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু বের হয়ে আসে। এভাবে এ গ্যাস ওজোন স্তরের ক্ষতিসাধন করে।

(ঘ) স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার স্তরে প্রবল সমান্তরাল বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে সি.এফ.সি গ্যাস খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সি.এফ.সি (CFC) গ্যাসের একটি অণুর তাপ আটকে রাখার ক্ষমতা কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এর অণুর চেয়ে হাজার গুণ বেশি। সুতরাং এ গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইড অপেক্ষা হাজার গুণ প্রতিক্রিয়াশীল এবং ওজোন স্তর কমানোর জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

(ঙ) মিথেন (Methane, CH_4) গ্যাস : মিথেন এক প্রকার গ্যাস। জীবজন্তু, পশুপাখির জীবনচক্র থেকে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। পানিতে শ্যাওলা, পাতা প্রভৃতি জলজ

উদ্ভিদের পচন, জীবজন্তুর মলমূত্র, ধানের কুঁড়া থেকে উৎপন্ন বর্জ্য ইত্যাদি থেকে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। বিশেষজ্ঞের মতে এ গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এর চেয়ে ২০ গুণ বেশি তাপ ধারণ করতে সক্ষম। মিথেনকে জ্বালানি হিসেবে দহন ঘটালে বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত হয় এবং এটি পরিবেশ বিপর্যয়ের মাত্রা কমিয়ে দেয়।

(৪) **নাইট্রাস অক্সাইড** (Nitras Oxide, NO_2) **গ্যাস :** এটি এক ধরনের গ্যাস যা মোটরযানের কালো ধোঁয়া, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, প্লাস্টিক ও এসিড শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি থেকে রাসায়নিক উপাদানের দহনের ফলে উৎপন্ন হয়। সাধারণত অক্সিজেনের সাথে নাইট্রোজেন সংযুক্ত হয়ে এ গ্যাসের উদ্ভব ঘটে। এ গ্যাস পানি, অ্যালকোহল, ইথার (ether) ও পেট্রোলের মধ্যে মিশে যেতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্বল্প সময়ের জন্য অ্যানাসথেসিয়া (anaesthesia) কাজে এ গ্যাসকে ব্যবহার করা হয়।

নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশের কিছু বিপর্যয় ঘটায়, তবে এটি কার্বন মনোক্সাইড, সি.এফ.সি প্রভৃতির মতো মারাত্মক নয়। খনিজ তেল দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2), সালফারের অক্সাইড (SO_2), মিথেন (CH_4) প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়। বনায়ন বৃদ্ধি করলে গ্যাসের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(৫) **ওজোন** (Ozone, O_3) **গ্যাস :** ওজোন বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশের অনুকূল একটি গ্যাস। অক্সিজেনের তিনটি পরমাণুর সমন্বয়ে ওজোনের অণু প্রস্তুত হয়।

বাতাসের অক্সিজেন (O_2), ভাসমান বা উড়ন্ত একটি অক্সিজেন (O) অণুর সাথে মিশে ওজোন গ্যাস (O_3) উৎপন্ন করে। সব অক্সিজেনই ওজোন গ্যাসে পরিণত হয় না। আবার অক্সিজেনের ভাসমান একটি অণু ওজোন অণুর সাথে মিশে দুটি অক্সিজেনের অণু প্রস্তুত করে। এটির রাসায়নিক সূত্র নিম্নরূপ :

$$O_2 + O = O_3$$

$$O + O_3 = 2O_2$$

এভাবে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার স্তরে ওজোন এর পরিমাণও সঠিক স্থিতাবস্থায় (static) থাকে না। উপরের দুটি বিক্রিয়ার মধ্যে এটি অবস্থান করে। স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারের অন্যান্য অণুও এ সমতার উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায় যা আমরা ইতোমধ্যে অনুধাবন করতে পেরেছি।

৫.৪ গ্রীন হাউজের প্রতিক্রিয়া (Green house effect)

কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), কার্বন মনোক্সাইড (CO), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), ওজোন (O_3) প্রভৃতি গ্যাস বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ তথা গ্রীন হাউজে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ৫.৩ চিত্রে গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদন ও নির্গমনে ভূমণ্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠে এটির প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

উপরিউক্ত গ্যাসসমূহের বৃদ্ধি পরিবেশের উপর প্রচণ্ড বিরূপ প্রভাব ফেলে—এ প্রভাবকে টেকনিক্যাল ভাষায় গ্রীন হাউজ প্রভাব বলে। ধরা যাক, আমাদের এ পৃথিবীটা একটি সবুজ ঘর এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড এর স্তর ঘরের চারপাশের একটি কাচের দেয়াল। সূর্যের যেসব রশ্মি এ কাচের দেয়াল ভেদ করে পৃথিবীর উপরিভাগকে উত্তপ্ত করে, এ স্তর বা কাচের

দেয়াল সেই তাপকে বাইরে বেরিয়ে যেতে বাধা দেয়। এর পরিণাম হলো, CO_2 এর পরিমাণ বা ঘনত্ব যত বৃদ্ধি পাবে, পৃথিবী হতে তাপ ততই কম নির্গত হবে—ফলে পৃথিবী দিনে দিনে আরো বেশি উত্তপ্ত হবে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীর মতে বনাঞ্চল কেটে উজাড় করে দেওয়ার ফলে প্রাকৃতিক উপায়ে CO_2 শোষণ প্রক্রিয়া বহুলাংশে হ্রাস পাচ্ছে। আবার নগরায়ণ তাপ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। শহরে গাছপালার অভাব থাকায় CO_2 শোষণের হার কমে যায়। আবার ইটের তৈরি ঘরবাড়ি এবং পিচের রাস্তার তাপ শোষণ ক্ষমতা যেমন বেশি, তাপ ধারণ ক্ষমতাও তেমনি বেশি। ফলে তাপের নির্গমন ধীরে ধীরে হয়—যার ফলে শহর এলাকা গ্রামাঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত থাকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে গত ৫০ বছরে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ব্যাংকক, কলকাতা, মুম্বাই প্রভৃতি শহরের রাতের তাপমাত্রা পূর্বাপেক্ষা প্রায় ৪° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরবর্তী ৬০ বছরে অর্থাৎ ২০৫০ সাল নাগাদ কোনো কোনো এলাকার তাপমাত্রা ১ থেকে ৬° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে।

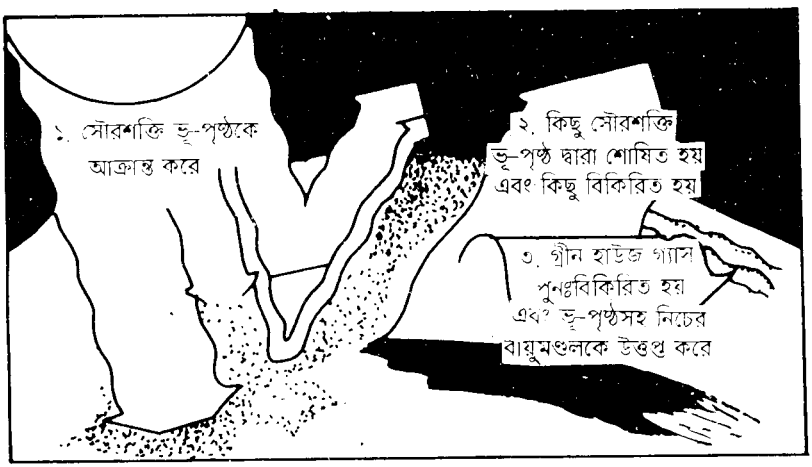

চিত্র ৫.৩ : গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদন, নির্গমন ও প্রতিক্রিয়া।

বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে নজিরবিহীনভাবে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন ও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাওয়া (চিত্র ৫.৩)। সাধারণ অবস্থায় সূর্য থেকে যে তাপশক্তি আসে, তার কিছু অংশ ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে আর বেশিরভাগ প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4) ও অন্যান্য গ্যাস জমে আছে তা ভূ-মণ্ডলের তাপ বিকিরণে বাধা দেয় এবং তাপ শোষণ করে। ফলে, ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর উপরিভাগ উত্তপ্ত হচ্ছে।

বিগত ২০০ বছর যাবৎ প্রধান প্রধান গ্রীন হাউজ গ্যাস, যথা : কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC) এবং নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড (NO_2), সালফারের অক্সাইডসমূহ (SO_2) বায়ুমণ্ডলে জমা হচ্ছে। এসব গ্যাস উৎপাদনের

প্রধান কারণ হলো খনিজ জ্বালানি দহন করা, বনায়ন ধ্বংস হওয়া। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) দায়ী ছিল। কিন্তু গত চার দশকে বিশেষ কিছু কৃত্রিম অজৈব পদার্থ যেমন : ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC) নির্গমন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পদার্থগুলো গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার জন্য বেশি কার্যকর। ফলে দেখা গেছে যে ১৮৫০-১৯৬০ এ সময়কালের তুলনায় বর্তমান সময়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ (পাঁচ) গুণ।

আমাদের এ উপমহাদেশে গ্রীন হাউজ এর প্রতিক্রিয়া মারাত্মক। উপমহাদেশের বনাঞ্চল দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ১৯১২ সালে উপমহাদেশে ৩৬% ভূমি বনাঞ্চল ছিল—এখন মাত্র ৮%। বনাঞ্চল উজাড় এবং খনিজ জ্বালানির মাত্রাতিরিক্ত দহনের ফলস্বরূপ উপমহাদেশের তাপমাত্রায় যেমন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, তেমনি বার্ষিক বৃষ্টিপাত হ্রাস পাচ্ছে।

শুধু CO_2 গ্যাসই যে তাপ শোষণ করে তা নয়। বায়ুমণ্ডলে অন্যান্য গ্যাস যেমন মিথেন (CH_4), NO_2 গ্যাস এবং ক্লোরোফ্লোরো কার্বন গ্রুপের সদস্য CO_2 অপেক্ষা অধিক হারে তাপ শোষণ ও ধারণ করে থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের (CFC) একটি অণু কার্বন ডাই-অক্সাইডের ১০,০০০ টির সমপরিমাণ তাপ শোষণ করতে পারে। শুধু তাই নয়—এসব গ্যাস ওজোন স্তরের ঘনত্ব হ্রাস করে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে পৃথিবী পৃষ্ঠে আসার সুযোগ করে দেয়।

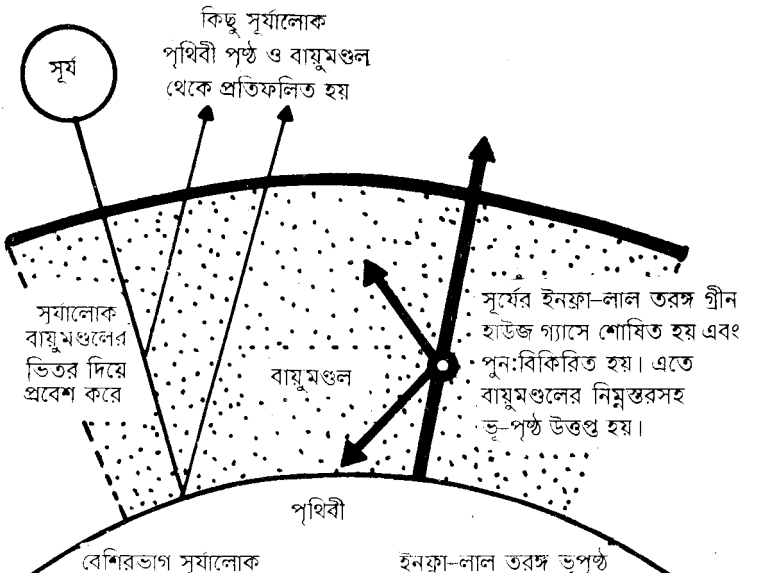

চিত্র ৫.৪ : সূর্যালোক দ্বারা গ্রীন হাউজে প্রতিক্রিয়া।

৫.৪ চিত্রানুযায়ী সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের ভিতর প্রবেশ করে। কিছু আলো পৃথিবী পৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয় এবং বেশিরভাগ ভূ-পৃষ্ঠে শোষিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। সূর্যের অবলোহিত তরঙ্গ (Infrared wave) ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত হয়ে গ্রীন হাউজে শোষিত হয় এবং পুনরায় বিকিরিত হয়। এতে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরসহ ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। ইংল্যান্ডের ইস্ট অ্যাঙ্গলিয়া (East Angalia) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে, গ্রীন হাউজ গ্যাস ও সূর্যালোক দ্বারা গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় ১৮৮০ থেকে ১৮৮৬ সালের ভিতর বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা ০.৬° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে, তুষারকৃত মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্র ৫.৫ : বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তর মেরুতে বরফ খণ্ড গলে পানিতে পরিণত হওয়ার দৃশ্য।

বিশ্ব আবহাওয়ামণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পাহাড় পর্বতের চূড়ায় জমাট বাঁধা বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির আশঙ্কা অনেকেই করছে। ২০০২ সালের ২০ এপ্রিল প্রথম আলো পত্রিকার এক তথ্য বিবরণী মোতাবেক ৫.৫ চিত্রানুযায়ী বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তর মেরুতে বরফখণ্ড গলে পানিতে পরিণত হচ্ছে। এতে আশঙ্কা

করা হচ্ছে, বাংলাদেশের সাথে সমুদ্র উপকূলবর্তী আরো অনেক দেশের অংশবিশেষ ডুবে যেতে পারে। এই কথাগুলো এতদিন শুধু কাগজ কলমে বা তাত্ত্বিক পর্যায়েই আলোচিত হতো। কিন্তু গত মার্চ, ২০০২ তে সমুদ্র পরিবেষ্টিত উপদ্বীপ অ্যান্টার্কটিকায় থরে থরে সাজানো বরফের একটি বড় স্তর হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ার পর মনে হলো বিপদ বুঝি ঘরের দুয়ারে। প্রশ্ন উঠলো ভূমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বরফ গলা কি শুরু হয়ে গেল? আবহাওয়াবিদদের কাছ থেকে এ প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক। ১২ হাজার বছর ধরে যে বরফ কিনা স্থির ছিল, মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে ৫০০ টনেরও বেশি ওজনের বরফের স্তর সমুদ্রে ভেঙ্গে পড়ল কীভাবে? তাহলে কি এভাবে বরফ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে একদিন পুরো অ্যান্টার্কটিকা বিলুপ্ত হয়ে যাবে? তবে বিশেষজ্ঞদের মতে সাম্প্রতিক এ বরফ ধসে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আপাতত বাড়বে না, ভেঙ্গে পড়া বরফ স্তূপটি সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। এতে, সমুদ্রপৃষ্ঠ অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ভয় হলো বরফের এক একটি তাক স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। সেগুলো যদি ভেঙ্গে যায়, তাহলে একদিন গলতে শুরু করবে এবং অবশ্যই দেখা দিবে বিপদ। অ্যান্টার্কটিকার যে অংশে বরফ ভেঙ্গে পড়েছে সেখানের তাপমাত্রা পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার তুলনায় ৫ গুণ, যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, আশার কথা হলো, অ্যান্টার্কটিকার অন্যান্য এলাকার তাপমাত্রা অনেক কম এবং এর কোনো কোনো অংশে বরফ দিনে দিনে পুরু হচ্ছে। তাই আপাতত খুব বেশি ভয়ের কারণ নেই বলে পরিবেশবিদদের ধারণা। তবে, অনুমান করা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাবার কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে সমুদ্রের স্তর অন্ততপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে।

বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে, গ্রীনল্যান্ড, কানাডা ও দক্ষিণ আমেরিকার বরফও গলতে পারে। এই মেরু এলাকার বরফ ব্যাপকহারে গলতে শুরু করলে পানিতে ও বরফের ভারে সমুদ্রের মধ্যে পানির উচ্চতা ৫ থেকে ৯ মিটার উঁচু হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তাপমাত্রা বর্তমান হারে বাড়লে আগামী ১০০ বছরেও এই অবস্থা ঘটার সম্ভাবনা নেই বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে গ্রীন হাউজের প্রতিক্রিয়া (Green House effect in Bangladesh) : বাংলাদেশ ভূমণ্ডলীয় পরিবেশের একটি ছোট দেশ। গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রতিক্রিয়া যদি অন্য দেশের ক্ষতি করে, কিছু না কিছু হলেও বাংলাদেশের উপরও তার প্রভাব পড়ে। নিচে বাংলাদেশে গ্রীন হাউজের প্রতিক্রিয়ার কিছু সুনির্দিষ্ট দিক তুলে ধরা হয়েছে। যেমন :

(১) গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে গ্রীনল্যান্ডে জমাকৃত বরফ গলতে থাকবে। এ পানিতে বিশ্বের নিচু দেশগুলোর কিছু এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে এবং এ পানি বঙ্গোপসাগর উপকূলে জমা হওয়ার ফলে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যেতে পারে।

(২) গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনেক জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

(৩) পানি ফুলে উঠার জন্য মিঠা পানির এলাকায় লবণাক্ত পানি ঢুকে যাবে এবং শস্য ও গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(৪) নিম্নাঞ্চলের রাস্তাঘাট ও জনজীবন বিপন্ন হবে, পশুপাখি কমে যাবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে।

(৫) গ্রীন হাউজের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বেড়ে যাবে এবং বছরের অধিকাংশ সময়েই ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি আঘাত আনবে।

(৬) ১৯৮৮ সালের বন্যার ন্যায় দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার ফসল, ঘরবাড়ি ডুবে যাবে এবং পুকুর, নদী, খালবিলের পানি সংক্রমিত হবে।

(৭) প্রয়োজনীয় বনাঞ্চল পানির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(৮) দেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে।

(৯) নিম্নাঞ্চলের অনেক মানুষকেই ঘরবাড়ি হারিয়ে নৌকায় যাযাবরের জীবনযাপন করতে হবে।

(১০) দেশের উঁচু এলাকায় খরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে এবং সেখানে কালক্রমে মরুময়তার সৃষ্টি হবে।

(১১) কোনো কোনো শুষ্ক এলাকায় বৃষ্টিপাতের মাত্রা বেড়ে যাবে এবং সেখানে চাষাবাদের জমিও বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া রোধে কর্তব্য (Duty to obstruct the green house effect) : গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া রোধ করার জন্য বিশ্ববাসী তথা বাংলাদেশের জনগণের জন্য করণীয় কার্যাবলি নিম্নরূপ :

(১) রাস্তার ধার, নদীর পাড়, পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা লাগিয়ে দেশ জুড়ে বনায়ন বৃদ্ধি করতে হবে।

(২) দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট সকল ধরনের মোটরযান বন্ধ করতে হবে।

(৩) পুনঃমেরামতকৃত ইঞ্জিনের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এতে রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার পরিমাণও হ্রাস পাবে।

(৪) প্রতিটি মোটরযানে উন্নত বিশ্বের মতো ইঞ্জিনের দহনকৃত জ্বালানির পোড়া গ্যাস পূর্ণভাবে দহন ঘটানোর জন্য ক্যাটালিটিক কনভার্টার ব্যবহার করতে হবে। এ যন্ত্র অন্যান্য দহন যন্ত্রের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও কার্বন মনোক্সাইড (CO) উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ জীবজগতের বসবাসের উপযোগী হবে।

(৫) কাঠ, কয়লা ও খনিজ তেলের ব্যবহার কমিয়ে সৌরশক্তি, পানি শক্তি, বায়ু শক্তি, পারমাণবিক শক্তি প্রভৃতির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

(৬) বৈদ্যুতিক ব্যাটারি, সৌরশক্তি চালিত মোটরযান উদ্ভাবন ও ব্যবহার আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে।

(৭) কৃষিক্ষেতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ কমাতে এবং জৈব সার ব্যবহারের মাত্রা বাড়াতে হবে।

(৮) কৃষি জমিতে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব কমাতে কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে সেখানে যান্ত্রিক উপায়ে কীটপতঙ্গ দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) ডি.ডি.টি. অ্যারোসল, সিএফসি গ্যাসের ব্যবহার কমাতে বা প্রয়োজনে নিষিদ্ধ করতে হবে।

(১০) বনায়ন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জনগণের মধ্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১১) বনায়ন বৃদ্ধির উপকারিতা সম্পর্কে কৃষক এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রেডিও/টিভি, বিজ্ঞাপন, খবরের কাগজে প্রচার বৃদ্ধি করতে হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানে বনায়নও বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি দেশে ভূমির শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন এবং বাংলাদেশে রয়েছে মাত্র ৮%। চীনদেশে ১৯৪৯ সালে ৫% বনাঞ্চল থাকলেও ১৯৭৮ সালের হিসাব মতে সেখানে ১২.৭% বনাঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রীন হাউজের প্রতিক্রিয়া রোধ করতে সারা বিশ্বের বনায়ন বৃদ্ধি এবং গ্রীন হাউজ গ্যাসের উদগীরণ কমাতে হবে।

বিপরীত যুক্তি : গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি হওয়ার পক্ষেও যথেষ্ট শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। পরিবেশ উত্তপ্ত হলে পৃথিবীর চারদিকের মেঘের আবরণও বৃদ্ধি পাবে যা সূর্যরশ্মিকে পৃথিবী পৃষ্ঠে আসতে বাধা দেবে। কারখানার প্রভাব ও বনাঞ্চল উজাড় হওয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা কার্যকর বিকিরণকে বাধাদান করে পৃথিবীর তাপমাত্রাকে স্থিতি অবস্থায় রাখবে।

গ্রীন হাউজের প্রভাবে সৃষ্ট পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা রক্ষার জন্য আমাদের অধিক পরিমাণ বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ জার্মানি ও চীনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জার্মানিতে বর্তমানে জন্মহার ঋণাত্মক এবং বনাঞ্চলের প্রসার ধনাত্মক।

৫.৫ ওজোন স্তর এবং এর প্রতিক্রিয়া (Ozone layer and its effect)

ওজোন একটি পরিষ্কার নীল রঙের, গন্ধযুক্ত গ্যাস। পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে ১০১৫ কি.মি. উপরে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে এটি পাওয়া যায়। এই গ্যাস অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। অক্সিজেন পরমাণু অতীব বিক্রিয়ক হওয়ায় এটি একাকী অবস্থান করতে পারে না। তাই যত শীঘ্র সম্ভব এটি অন্য অক্সিজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে যায়। ওজোন এরকম তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। পৃথিবী হতে অনেক উপরে সূর্যরশ্মির ক্রিয়ার ফলে ফটোডিসোসিয়েশন এর মাধ্যমে ওজোন তৈরি হয়। বায়ুমণ্ডলের নিচের দিকে এবং সুপারসনিক বিমান উড্ডয়ন সীমার উপরে একটি বিষাক্ত তীব্র গন্ধযুক্ত গ্যাসের স্তর আছে, সে স্তরকেই ওজোন স্তর বলে। এ গ্যাস যেমন ক্ষতিকর আবার এটি পরিবেষ্টিত বায়ুমণ্ডল সুরক্ষার কাজও করছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পৃথিবী পৃষ্ঠের ওজোন গ্যাসের স্তর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারের ওজোন স্তর দিন দিন কমছে। এই ওজোন স্তর দিন দিন আরও পাতলা হতে থাকলে ওজোন স্তরটি ছিদ্র হয়ে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে এসে

পড়বে যেটি ভূ-পৃষ্ঠ, গাছপালা, জীবজন্তু, পশুপাখি প্রভৃতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। কারণ, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ অক্সিজেন অণুর উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া ঘটায়। তখন উচ্চ শক্তির অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ ঘটে।

ওজোন স্তর 1.5×10^{15} হতে 1.0×10^{15} Hz বা 200–290 nm wavelength এর সূর্যরশ্মি শোষণ করার ক্ষমতা রাখে। এই শোষণের ফলে ওজোনোস্ফেয়ার (ozonosphere) এবং ট্রপোস্ফেয়ার (troposphere) এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তোলে।

নিম্নবর্ণিতভাবে অক্সিজেন ফটোডিসোসিয়েশন এর মাধ্যমে অন্যান্য স্তরের সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক উপায়ে :

$$O_2 + h\delta \longrightarrow O + O$$

$$O_2 + O + M \longrightarrow O_3 + M$$

$$O_3 + h\delta \longrightarrow O_2 + O$$

$$O_3 + O \longrightarrow O_2 + O_2$$

$h\delta \rightarrow$ Plank quantum (প্ল্যাঙ্ক কোয়ান্টাম), এটিই অতিবেগুনি রশ্মি। $M \rightarrow$ তৃতীয় বস্তু যা O_2 এবং O এর মিলিত অতিরিক্ত শক্তি ধারণ করতে পারে। যেমন : নাইট্রোজেন।

তৃতীয় বিক্রিয়াটি শক্তি গ্রাসকরণ বিক্রিয়া যার মাধ্যমে O_3 ভেঙ্গে যায়। ওজোনস্ফেয়ারে ওজোন ঘনত্ব প্রায় 166 ppm (15–20 mile) এবং স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারের (5 – 15 mile) মাত্রা 0.08 ppm।

বাতাসের অক্সিজেন (O_2) উড়ন্ত একটি অক্সিজেন (O) অণুর সাথে মিলে ওজোন গ্যাস (O_3) উৎপন্ন করে। সব অক্সিজেন ওজোন গ্যাসে পরিণত হয় না। আবার, অক্সিজেনের ভাসমান একটি অণু, ওজোন অণুর সাথে মিশে দুটি বাতাসের অক্সিজেনের অণু প্রস্তুত করে। এটির রাসায়নিক সূত্র হচ্ছে :

$$O_2 + O = O_3 \text{ এবং } O + O_3 = 2O_2$$

এভাবে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার স্তরের ওজোন এর পরিমাণ স্থিতাবস্থায় (static) থাকে না। উপরের দুটি বিক্রিয়ার মধ্যে এটি অবস্থান করে। স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারের অন্যান্য অণুও এ সমতার (equilibrium) উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

গ্রীন হাউজ গ্যাস (O_2, CFC প্রভৃতি) বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে উপরের দিকে উঠতে থাকলে সে গ্যাসের উত্তাপে ওজোন স্তর ছিদ্র হয়ে যায়। তখন সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ বাধা না পেয়ে সরাসরি ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। ফলে, এ রশ্মির প্রতিক্রিয়ায় সবুজ গাছপালা পুড়ে যায়। জীবজন্তু পুড়ে মরে এবং মানুষের গায়ে ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাস ট্রপোস্ফেয়ারে প্রবেশ করে এবং স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ক্লোরিন পরমাণু (chlorine atom) ছাড়ে। এ ক্লোরিন পরমাণু ওজোনের বারবার ভাঙ্গা (breakdown) প্রতিরোধ করে। কিন্তু, ওজোন ধ্বংস

হয় না। কারণ, এটি সর্বদাই উৎপন্ন হতে থাকে। এ সময় অক্সিজেন নিচ থেকে আগত ওজোনের সাথে মিশে ওজোন স্তরের সমতা ফিরিয়ে আনে। ৫.৬ চিত্রে ক্লোরিন পরমাণু দ্বারা ওজোনের বারবার ভাঙ্গা ও কিছু প্রতিরোধ সৃষ্টির রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

বায়ুমণ্ডলে যে ওজোন গ্যাসের স্তর রয়েছে তা প্রায় ২০ কিলোমিটার। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারের মধ্যে প্রায় ১৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার প্রশস্ত এ গ্যাসের স্তর দেখতে পাওয়া যায়।

একজোড়া ভালো সানগ্লাস এর মতো দেখতে এ ওজোন স্তর এবং এটি সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মিকে আটকে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

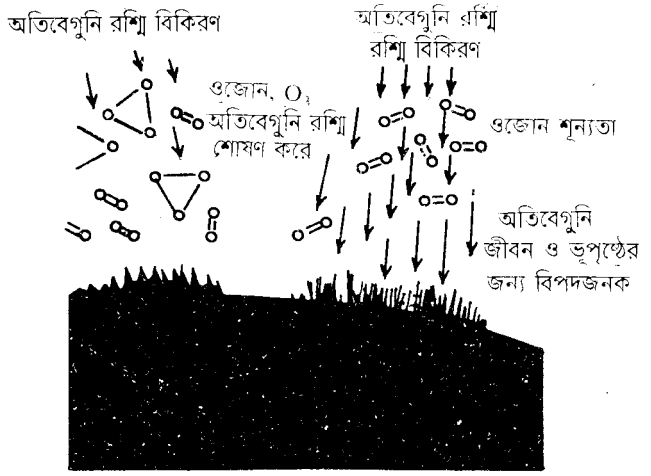

চিত্র ৫.৬ : ক্লোরিন পরমাণু দ্বারা ওজোন গ্যাস বারবার ভাঙ্গা ও প্রতিরোধ সৃষ্টির রাসায়নিক বিক্রিয়া।

ওজোন স্তর না থাকলে সূর্যের তীব্র কিরণে প্রাণিজগৎ পুড়ে যেত, চর্ম ক্যান্সার (skin cancer) ও চক্ষুর ছানি রোগ দেখা দিত এবং গাছপালা ও পশুপাখি ক্ষতিগ্রস্ত হতো। সুতরাং ওজোন স্তর প্রকৃতির বন্ধু হিসেবে কাজ করছে এবং আপনা আপনিই সূর্যের নিরাপত্তামূলক ছাঁকন যন্ত্র (protective sun screen) হিসেবে কাজ করে বিশ্ব প্রকৃতি রক্ষা করছে।

মূলত ওজোন স্তর একটি অদৃশ্য আবরণ (invisible shield) এবং বিজ্ঞানীগণ তা বিভিন্নভাবে পরিমাপ করে থাকেন। একটি পরিমাপ প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম গ্যাস ভর্তি একটি বেলুন (Helium gas filled baloons) বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, যা পৃথিবী পৃষ্ঠে তথ্য সরবরাহ করতো। কানাডার একটি পরিবেশ গবেষণা সংস্থা (Environment research organisation) যার নাম এনভায়রনমেন্টাল কানাডা (Environmental Canada) ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওজোন স্তর পরিমাপ করার জন্য একটি সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল পরিমাপন যন্ত্র

(Sensitive measuring instrument) আবিষ্কার করেছে। আমেরিকার ভূ-উপগ্রহ মিশন কানাডার এ পরিমাপন যন্ত্র ব্যবহার করে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওজোন স্তর পরিমাপ করছে।

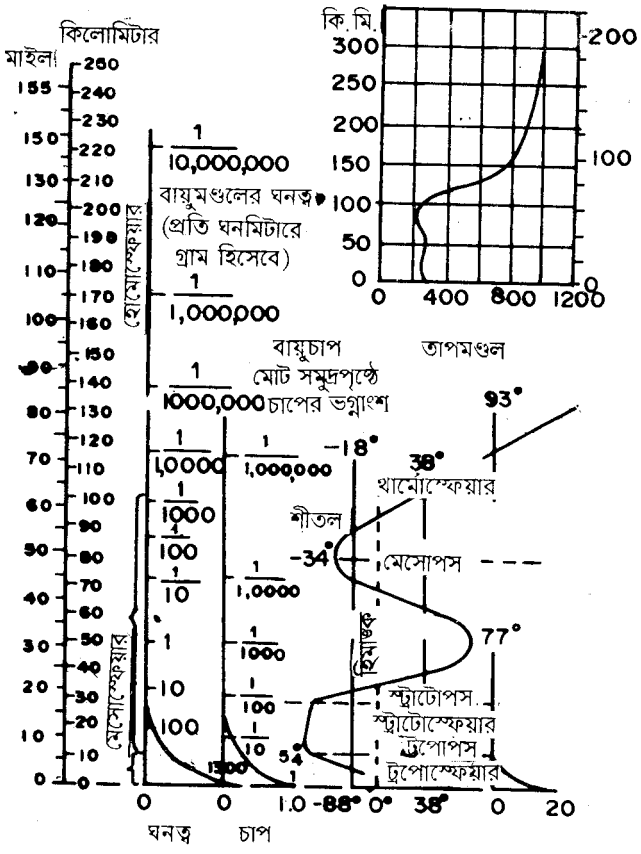

চিত্র ৫.৭ : নির্দিষ্ট উচ্চতায় বায়ুর ঘনত্ব, ওজোন স্তর, চাপ ও তাদের পরিবর্তনের দৃশ্য প্রদর্শন।

ওজোনের ক্ষতিকর প্রভাব : ওজোন একটি শক্তিশালী বিক্রিয়ক যা সহজেই অন্যান্য বস্তুকে আকর্ষণ করে। এটি জীবিত কোষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক এবং সামান্য পরিমাণ বুকে ব্যথা, কফ বা চোখ জ্বালার কারণ হতে পারে। 1 ppm ওজোন ঘনত্বে ৮ ঘণ্টা থাকলে ব্রঙ্কাইটিস, ফাইব্রোসিস এবং ব্রঙ্কাইওলিটস এর মতো মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হতে পারে। অনেক সময় ১ পিপিএম ঘনত্বে ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগকে রেখে দিলে তা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ওজোন গাছপালার জন্যও যথেষ্ট ক্ষতিকারক। এটি সবুজ পাতার উপরিভাগে ছোট ছোট দাগের সৃষ্টি করে। সাধারণত আঙ্গুর, আখ, বিট, লেটুস, তামাক ইত্যাদি ওজোন দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওজোন কাপড়ের জন্যও ক্ষতিকারক। পলিস্টার

সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর নাইলন এবং অ্যাসিটেট। সুতি কাপড় সর্বাপেক্ষা কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 20 – 40 $\mu gm/m^3$ (0.01 – 0.02 ppm) বায়ুর ঘনত্বে ওজোন রাবারের টায়ারের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেয়। যেসব বিমান উঁচু দিয়ে চলাচল করে তাদের চাকার রাবার, জানালা ও দরজার পাশের রাবার কাঠামো ওজোন দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৫.৭ চিত্রে বায়ুমণ্ডলের প্রাকৃতিক উপাদান এবং বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর ঘনত্ব, ওজোন স্তর, চাপ ও তাদের পরিবর্তনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

ক্ষতিকারক সত্ত্বেও ওজোনই কিন্তু আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। ওজোন স্তর যদি সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ না করতো তাহলে,

১. একক কোষের কোনো কিছু জীবিত থাকতে পারতো না।

২. ক্যান্সার ও বিভিন্ন রকমের মারাত্মক চর্ম রোগের উদ্ভব হতো।

৩. DNA বৃদ্ধি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

তাই ওজোন স্তর আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোনো অবস্থাতেই এ স্তরের ধ্বংস কাম্য নয়।

৫.৬ ওজোন স্তরের ক্ষয় (Depletion of Ozone Layer)

ওজোন স্তরের ফাটল বা ঘনত্ব হ্রাসকে ওজোন স্তরের ক্ষয় বলে। ওজোন স্তরের অস্থায়ীভাবে ক্ষয় হওয়া বা পাতলা হয়ে যাওয়ার কারণ হলো ওজোন স্তরের ঘনত্ব হ্রাস। প্রাকৃতিক উপাদানের হ্রাস বা বৃদ্ধি, যেমন : সিনথেটিক যৌগ (Synthetic compound) থেকে যে ক্লোরিন ও ব্রোমিন পাওয়া যায় তার দ্বারা মূলত ওজোন স্তর ক্ষয় হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, কিছু নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ ধীরে ধীরে ওজোন স্তরকে ধ্বংস করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকারক গ্যাস হলো ক্লোরোফ্লোরোকার্বন গ্যাস (Chloro Floro Carbon gas or CFC Gas)।

সি.এফ.সি গ্যাস ভূ-পৃষ্ঠের উপরের পরিবেশের জন্য তেমন মারাত্মক নয়। কিন্তু এই গ্যাস যখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে থাকে, তখনই সেটি ওজোন স্তরের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটায় এবং ক্লোরিন পরমাণুর মধ্যে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি ভাঙ্গতে থাকে। এভাবে ক্লোরিন পরমাণু ওজোন গ্যাস (O_3) খেয়ে ওজোন স্তরকে পাতলা বা ক্ষয় করে ফেলে।

বায়ুমণ্ডলে NO_2 এবং SO_2 গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে গেলে O_3 এর স্বাভাবিক উৎপত্তি ব্যাহত হয়। বায়ুমণ্ডলের NO_2 ফটোডিসোসিয়েশন এর মাধ্যমে অক্সিজেন পরমাণুকে ওজোনে পরিণত হতে বাধা প্রদান করে।

$$NO_2 + h\delta \longrightarrow NO_2 \qquad [h\delta = \text{Plank Quantum}]$$

$$NO \longrightarrow NO + O_2$$

$$O + O_2 + M \longrightarrow O_3 + M$$

$$O_3 + NO \longrightarrow NO_2 + O_2$$

ফলে, বায়ুমণ্ডলের ওজোনের ঘনত্ব হ্রাস পায়। আবার এই NO_2 ওজোনের উপস্থিতিতে বায়ুতে নাইট্রিক এসিডের সৃষ্টি করে।

$$2NO_2 + O_3 \longrightarrow N_2O_5 + O_2$$

$$N_2O_5 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3$$

আবার মুক্ত র‍্যাডিকেল এর উপস্থিতির ফলে PAN নামক ক্ষতিকারক পদার্থের সৃষ্টি হয়।

$$ROO + NO_2 \longrightarrow ROO - NO_2$$

$$ROO + SO_2 \longrightarrow ROO - SO_2$$

$$ROO + O_3 \longrightarrow ROO - NO_2$$

$$RO + NO_2 \longrightarrow RONO_2$$

পেরোক্সি অ্যাসাইল নাইট্রাইট (PAN)

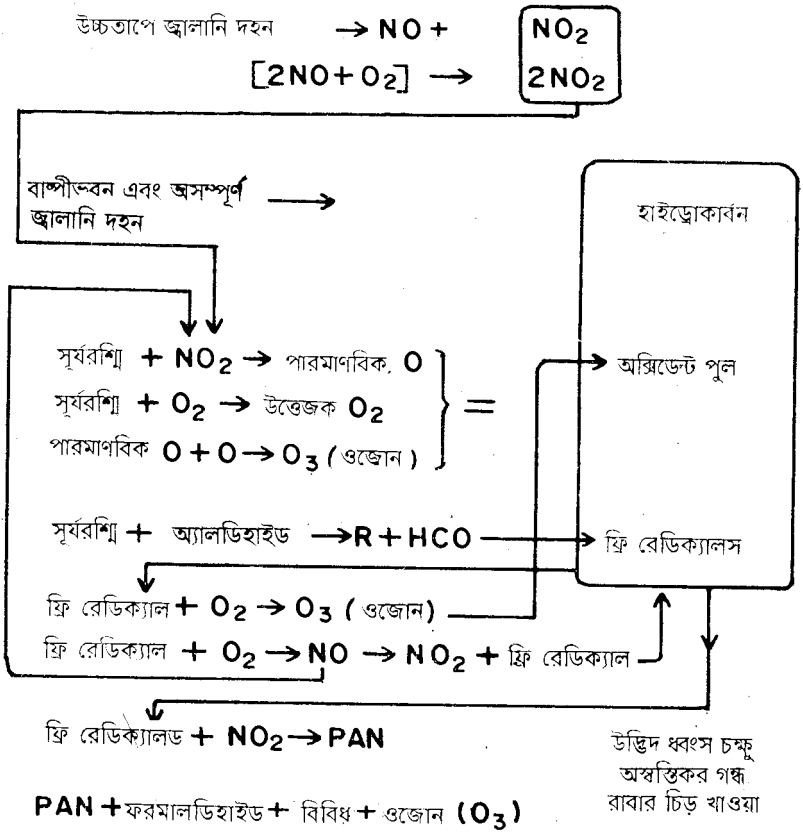

চিত্র ৫.৮ : ওজোন স্তর ক্ষয়ের রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রদর্শন।

অপর্য্যাপ্ত জ্বালানি দহন এবং পেট্রোল দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলের NO_x, SO_x, CO_x প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ওজোনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। আবার CFC বা ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, যা কারখানার বর্জ্যরূপে বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয় তা ফটোডিসোসিয়েশন এর মাধ্যমে মুক্ত ক্লোরিনে পরিণত হয়। এই মুক্ত ক্লোরিন ওজোনকে ভেঙ্গে ফেলে।

$$CF_2Cl_2 + h\delta \longrightarrow CF_2Cl_2 + Cl$$

$$Cl + O_3 + M \longrightarrow Cl_2O + M + O_2$$

সুতরাং, এসব বর্জ্য গ্যাস নিষ্কাশন পরিহার করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ওজোন স্তরে ফাটলের সৃষ্টি হলে তার মধ্য দিয়ে সূর্যের মারাত্মক ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি প্রবেশ করে নানা রোগ সৃষ্টি করবে—যা কোনোমতেই কাম্য নয়।

৫.৭ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও প্রতিক্রিয়া (Sea level rise and its consequence)

গ্রীন হাউজ বা সবুজ ঘরের প্রভাব সম্বন্ধে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। সেই সাথে পৃথিবী পৃষ্ঠে উত্তাপও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ বায়ুমণ্ডলে এ গ্যাসের পরিমাণ বর্তমান অপেক্ষা দ্বিগুণ হয়ে যাবে, যার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর তাপমাত্রা 3.6°C বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির ফলে আগামী ৫০০ বছরের মধ্যে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা 22°C বা 40°F বেড়ে যাবে। এটির অর্ধেক তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় তবে বায়ুমণ্ডলে যে চক্র সৃষ্টি হবে তাতে প্রচণ্ড ঝড়ের উৎপত্তি হতে পারে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বর্তমান হারে বৃদ্ধির ফলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে ও মহাসাগরের বরফের চাকতি গলে যাবে। ফলে, সমুদ্রের স্তর কয়েক মিটার বৃদ্ধি পাবে যা পৃথিবীর সৈকতবর্তী বেশিরভাগ শহর ও স্থানসমূহ পানিতে নিমজ্জিত হবে।

ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার একটি সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কিভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে?

১. প্রথমত, বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানির উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

২. দ্বিতীয়ত, পর্বত চূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে সমুদ্রের পানির পরিমাণ বাড়বে। এতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা যেমন বাড়বে, তেমনি বাড়বে প্লাবিত ভূমির পরিমাণ।

৩. তৃতীয়ত, গ্রীনল্যান্ডসহ অন্যান্য ভূ-ভাগের উপরিতলে সঞ্চিত বরফ গলে তা সমুদ্রে এসে মিলে যাবে। এতেও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে।

সবকিছু স্বাভাবিক গতিতে চললেও সমুদ্রের পানির তাপমাত্রাজনিত সম্প্রসারণ ও বরফ গলার ফলে পরবর্তী প্রতি দশকে ৬ সেন্টিমিটার করে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং ২০৩০ সাল ও ২১০০ সাল নাগাদ গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি দাঁড়াবে যথাক্রমে ২০

সেন্টিমিটার ও ৬৫ সেন্টিমিটার। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, গড় বৃষ্টিপাত, বাষ্পীভবন, নদী প্রবাহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতি সামগ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে। জলবায়ু পরিবর্তনে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত সম্ভাব্য বিপর্যয় নিম্নরূপ :

(১) প্লাবন : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের প্রায় ১২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্লাবিত হয়।

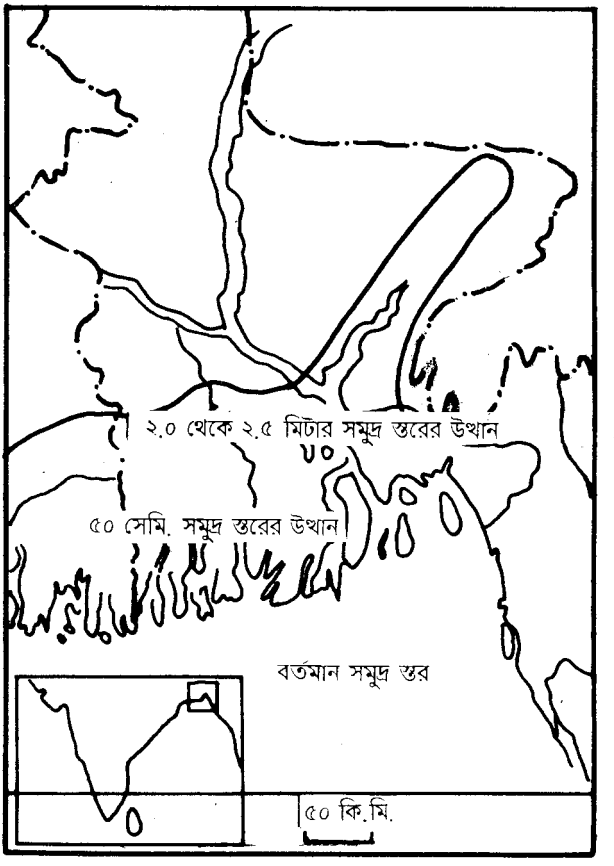

চিত্র ৫.৯ : ওজোন স্তরের ক্ষয়ের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যাওয়ার দৃশ্য।

(২) নদীর ক্ষীণ প্রবাহ : নদীমাতৃক ও কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুষ্ক মৌসুমে দেশের প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ, পদ্মা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচ দিয়ে ৩০ বছর আগেও যেখানে জাহাজ চলাচল করেছে,

বর্তমানে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচ দিয়ে গরু চরে। দেশের অন্যান্য নদীর অবস্থা অনেকটা এই রকম।

(৩) পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি : বর্তমানে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং দূরবর্তী দ্বীপসমূহের ১.৪ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় লোনা পানি প্রবেশ করার ফলে উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূ-গর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি মাটির উর্বরতা শক্তিকে হ্রাস করে, এতে ফলন কমে যায় এবং সামগ্রিকভাবে কৃষি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৪) আকস্মিক বন্যা : পাহাড়ি বৃষ্টিপাতের ফলে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৪ হাজার ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ১ হাজার ৪ শত বর্গকিলোমিটার এলাকা আকস্মিক বন্যার শিকার হয়।

(৫) খরার প্রকোপ : কোনো এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। যেমন : রাজশাহী।

(৬) সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস : জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিঝড় থেকে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের উদ্ভব ঘটে।

(৭) নদীর তীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন : বাংলাদেশে মোট ৬৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র তটরেখা রয়েছে। বিগত ২০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমি ক্ষয় ও নদীর ভাঙ্গন বেড়েছে। অধিকন্তু, চট্টগ্রামের সমুদ্র তটরেখা সংকুচিত হচ্ছে এবং ভূ-ভাগের দিকে এগিয়ে আসছে।

ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বর্তমান তাপমাত্রার চেয়ে 20° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত (০.২ থেকে ০.৫ মিটার) সমুদ্রে পানির স্তর বৃদ্ধি পাবে। ৫.৯ চিত্রে পানি বৃদ্ধির ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিমাণ প্রদর্শন করা হয়েছে।

২০–২৫ মিটার পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশে ডুবে যাওয়া এলাকার পরিমাণ নিম্নরূপ :

ক. অবকাঠামো (Infrastructure)	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিমাণ
(১) রাস্তা (Road)	৮০০ কিলোমিটার
(২) রেলপথ (Railways)	২৮ কিলোমিটার
(৩) নগর ও শহর (Cities and Towns)	৮৫ কিলোমিটার
(৪) বন্দর (Ports)	১টি (মংলা)
(৫) উপকূলের বাঁধ (Embankment)	১১৮৭ কিলোমিটার
(৬) উপকূলের মৎস্য এলাকা (Aquaculture)	৬৪,০০০ হেক্টর
(৭) ঘের এলাকা (Poldered area)	৭৬৪০ কিলোমিটার

খ. জন্তু ও উদ্ভিদের বাসস্থান :

(১) উপকূলীয় দ্বীপসমূহ (Islands)	৩,৫০০ বর্গ কিলোমিটার
(২) বন (সুন্দরবনসহ)	৫,৭৭০ বর্গ কিলোমিটার
(৩) নতুন প্লাবিত হওয়ার এলাকা	৫,৫০০ বর্গ কিলোমিটার

ক্ষতিগ্রস্ত জেলা, এলাকা ও জনসংখ্যার পরিসংখ্যান

জেলাসমূহ	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (%)	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গ কিলোমিটার)	ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা মিলিয়নে
১. বরিশাল	৯০	৬৫৬৯	৪.২৬
২. পটুয়াখালী	১০০	৪০৯৫	১.৫৯
৩. খুলনা	৮০	১৭৩৪	২.৮৯
৪. নোয়াখালী	৫০	২৭২৩	১.৪৪
৫. কুমিল্লা	১৫	৯১০	০.১১
৬. ফরিদপুর	১৫	১০৩২	০.৭৫

* বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা = ১৭.৫%
* বাংলাদেশের জতিগ্রস্ত জনসংখ্যা = ১১.০%

সমুদ্র স্তরের উত্থানের জন্য ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

শস্য/ফলন	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (একর)	ক্ষতিগ্রস্ত ফসল বাংলাদেশ %
আমন ধান (মৌসুমী)	৩১,৬০,০০০	২১%
আউশ ধান (গ্রীষ্ম)	৯৯,০০০	১২%
বোরো ধান (শীত)	২,৫২,০০০	৮%
পাট	৩৪,০০০	২%

৫.৮ সমুদ্রের পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস (Decreasing water taking capacity of the water basins)

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশের অসংখ্য নদীতে বন্যায় মানুষ, পশু সম্পদ, ঘরবাড়ির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। তখন নদীর পাড় ভেঙ্গে স্রোতের টানে ভেসে যায় এবং এতে নদীতে ব-দ্বীপ বা দ্বীপুঞ্জের সৃষ্টি হয়।

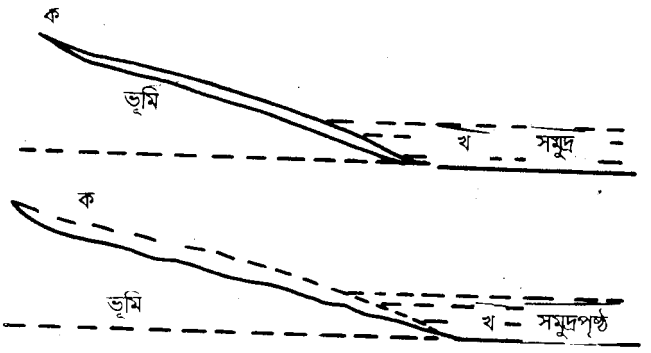

চিত্র ৫.১০ : ভূ-ভাগ ক্ষয় এবং নদী ও সমুদ্র বক্ষে পলি জমে সমুদ্র পৃষ্ঠ উঁচু হওয়ার দৃশ্য।

বড় বড় নদীতে বড় বড় চর এর উদাহরণ। যেমন : চরমোনাই, দুবলার চর, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সুদীর্ঘ সমুদ্র সৈকত প্রভৃতি এর উদাহরণ। ৫.১০ চিত্রে বৃষ্টি ও বন্যার কারণে ভূ-ভাগ ক্ষয় এবং নদী ও সমুদ্র বক্ষে পলি জমে সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হবার দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

নদীর ক্ষয়ের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। নদীর বিভিন্ন অংশে ক্ষয়ের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। নদীর উৎস অঞ্চলে পানির স্বল্পতা হেতু সেখানে ক্ষয়কার্যের ব্যাপকতা কম। কারণ, নদী তার নিম্নদিকে ক্ষয় করার শেষ সীমা (Base level of erosion) অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠের নিকটে পৌঁছে যায়।

সুতরাং দেখা যায় নদীর উৎপত্তিস্থল ও মোহনা এই দুয়ের মধ্যবর্তী অংশেই ক্ষয়কার্য অধিক হয়। এই অংশেই বহু উপনদী প্রধান নদীর সাথে মিলিত হয়ে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং নদীর ক্ষয়কার্যও বৃদ্ধি পায়। ৫.১০ চিত্রের উপরের নকশায় ভূমি ক্ষয়ের পূর্বে ভূমি রেখা কালো লাইন টেনে কখ দ্বারা এবং ভূমি ক্ষয়ের পরে ডটেড কখ লাইন টেনে ভূমিরূপে দেখানো হয়েছে।

৫.৯ ভূ-উপরিভাগের পানি বণ্টন (Sharing of water surface)

বাংলাদেশ একটি নদী বহুল দেশ হলেও এখানকার নদীসমূহের মধ্যে সব নদী গভীর নয়। তাই, বন্যার সময় দেখা যায় যে, পানি উপচে পড়ে মানুষজন, ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নেয় এবং খরা মৌসুমে নদীতে পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি এ অবস্থা হয়। তখন কৃষক পড়ে বিপাকে। গভীর নলকূপ বা কোনো কোনো এলাকায় খাল, পুকুর, নদী, বিল প্রভৃতি জলাধার থেকে ফসলের ক্ষেতে পানি সরবরাহ করা হয়। খরা মৌসুমে ভূ-উপরিভাগে অধিক পানির প্রয়োজন। এজন্য দেশের নদীনালা, খালবিল, পুকুর, জলাশয় প্রভৃতি পুনঃখনন করে সেখানে বৃষ্টি ও বন্যার পানি জমিয়ে রাখা, অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভূ-মধ্যকার পানি সীমিত স্তর (ground water level) থেকে পাওয়া যায়। কোনো এলাকার ভূ-উপরিভাগে পানি জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা একেবারেই না থাকলে সেখানে অগত্যা

ভূ-মধ্যকার পানি ব্যবহার করা চলে। অন্যথায় সেচ কার্যের জন্য ভূ-উপরিভাগের পানি ব্যবহার করা উচিত। এ পানি ব্যবহারে খরচও কম। কৃষক এ পানি সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের মাধ্যমে সরবরাহ করে কম খরচে ফসল উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু ভূ-গর্ভস্থ পানি উঠাতে মাটির গভীর পর্যন্ত গর্ত করে গভীর নলকূপ অথবা টারবাইন পাম্প স্থাপন করতে হয়। এ পাম্পের দাম ও স্থাপন খরচ বেশি পড়ে। তাছাড়া গভীর নলকূপে পানি উঠলে সেখানকার মাটির স্তর ডেবে যায়। এ অবস্থা পার্শ্ববর্তী লোকালয়, উঁচু দালান-কোঠার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়।

ভূ-উপরিভাগের পানি অধিক হারে ব্যবহার ও বণ্টনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়। যেমন :

১. নদীসমূহের উৎস থেকে যাতে বন্যা এবং খরার সময় পানি অনায়াসে গাড়িতে বহন করা যায় সে ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের দেশের সব নদীর উৎসস্থল ভারত। তাই, উভয় দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সুষ্ঠু পানির হিস্যা আদায় করা যায়।

২. বন্যার পূর্বে ড্রেজার (dreser) দিয়ে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে। বড় বড় চর এলাকা কেটে নাব্যতা আনতে অনেক খরচ। ঢিবিগুলো কেটে দিলে স্রোত বয়ে যেতে পারে এবং যেখানে নদীর তলদেশ উঁচু বা টান হয়ে গেছে সে ঢিপিগুলো কেটে দিয়ে সেখানে পানি আটকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে সব এলাকার নদীগুলোকেই পুনঃখনন করে সচল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং খরা মৌসুমেও নদী, খাল প্রভৃতিতে জমাকৃত পানি সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে।

৩. নদীর উৎসের দিকে বাঁধ এবং সাগরে পতিত হওয়ার পূর্বে বাঁধ নির্মাণ করে বিভিন্ন নদীতে পানি আটকে রাখা যায়। এ অবস্থা আমাদের দেশে নেই বলেই বন্যার পানি হঠাৎ করে সমুদ্রে নেমে যায়। ফলে, দেশের নদীগুলো মরে যায় এবং নতুন ও পুরাতন একাধিক চর জেগে ওঠে। বাঁধের দ্বারা পানি আটকে রেখে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পানি টারবাইন টার্বো জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয়। বাঁধ দিয়ে বিভিন্ন নদী, খাল প্রভৃতিতে পানি জমা করে রেখে ফসলের জমিতে খরা মৌসুমে সে পানি সেচের মাধ্যমে সারা বছর ফসল উৎপন্ন করা যায়।

৪. যেসব নদী পথে পানি, বন্যার সময় প্রবেশ করে, সেসব এলাকায় বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে ক্যাচমেন্ট এলাকা (catchment area) প্রস্তুত করা দরকার। তাহলে বন্যার প্রকোপ থেকে দেশ রক্ষা পাবে এবং খরা মৌসুমে বাঁধ ও স্লুইচ গেট (dam and sluice gate) এর মাধ্যমে এ পানিকে নদীপথে ছেড়ে নদীর নাব্যতা বজায় রাখা সম্ভব হবে। এভাবে সারা দেশে ভূ-উপরিভাগের পানির সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা যায়।

ড. এম. ইউসুফ আলি কর্তৃক বাংলাদেশ মৎস্য সম্পদ এর এক তথ্য বিবরণী মোতাবেক বাংলাদেশ ভূ-উপরিভাগের পানি সম্পদের এক হিসাব পাওয়া গেছে। যা নিম্নরূপ ছকে প্রদর্শিত হলো :

ক. খোলা পানির (Open water) এলাকা :

অ. নদী	হেক্টর
গঙ্গা (Ganges)	২৭,১৬৫
পদ্মা (Padma)	৪২,৩২৫
যমুনা (Jamuna)	৭৩,৬৬৫
উপর মেঘনা (Upper Meghna)	৩৩,৫৯২
নিম্ন মেঘনা (Lower Meghna)	৪০,৪০৭
অন্যান্য ছোট নদী ও খাল (Other Smaller rivers and canals)	২,৬২,৫৮০
	৪,৭৯,৭৩৫
আ. সামুদ্রিক এলাকা	৫,৫১,৮২৮
	১০,৩১,৫৬৩
ই. বিল	১,১৪,১৬১
	১১,৪৫,৭২৪
ঈ. মৌসুমী প্লাবনে বন্যার পানি	৫৪,৮৬,৬০৯
উ. কাপ্তাই জলাধার	৫৮,৮০০
খ. বদ্ধ পানির এলাকা	
ঊ. পানির পুকুর	১,৪৬,৮৯০
ঋ. হাওড়-বাঁওড়	৫,৪৮৮
এ. মজা বা লোনা পুকুর	১,০৮,০০০

পানি সম্পদের এ এলাকাসমূহকে এক একটি প্রকল্পের আওতায় ফেলে যুব সমাজকে কাজে লাগানো যায়। ব্যাংক ঋণ এর মাধ্যমে যুব সমাজকে প্রশিক্ষণ, পাম্প, ফসল ও মৎস্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও বীজ, সার প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দেশের ভূ-উপরিস্থ পানিকে ব্যবহার করা যায়।

দেশ স্বাধীনতার পূর্বে ঐ EPWAPDA (East Pakistan Water and Power Development Authority) ১৯৫৪ সালে দেশের পানি সম্পদ ব্যবহারের একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে। ১৯৬১ সালে EPADC অনুরূপ প্ল্যান তৈরি করে। তখন, ভূ-গর্ভস্থ পানি পাম্প ব্যবহারের জন্য LLP (Low Lift Pump), DTP (Deep Tubewell Pump)-এর ব্যবহার ছিল। দেশ স্বাধীনতার পর BADC (Bangladesh Agricultural Development Corporation), ১৯৭২ সালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্পের কাজ করে। অতঃপর ১৯৮৩ তে NWP (National Water Plan) এর মাধ্যমে এ কার্যাবলির উপর জোর দেয়া হয়। এ সময়ে জনগণের মধ্যেও খাল-খনন, ভূ-গর্ভস্থ পানি সঞ্চয়, মৎস্য চাষ, ফসলের ক্ষেতে পাম্পের মাধ্যমে পানি সেচ ইত্যাদি বিষয় বেশ জোরালো ছিল। এ জোরালো ভাবটা বর্তমানে একটু স্তিমিত হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করলে দেশ উন্নতির দিকে ধাবিত হতে পারে।

৫.১০ সমুদ্র দূষণ (Marine Pollution)

নদী ও সমুদ্রে অনেক ধরনের যান চলাচল করে। যেমন : জল জাহাজ, সামুদ্রিক তরি, স্টিমার, লঞ্চ, স্পিডবোট, ফেরি, ডুবোজাহাজ, নৌযুদ্ধ জাহাজ, গান-বোট ইত্যাদি। এসব যানে ভারি ভারি ডিজেল ইঞ্জিন, গ্যাস টারবাইন প্ল্যান্ট ব্যবহৃত হয় যাতে জ্বালানি হিসেবে ডিজেল, ক্রুড অয়েল, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (LPG), পারমাণবিক জ্বালানি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। তদুপরি, ইঞ্জিন, বিয়ারিং এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশে গ্রিজ, লুব অয়েল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। নদী, খালবিল এবং সমুদ্রে নৌযান সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট দূষণ নিচে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন :

(১) নৌযানের তেল (Oil of Marine Engines) : নদী ও সমুদ্রে যেসব নৌযান চলে তাতে পেট্রোল, ডিজেল, পিচ্ছিলকরণ তেল, গ্রিজ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। প্রোপেলার, ইঞ্জিন, টারবাইন ইত্যাদির আধার, পাইপ লাইন, অয়েলমিল, বিয়ারিং প্রভৃতি থেকে তেল লিকেজের মাধ্যমে পানিতে পড়ে পানি দূষিত হয়। তেল পানির সাথে মিশে যায় না, এটি ভাসমান অবস্থায় যে ফেনা তৈরি করে তা পানিকে দূষিত করে। তেলের ফেনাযুক্ত পানি বিষাক্ত হয়ে যায়, যা মৎস্য সম্পদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক।

সমুদ্র দূষণের শতকরা ৫০ ভাগ দূষণ জ্বালানি ও পিচ্ছিলকরণ তেল দ্বারা সংঘটিত হয়। জাহাজ কারখানায় (dockyard) গেলে এ দূষণের মাত্রা অনুধাবন করা যায়। মংলা বন্দর, নারায়ণগঞ্জ জাহাজ কারখানা, চট্টগ্রাম জাহাজ কারখানা প্রভৃতিতে তেল দ্বারা সমুদ্র দূষণের মাত্রা সর্বাধিক। বুড়িগঙ্গার পানি এভাবে দূষিত হচ্ছে। চট্টগ্রামের জাহাজ কারখানায় বাৎসরিক তেল লিকেজের পরিমাণ ৫,০০০ মেট্রিক টন।

(২) ট্যাঙ্কারের তেল (Tanker Oil) : আমাদের দেশে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ব্যারেল জ্বালানি তেল আরব রাষ্ট্র থেকে আমদানি করা হয়। এই তেল জাহাজে বহন করে আনা হয়। আবার, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের তেল আমদানি ও রফতানি হয় তেলবাহী জাহাজের মাধ্যমে। এই তেলকে পরিশোধনাগারে পাঠানোর সময় যে তেল পানিতে পড়ে যায়, তার মাত্রা বছরে ৫০,০০০ মেট্রিক টন। আবার, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে অনেক সময় তেলবাহী জাহাজ পানিতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হলে তেল বেরিয়ে যায়। ফলে, তেল দ্বারা সমুদ্র দূষণ ঘটে।

(৩) ব্যালাস্ট পানি (Balast Water) : লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ প্রভৃতির পাটাতনের নিচে পানির মধ্যে জ্বালানি, তেল ও মোবিল ধোয়া পানি জমা হয়। পরবর্তীতে জলযান বন্দর থেকে ছেড়ে যাবার পূর্বে এই পাটাতনের নিচের পানি নিষ্কাশন করা হয়। এই নিষ্কাশিত পানিকে ব্যালাস্ট পানি বলে। বিশ্বের অনেক জাহাজ কারখানায় এ ব্যালাস্ট পানি সমুদ্রে ফেলার অনুমতি নেই। কিন্তু বাংলাদেশে অলিখিতভাবে হলেও এ পানি সমুদ্রে ফেলার অনুমতি আছে। ফলে, ব্যালাস্ট পানি দ্বারা সমুদ্র দূষণ ঘটে।

(৪) বিলোজ পানি (Belows Water) : জাহাজের প্রশস্ত ইঞ্জিন কক্ষকে বিলোজ কক্ষ বলে। এ কক্ষের মেঝেতে জ্বালানি, মোবিল, গ্রিজ পানির সাথে মিশে জমা হয়। এ পানি অধিক জমে গেলে তা সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়। ফলে, এই বিলোজ পানি দ্বারা সমুদ্রের পানি দূষিত হয়। আমাদের দেশের চট্টগ্রাম, মংলা, চালনা, নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড প্রভৃতি বন্দরে প্রতিবছর প্রায় ১০ মিলিয়ন লিটার বিলোজ পানি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। এই পানি ফেলে না দিয়ে যদি তেল শোধনাগারের মাধ্যমে তেল সংগ্রহ করা হতো, তাহলে :

(ক) জ্বালানি, মোবিল ও গ্রিজ এর যোগান বৃদ্ধি পেতো,

(খ) পানি দূষণ রোধ হতো এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকতো,

(গ) এজন্য জলজ প্রাণীর জীবনহানী ঘটতো না, প্রভৃতি।

(৫) জাহাজে জমাকৃত বর্জ্য (Accumulated Waste in the Ship) : লঞ্চ, স্টিমার, জলজাহাজের ডেক, গুদাম প্রভৃতিতে বিভিন্ন জিনিসপত্র উঠানো হয়। যেমন : ফলমূল, মাছ, মাংস, সবজি, সিমেন্ট, সার ইত্যাদি। এসব দ্রব্যের ছেঁড়া বস্তা, উচ্ছিষ্ট খাবার, বাসি ও পচা খাবার, পচা ফলমূল প্রভৃতি একসাথে জমা হলে তা নদী বা সমুদ্রে ফেলা হয়। এগুলোর মধ্যে জলজ প্রাণী কিছু খেয়ে ফেললেও পচা দ্রব্য, টয়লেট থেকে পতিত মলমূত্র ইত্যাদি দ্বারা পানি দূষিত হয়। জাহাজে জমাকৃত বর্জ্য এভাবে সমুদ্রে না ফেলে তা ভূমিতে গর্তের মধ্যে নিষ্কাশন করলে সমুদ্র দূষণ ঘটতো না। জাহাজে জমাকৃত টিন, প্লাস্টিক, কাগজ, লোহা, পচনশীল দ্রব্য ইত্যাদি আলাদা করে সংরক্ষণ এবং পুনঃচক্রের মাধ্যমে ব্যবহার করলে সমুদ্র দূষণ রোধ হয়।

(৬) রাসায়নিক পদার্থ অপসারণ (Disposal of Chemical Element) : চামড়া, সার, সিমেন্ট, কাগজের কল প্রভৃতি থেকে যে তরল বর্জ্য নিঃসৃত হয়, তা অনেক সময় নদী, জলাশয় অথবা সাগরে অপসারণ করা হয়। এই ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা নদী বা সাগরের পানি দূষিত হয় এবং জলজ প্রাণী মরে যায়। এই পদার্থ যদি বিশোধন করে ছাড়া হয়, তাহলে নদী বা সমুদ্র দূষণ ঘটত না। উল্লেখ্য যে,উপকূল এলাকায় অবস্থিত চামড়া শিল্প, কর্ণফুলী কাগজকল, খুলনা হার্ডবোর্ড মিল, ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা প্রভৃতি থেকে তরল রাসায়নিক পদার্থ অপসারিত হয়।

(৭) জাহাজ ভাঙ্গা যন্ত্রাংশ (Parts of broken ship) : খারাপ আবহাওয়ায় নদী বা সমুদ্রে লঞ্চ, স্টিমার ও জাহাজ নিমজ্জিত হলে তা উঠাতে গেলে এটির যন্ত্রাংশ ভেঙ্গে যায়। আবার পুরাতন জাহাজ ভেঙ্গে বা কেটে অন্যান্য ছোট নৌযান প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু, ডুবন্ত বা ভাঙ্গা জাহাজের অনেক জিনিসই পরিত্যক্ত থেকে যায়। পুরাতন জাহাজের যন্ত্রাংশ পানিতে ভাসতে থাকলে তার সাথে তেল, চর্বি ভাসতে দেখা যায়। তদুপরি, লোহা, ধাতবপাত্র ইত্যাদির মরিচা থেকেও পানি দূষিত হয়। এ কারণে, জাহাজের কোনো অংশই পানিতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে আসা ঠিক নয়।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সার্কভুক্ত (SAARC) দেশগুলোর নাম লিখ।

উত্তর : দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশগুলো হচ্ছে : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ।

২। গ্রীন হাউজ (Green House) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : ইংরেজি শব্দ "Green House" এর বাংলা আভিধানিক অর্থ সবুজ ঘর। ব্যাপক অর্থে পৃথিবী হলো গ্রীন হাউজ, যেখানে বাড়িঘর, সবুজ গাছপালা, নদী–নালা, কল–কারখানা প্রভৃতি রয়েছে।

৩। পাঁচ প্রকার গ্রীন হাউজ গ্যাসের নাম লিখ।

উত্তর : পাঁচ প্রকার গ্রীন হাউজ গ্যাস হলো : কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), কার্বন মনোক্সাইড (CO), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC), মিথেন (CH_4) এবং ওজোন (O_3) গ্যাস।

৪। ওজোন (Ozone) কি ধরনের গ্যাস?

উত্তর : ওজোন বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশের জন্য একটি অনুকূল গ্যাস, যা বাতাসের দুটি অক্সিজেন (O_2) এবং একটি ভাসমান অক্সিজেন (O) অণুর সাথে মিশে উৎপন্ন হয়।

৫। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া (Green House Effect) কি?

উত্তর : গ্রীন হাউজ গ্যাস অধিক হারে নির্গত হতে থাকলে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এবং উত্তর মেরুর বরফ পিণ্ড গলতে থাকলে পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল ডুবে যেতে থাকবে। এটি এক ধরনের গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া।

৬। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া রোধে কি কি করণীয়?

উত্তর : গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া রোধে গ্রীন হাউজ গ্যাসের উদ্‌গীরণ কমাতে এবং ভূ-পৃষ্ঠের বনায়ন ব্যাপকহারে বাড়াতে হবে।

৭। ওজোন (Ozone) গ্যাস পরিবেশের জন্য কি ভূমিকা রাখে?

উত্তর : ওজোন একটি পরিষ্কার নীল রঙের গন্ধযুক্ত গ্যাস। ভূ-পৃষ্ঠ হতে ১০ থেকে ২৫ কিলোমিটার উপরে এই গ্যাস সর্বাপেক্ষা বেশি। এই গ্যাস যেমন ক্ষতিকর আবার এটি আমাদের বায়ুমণ্ডলকে সুরক্ষার কাজও করে। এটি সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ছেঁকে নেয় এবং ক্ষতিকর রশ্মিকে গ্রীন হাউজে পৌঁছাতে দেয় না।

৮। ওজোন স্তরের ভূমিকা কি?

উত্তর : ওজোন স্তর প্রকৃতির বন্ধু হিসেবে কাজ করে। এটি সূর্যরশ্মির নিরাপত্তামূলক ছাঁকন যন্ত্র হিসেবে ভূমিকা রাখে।

৯। সমুদ্র স্তর উপরের দিকে উঠতে পারে কি কারণে?

উত্তর : ওজোন স্তরের ক্ষয়ের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে উত্তর মেরুর বরফ গলে এই কাণ্ড ঘটতে পারে।

১০। সমুদ্রের পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাবার কারণ কি?

উত্তর : অতিরিক্ত ভূমি ক্ষয় হয়ে সমুদ্রতলে জমা হতে থাকলে সমুদ্রের পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে।

১১। সমুদ্র দূষণের (Marine Pollution) কারণ কি?

উত্তর : সমুদ্রে বিভিন্ন প্রকার জলযান, তেলবাহী আধার প্রভৃতি থেকে নিঃসৃত জ্বালানি, পিচ্ছিলকরণ তেল, গ্রিজ প্রভৃতির কারণে সমুদ্র দূষণ ঘটে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। শীত প্রধান দেশে গ্রীন হাউজের ভূমিকা লিখ।

উত্তর : গ্রীন হাউজ বলতে সবুজঘর বুঝায়। শীত প্রধান অঞ্চলে শীতের দিনে অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা থাকে এবং অনবরত বরফ পড়ে। তখন, গাছপালা, ফুল-ফল, শাক-সবজি বরফের পরিবেশে জন্মাতে পারে না। সে কারণে এগুলোকে কাচের দেওয়াল ও ছাদবিশিষ্ট সবুজ ঘরে উৎপাদন করা হয়। কারণ, এ ঘরের মধ্যে গাছপালা

জন্মাবার জন্য প্রয়োজনীয় আলো বাতাস পৌঁছাতে পারে, কিন্তু বরফ ঢুকতে পারে না। এটি দো-চালা ঘরবিশিষ্ট বলে উপরে বরফ জমতে পারে না।

২। টীকা লিখ (যে কোনো দুটি)

(ক) কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস, (খ) কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাস ও (গ) ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাস।

উত্তর : (ক) কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস : গ্রীন হাউজের ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টির জন্য মূলত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসই দায়ী। তবে, একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে এ গ্যাস গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার জন্য ৪৯% এবং অবশিষ্টের জন্য অন্যান্য গ্যাস দায়ী। মূলত জ্বালানির কালো ধোঁয়া থেকে এ গ্যাস উৎপন্ন হয়।

(খ) কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাস : ইঞ্জিনের দহন প্রকোষ্ঠে বা চুল্লির অপোড়া বা আধাপোড়া জ্বালানি দহন থেকে এ গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটি বদ্ধ ঘরে অবস্থানরত জীবজন্তুর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দেয় এবং এটি গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

(গ) ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাস : ফ্রিজ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, অ্যারোসল প্রভৃতির লিকেজ থেকে এই গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং এটি গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী।

৩। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া (Green House effect) কি?

উত্তর : গ্রীন হাউজ গ্যাস তথা কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাস, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2), সালফারের অক্সাইড (SO_2), ওজোন (O_3) গ্যাস ইত্যাদি গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং উত্তর মেরুর বরফ গলতে পারে। এজন্য বিশ্বের নিম্নাঞ্চলগুলো ডুবে যেতে পারে।

৪। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া রোধে করণীয় কি, লিখ।

উত্তর : গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া রোধে করণীয় কার্যাবলি নিম্নরূপ :

(১) রাস্তার ধার, নদীর পাড়, পতিত ভূমিতে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা রোপণ করে বনায়ন বৃদ্ধি করতে হবে।

(২) কলকারখানা ও যানবাহন থেকে ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন বন্ধ এবং গ্যাস বিশোধন প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে।

(৩) জ্বালানি চালিত ইঞ্জিনের পরিবর্তে ব্যাটারি, সৌরশক্তি চালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করতে হবে।

(৪) ক্ষেতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাতে এবং জৈব সার ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

(৫) ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা আনয়ন এবং যান্ত্রিক উপায়ে পোকামাকড় দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। ওজোন স্তর ও এটির প্রতিক্রিয়া (Ozone layer and its effect) বর্ণনা কর।

উত্তর : বায়ুমণ্ডলের নিচের দিকে এবং সুপারসনিক বিমান উড্ডয়ন সীমার উপরে যে বিষাক্ত তীব্র গন্ধযুক্ত দ্রবীভূত গ্যাসের স্তর আছে, তাকে ওজোন স্তর বলে। এই গ্যাস যেমন ক্ষতিকর আবার এটি বায়ুমণ্ডল সুরক্ষার কাজও করে। এই গ্যাস সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণকে ছেঁকে পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রেরণ করে এবং জীবজগৎকে রক্ষা করতে সহায়তা করে।

৬। ওজোন গ্যাসের ক্ষতিকর কার্য কোনগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : ওজোন গ্যাসের ক্ষতিকর কার্যাবলি নিম্নরূপ :

(১) এটি জীবিত কোষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক এবং এটির প্রভাবে বুকে ব্যথা, কফ হয় বা চোখ জ্বালা করে।

(২) অধিক সময়ে ১ পিপিএম ঘনত্বে ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগ রেখে দিলে তা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

(৩) ওজোন গাছপালার জন্যও ক্ষতিকর। আঙ্গুর, আঁখ, বিট, লেটুস, তামাক প্রভৃতির জন্য ওজোন ক্ষতিকর।

(৪) এই গ্যাস নাইলন, পলিস্টার, অ্যাসিটেট কাপড়ের জন্য ক্ষতিকর।

(৫) এটি রাবারের টায়ারে ফাটল ধরায়।

৭। সমুদ্রপৃষ্ঠের বৃদ্ধি ও এটির প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর।

উত্তর : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি নিম্নবর্ণিত দুটি কারণে ঘটে, যেমন :

(১) ভূমি ক্ষয়ের মাধ্যমে সমুদ্র তল উঁচু হওয়া এবং

(২) বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রভাবে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে উত্তর মেরুর বরফ গলতে পারে এবং সে পানিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে।

প্রভাব : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি হলে বিশ্বের বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। এতে সে এলাকার জীবজন্তু, ফসল, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গ্রীন হাউজ এবং এটির প্রতিক্রিয়া কি? চিত্র ও উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২। বাংলাদেশে গ্রীন হাউজের প্রতিক্রিয়া এবং এটি রোধে কি করণীয় বর্ণনা কর।

৩। ওজোন গ্যাস, ওজোন স্তর এবং এটির প্রতিক্রিয়া চিত্র ও উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪। ওজোন স্তরের ক্ষয় বলতে কি বুঝ? সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর।

৫। সমুদ্রের পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস ঘটে কিভাবে? বাংলাদেশের ভূ-ভাগের পানি বণ্টন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৬। টীকা লিখ (যে কোনো তিনটি)

(ক) গ্রীন হাউজ গ্যাস (Green House Gas),

(খ) শীত প্রধান দশে গ্রীন হাউজের ব্যবহার (Use of green house in cold country),

(গ) গ্রীন হাউজের প্রতিক্রিয়া (Green House Effect),

(ঘ) ওজোন স্তর ও প্রতিক্রিয়া (Ozone layer and its effect)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবেশগত কাঠামো, নীতিমালা ও নির্দেশনা

(Environmental Framework, Policies and Guidelines)

৬.১ পরিবেশগত কাঠামো (Environmental Framework)

পৃথিবী সৃষ্টিকালীন অবকাঠামোর সাথে বর্তমানের অবকাঠামোর ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। একথা ভূগোল ও ইতিহাস থেকে জানা যায়। পূর্বে পৃথিবীতে বনাঞ্চল ছিল অধিক এবং জনসংখ্যা ছিল কম। আর বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় সভ্য সমাজে বনাঞ্চল উজাড় করে নগরায়ণ করা হচ্ছে এবং জনসংখ্যা ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উৎপাদনের ফলে বিশ্ব পরিবেশ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ ভারতের হিমালয় পর্বতের জটিল অববাহিকায় (Complex interface) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত। এ দেশ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে চির বৈমাতৃসুলভ যেখানে ভূ-খণ্ড অবস্থার বৈচিত্র্যতা এবং অসংখ্য নদী থেকেও যেন না থাকার মতো অবস্থা হয়েছে। আজকাল, যেখানে জন্তু ও উদ্ভিদের আবাসিক অঞ্চলের অবক্ষয় লক্ষণীয় সেখানে প্রাণীকুলের হ্রাসের হারও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এখন থেকে ২০ বছর পূর্বে যেসব প্রাণীকুল দেখা গেছে, তার অনেকটাই আজ চোখে পড়ে না।

বন্যপ্রাণী ও গাছপালা জন্মানোর এলাকা নিশ্চিহ্ন করা, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদকুল নিধন করা, উদ্ভিদ ও বনজঙ্গল কেটে অধিক জনসংখ্যার আবাসস্থল করা ইত্যাদি কারণেই জীবজন্তু ও গাছপালার সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তদুপরি, উদ্ভিদ, বাগান বৃদ্ধি এবং জীবজন্তু সংরক্ষণের উপর কোনো নিরীক্ষণ (Survey) না থাকাই এই অবস্থার জন্য দায়ী।

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু, প্রাণী, মানবকুল, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি বাস করে। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণীকুলের বসবাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, খাদ্যদ্রব্য, জলবায়ু ও আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়। প্রাণীকুলকে বাঁচানো এবং তাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অন্যথায়, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে একে একে প্রাণীকুল ধ্বংস হবে, পরিবেশ পুনরায় না ফিরলে সে প্রাণীর জন্ম বা আগমন আর ঘটবে না। অনুকূল পরিবেশ না থাকার জন্য কিছু প্রাণী পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। যেমন—ডাইনোসর জাতীয় প্রাণী।

আগে দেশে প্রচুর বনজ সম্পদ ছিল। এতে দেশে জীবজন্তু, প্রাণীকুল স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারতো। বর্তমানে বনরাজি ধ্বংসের ফলে এ ধরনের প্রাণীকুল অনেক কমে গেছে। অপরদিকে, জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বাড়তি জনসংখ্যার জন্য দ্রব্যের বাড়তি চাহিদা হয়। ইদানিং বনজ সম্পদ বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিলেও ইতিপূর্বে বনজ সম্পদ ও প্রাণীকুল রক্ষা এবং জীবজন্তুর নির্ভয়ে বসবাস ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয় অরণ্যের প্রসার ঘটানো হয়নি।

বাংলাদেশে মোট সমতল ভূমি রয়েছে ১৪.৪ মিলিয়ন হেক্টর। তন্মধ্যে মাত্র ৯.১ মিলিয়ন হেক্টর জমি কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়, ২.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি বা বনজ সম্পদ দখল করে আছে, ২.৩১ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি রেকর্ডের আওতায় এবং অবশিষ্ট ভূমি অন্যান্যভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই, ভূমির যথাযথ ব্যবহার অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। ভূমিকে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে ব্যবহারের কার্যকর পদ্ধতি নিম্নরূপ—

১. উন্নত ফলনশীল জাতের চাষাবাদের ভূমিসহ কৃষিক্ষেতের প্রসারণ ;
২. পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার মধ্যস্থতা ;
৩. গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উন্নয়ন ;
৪. শিল্পায়ন।

উন্নত ফলনশীল জাতের চাষাবাদ সম্পর্কে বর্ণনা দিলেও কার্যত প্রচলিত ভূমি কর্ষণ ও আবাদের প্যাটার্নই ব্যবহৃত হয়। জলাভূমি (Wet land), বন্যজন্তু ও প্রাণীর আবাসভূমি দিন দিন কমে যাচ্ছে। দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলে ভূমি চাষাবাদের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে হাজার হাজার একর জমিতে চিংড়ি চাষ হয়েছে। বনবিভাগ বাড়ানোর জন্য যে এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই এলাকাগুলো চিংড়ি চাষীদের ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ : চকোরিয়া, সুন্দরবন প্রভৃতি এলাকার প্রায় ৩,০০০ হেক্টর জমি চিংড়ি চাষীদের কাছে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বিস্তীর্ণ এলাকায় বনভূমির গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, যাতে চিংড়ির ঘের এর বাঁধ নির্মাণ এবং অভ্যন্তরীণ খাল তৈরিতে কৃষকদের কোনো অসুবিধা না হয়। পরিবেশগত অবকাঠামো এবং ভারসাম্য রক্ষার দিক দিয়ে এটি একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পূর্বে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে আমাদের দেশের ভূ-সম্পদের ১৪% বনজ সম্পদ রয়েছে। তবে, মূলত এ বনভূমির পরিমাণ অনেক কম, যার পরিমাণ মোট ভূ-সম্পত্তির ৮ থেকে ৯% যা একটি দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু ঠিক রাখা, পরিবেশ দূষণ রোধ, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুবই অপ্রতুল। দেশের জীবজন্তু, পশুপাখি, বনজ সম্পদ সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে দেখা গেল যাদের কোনো কোনোটি নিশ্চিহ্ন হওয়ায় পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

৬.২ জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন (International Convention on Climate)

বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাদের এলাকার আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমুদ্র, নদী, বাতাস, সংস্কৃতি, কৃষি সম্পদ প্রভৃতিকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য যে সম্মেলন করে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাকে আন্তর্জাতিক পরিবেশ বা জলবায়ু সংক্রান্ত সম্মেলন বলে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (Ministry of Environment and Forest) এ ব্যাপারে আমাদের দেশ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে। দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কার্যকর দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ, পরিবেশ দূষণ রোধ প্রভৃতি সম্পর্কে ১৯৬৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তারই সূত্র ধরে ১৯৭২ সালের জুন মাসে সুইডেনের স্টকহোমে মানব পরিবেশের উপর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর, ১৯৮৩ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব কমিশন গঠিত হয় এবং এ কমিশনে বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চেয়ারম্যানের নাম অনুযায়ী এই কমিশনের নাম হয় ব্রুনল্যান্ড কমিশন (Brundland Commission)। অতঃপর, জাতিসংঘ ১৯৮৯ সালে বিশ্ব পরিবেশ উন্নয়নের উপর একটি বৃহত্তর সম্মেলন আহ্বান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

উদ্ভিদ ও জীবের বৈচিত্র্যের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন আগস্ট ২২-২৩, ১৯৯৪ তে ভারতের ব্যাঙ্গালোরে (The International Consultation on Biological Diversity, Bangalore, India) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ এবং UNEP (United Nation Environmental Pollution) টিমও প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৯০-তে দক্ষিণ এশিয়ার সংরক্ষিত এলাকা সম্পর্কিত IUCN এর তথ্য মোতাবেক বিশ্ব সংরক্ষণ একতা নামে সুইজারল্যান্ড ও ক্যাম্ব্রিজে পরিবেশ সম্পর্কে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৩ তে বাংলাদেশের মিঠাপানি-প্লাবিত এলাকা এবং ব্যবস্থাপনা (Freshwater wetlands in Bangladesh issues and Approach Management) শীর্ষক IUCN এর জলাভূমির প্রোগ্রামে বনজ সম্পদের বৈচিত্র্যতা এবং মিঠাপানি অঞ্চল সংরক্ষণ উপলক্ষে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এসব আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ দেশের পরিবেশ রক্ষার্থে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বাণিজ্য বিষয়ে একে অপরকে সহায়তা দান, পানি এবং বাতাস দূষণমুক্ত রাখা প্রভৃতি সহযোগিতার জন্য মত বিনিময় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বার্লিনে জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক সম্মেলন : বার্লিন ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ সম্মেলন শেষ হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতিনিধি এবং উত্তর ও দক্ষিণের দেশ থেকে আগত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি গ্রীন হাউজ গ্যাস নিরোধে শিল্পোন্নত দেশসমূহের ঐকান্তিক প্রতিশ্রুতির অভাবকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিবেচ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন।

দক্ষিণ এশিয়ার সার্ক (SAARC) এর সাত জাতির পরিবেশ ও বন সম্পর্কিত সম্মেলন জানুয়ারি ৯ থেকে ১২, ১৯৯৫ তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯৫ সালের ২৮ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল জার্মানির বার্লিন শহরে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের উপর অবকাঠামোগত সম্মেলন (FCCC) পরবর্তী কর্মসূচি, যা ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওতে (RIO of Brazil) অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনের সময় ১৫০টির অধিক সংখ্যক রাষ্ট্র ও সংগঠন কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

বার্লিন সম্মেলনের উদ্দেশ্য : এ সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাসের উদগীরণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঐক্যমতে পোঁছানো ও একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। বার্লিন COP-I জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক FCCC চুক্তির ২(ক) এবং (খ) অনুচ্ছেদের যথার্থতা পুনঃপর্যালোচনা করে এবং শিল্পোন্নত দেশসমূহে বায়ু দূষণ রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এ সম্মেলনের সর্বোপরি উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসের উপায় নির্ধারণ করা। কেবল যথাযথ আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এ উপায় নির্ধারণ করা সম্ভব।

বার্লিন সম্মেলনে জাতীয় যোগাযোগ পুনঃপর্যালোচনা, প্রতিশ্রুতির যথার্থতা, প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস, সম্মেলনে প্রক্রিয়ার নিয়মাবলি ইত্যাদি বিষয়সমূহের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বার্লিন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অবকাঠামো সম্মেলনের (Framework Convention) নির্ধারিত বিভিন্ন বিধি বিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যেন উন্নত দেশসমূহ জলবায়ুর পরিবর্তন ও তার বিরূপ প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। বার্লিন COP-1 সম্মেলনে একটি আইনগত নীতি প্রণয়ন করে, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র ও সংগঠনসমূহের ২০০০ সালের মধ্যে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন স্থিতিশীল করার প্রতিশ্রুতিকে অপর্যাপ্ত চিহ্নিত করে এবং আরও কার্যকর ও ইতিবাচক প্রতিশ্রুতির জন্য প্রস্তাব করে। এ ছাড়াও COP-1 বার্লিনে একটি সচিবালয় স্থাপনেও সম্মতিজ্ঞাপন করে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বাংলাদেশ সমীক্ষা : সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের উপর দুই বছর মেয়াদি এক সমীক্ষার কাজ হাতে নিয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর এ গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বয় করছে।

এই গবেষণার চারটি মূল ক্ষেত্র নিম্নরূপ :

(১) গ্যাস নির্গমনের তালিকা প্রস্তুত করা,

(২) বিপন্নতা অভিযোজন নিরূপণ,

(৩) তীব্রতা হ্রাস করা এবং

(৪) সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

গবেষণার প্রতিটি উপাদানই সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত এক একটি দল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন বিভাগ যেমন, ইউ.এস.পি.এ (USPA), স্বরাষ্ট্র বিভাগ, জ্বালানি বিভাগ, এন.ও.এ.এ. (NOAA) এবং ইউ.এস.এ.আই.ডি (USAID) এর প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি কমিটি গঠিত। এ কমিটি গবেষণায় সহযোগিতা প্রদান এবং বাংলাদেশ ছাড়াও ৪০টি উন্নয়নশীল দেশে, সি.আই.এস (C.I.S) ভুক্ত দেশে সহযোগিতা করে থাকে। "ইন্টার গভর্নমেন্ট্যাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ" (IPCC) নির্দেশিকাকে অনুসরণ করে ইউ.এস. কান্ট্রি স্টাডি টিম (U.S. Country Study Team) এ গবেষণার পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি সমীক্ষা দলের জন্য আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বিপন্নতা ও অভিযোজন কর্মশালা হনলুলুতে এবং গ্যাস নির্গমনের তীব্রতা কর্মশালা সানফ্রান্সিসকো-তে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যাশা করা হয় যে, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা জগতে এক নতুন ধারার সূচনা করবে। সম্ভাব্য বিপন্নতা নিরূপণে বাংলাদেশ সমীক্ষা ইতোমধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন সমীক্ষা হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং অন্যান্য দেশের সম্ভাব্য বিপন্নতা নিরূপণকারী দলের প্রশিক্ষণ দানের জন্য বাংলাদেশ দল আমন্ত্রিত হয়েছেন।

৬.৩ জলবায়ু পরিবর্তনের উপর সম্মেলনের কাঠামোগত কার্যাবলি (Framework of Convention on Climate Change)

বিশ্বের আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তার কাঠামোগত কার্যাবলিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে।

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

(১) জীবজন্তু বৈচিত্র্য সম্মেলন (Biodiversity Convention) : ১৯৯২ সালে রিও (Rio) তে বাংলাদেশের জীবজন্তুর বৈচিত্র্যতা সম্মেলনের দলিল স্বাক্ষর করা হয় এবং তা ১৯৯৪-তে অনুমোদিত হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ দেশের মানুষের বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরির জন্যই আবহাওয়া সংরক্ষণের মাধ্যমে জীবজন্তু ও গাছপালার বৈচিত্র্যের হার রোধ করতে হবে। কিছু আইনগত ব্যবস্থা নেয়ারও পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

(২) ওজোন হ্রাসকারী পদার্থের উপর মনট্রিলে কুটনৈতিক দলিল (Montreal Protocol on Ozone depleting Substance) : কোনো কোনো পদার্থ ওজন স্তর হ্রাস (ODS) করেছে, বাংলাদেশ এ ব্যাপারে নিরীক্ষণমূলক কার্যক্রম প্রস্তুত করেছে। মন্ট্রিলের কুটনৈতিক দলিলের আওতায় দেশকে খণ্ড খণ্ড পরিকল্পনা কার্যক্রমে ভাগ করা (Phase out) হয়েছে। একটি ওজোন সেলও (Ozone cell) একই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এতে, কিছু শিল্প কারখানা উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই দলিলে বাংলাদেশ প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ।

(৩) জলাভূমি সংরক্ষণের উপর রামসার সম্মেলন (Ramsar Convention on Waterlands Conservation) : বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী রামসার সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের বিপদসঙ্কুল জলাভূমি সংরক্ষণ করা।

(৪) আলোচ্য বিষয় ২১ (Agenda 21) : এটি ছিল লিখিত কর্মসূচি। এটির জন্য কাউকে জবাবদিহি বা দায়ী করার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ ছিল না। প্রত্যেক দেশই তার দেশের নিজ নিজ আলোচ্য বিষয় তৈরি করেছে। অতি সম্প্রতি বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ করার জন্য একটি জাতীয় পরিবেশ পরিষদ (National Environment Committee) গঠন করা হয়েছে, যার নাম "জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যকর পরিকল্পনা" (National Environment Management Action Plan or NEMAP)। আন্তর্জাতিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এটি করা হয়েছে।

(৫) সমুদ্র আইনের উপর জাতিসংঘের সম্মেলন (The United Nations Convention on the Law of the Sea) : জাতিসংঘের প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সমুদ্র আইনের উপর এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যাতে ১০ম থেকে ২০তম খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের উপর আইন প্রণয়নে বিশেষ জোর দেয়া হয়।

বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা সংরক্ষণের জন্য এটি একটি ভালো পদক্ষেপ বলে স্বীকৃত হয়। এদেশের জলযান ও মৎস্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এটি যুগান্তকারী সুবিধা বলে বাংলাদেশে কথিত হয়।

(৬.) আন্তঃএলাকা পরিভ্রমণকারী যানবাহন দ্বারা দূষণের উপর বাসলে সম্মেলন (Basle Convention on Transboundary Transport of Pollutants) : আলোচনা মোতাবেক, "শিল্পকারখানার রাসায়নিক এবং বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা" বাস্‌লে সম্মেলনে উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পায়। বাংলাদেশ এ সম্মেলনের খসড়াতে স্বাক্ষরদান করে।

৬.৪ জাতীয় পরিবেশ সংক্রান্ত আইনসমূহ (National Environment laws)

দেশের পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা করার জন্য যে আইন (Laws or Act) রয়েছে, তাকে জাতীয় পরিবেশগত আইন বলে। তবে, বর্তমানে যে পরিবেশগত আইন রয়েছে, সে আইন

দ্বারা কারোর উপর বল প্রয়োগ করা তেমন উপযোগী নয়। বনজ সম্পদ ও জীবজন্তুর এলাকা সংরক্ষণ করতে হলে প্রচলিত আইনের কিছু রদবদল করা প্রয়োজন। দেশের বনজ সম্পদ, পানি সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, আবহাওয়া ও জলবায়ু, পরিবেশ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার জন্য একাধিক ব্যবস্থাপনা সংস্থা রয়েছে। পরিবেশগত অ্যাক্ট প্রতি বছর নবায়ন করা বা আলোচনাক্রমে পরিবেশের জন্য উপযোগী করা হয় এবং প্রতিবেশী দেশের সমন্বয়েই প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ইকোলজিক্যাল রিলে মেকানিজম (Central Ecological relay mechanism) সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। এগুলোর মধ্যে পানি সম্পদ পদ্ধতি (Water system) বৃক্ষ নিধনের প্রতিক্রিয়ার সাথে সরাসরি জড়িত থাকে। তদুপরি, মৎস্য সম্পদ উৎপাদন, কৃষি সম্পদ উৎপাদন, শিল্প কারখানা উন্নয়ন, আবাসিক ও শিল্প কারখানা দূষণ ইত্যাদি সংস্থা জড়িত থাকে।

দেশের বনজ ও জীব সম্পদের বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণ ও ধারণ করার জন্য সরকার কর্তৃক ব্যাপক কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন :

১. ১৯৮৯ সালে অধিকতর জনসমর্থন আদায়ের জন্য পরিবেশ বিভাগ (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন) গঠন করা হয়।

২. সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরিবেশগত পরীক্ষণ তথ্যাবলি অনুযায়ী সব নতুন উন্নয়ন প্রকল্পকে মেনে নেয়া উচিত।

৩. জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলের সূত্র উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে বলে স্বীকৃত হয়।

৪. অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের (Sustainable development) জন্য একটি পরিবেশগত কৌশল বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

৫. জাতীয় পরিবেশগত নীতি এবং আইন বাস্তবায়ন করা হয়।

৬. জাতীয় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার কার্যকর পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা হয়।

৭. জাতীয় বন সম্পদ উন্নয়ন নীতিতে দেশের সম্পদ উৎসের সম্প্রসারণ (resource expansion) সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক ব্যবহারের জন্য সূত্র বাস্তবায়ন করা হয়।

৮. বন সম্পদ বিষয়ক মূল পরিকল্পনা (forestry master plan) বাস্তবায়নাধীন রাখা হয়।

৯. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ সম্পর্কে একটি নতুন বিষয় প্রবর্তন করা হয়।

১০. সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্র সচল রাখা এবং জমির উর্বরতা ও বনজসহ জীব সম্পদের বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণ করা হয়।

১১. সংঘবদ্ধভাবে বাড়ির কিনারে, জমির সীমানায় এবং সীমানার সন্নিকটে গাছ লাগানো এবং বৃক্ষ মেলার (tree fair) বন্দোবস্ত করা হয়।

১২. জাতীয় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কার্যকর পরিকল্পনা সূত্র উদ্‌ঘাটন করা হয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে পরিবেশ সংক্রান্ত যে আইন জারি করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো।

১. বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন,

(ক) বন অধ্যাদেশ, ১৯২৭ (পরিবর্তিত ১৯৭৩)

(খ) বন্য প্রাণী সুরক্ষা আইন, ১৯৭৩

(গ) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৭

২. ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট :

(ক) বেঙ্গল স্কোফলুইমেন্স অ্যাক্ট, ১৯০৫

(খ) বেঙ্গল কার/ভেইকেল অ্যাক্ট, ১৯৩৯

(গ) ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট, ১৯৬৫

৩. খনিজ সম্পদ উন্নয়ন আইন :

(ক) খনিজ আইন, ১৯২৩

(খ) পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৭৫

৪. উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা আইন :

(ক) পানি এবং জলসীমা অ্যাক্ট, ১৯৭৪

(খ) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অ্যাক্ট, ১৯৭৭

(গ) সামুদ্রিক দূষণ রোধ অ্যাক্ট (প্রস্তাবিত)

৫. স্বাস্থ্য ও ভোক্তা সুরক্ষা আইন :

(ক) বিশুদ্ধ খাদ্য আইন, ১৯৫৯

(খ) কীটনাশক আইন, ১৯৮৩

৬. বিষাক্ত বর্জ্য সংরক্ষণ আইন :

(ক) পৌরসভা অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৭

(খ) কীটনাশক অর্ডিন্যান্স, ১৯৭১ (সংশোধনী ১৯৮০, ১৯৮১)

৭. মৎস্য ও জলজ সংরক্ষণ আইন :

(ক) পানি এবং সামুদ্রিক জলসীমা অ্যাক্ট, ১৯৭৪

(খ) মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৮২

(গ) সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ১৯৮৩

৮. ভূমি ও নগর উন্নয়ন আইন :

(ক) নগর উন্নয়ন অধ্যাদেশ, ১৯৫৩

(খ) স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২

৯. বায়ু ও পানি দূষণ রোধ আইন :

(ক) ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট, ১৯৫৫

(খ) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৭

১০. সংস্কৃতি উন্নয়ন আইন

(ক) প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণ আইন, ১৯৫৮

(খ) প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৬ প্রভৃতি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর বিভিন্ন সংস্থা এসব আইন প্রয়োগ করে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

৬.৫ বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি (Environment Policy of Bangladesh)

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব, উন্নতি নির্ভরশীল। সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি সব প্রাণের অস্তিত্ব ও মানব সভ্যতার উন্নয়নে একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবজন্তু সংরক্ষণ ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে শুধু পদক্ষেপ নিলে হবে না সেখানকার জনগণের মধ্যে প্রচার ও তাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানোও একটি বিশেষ দিক। বাংলাদেশে পরিবেশের উপর বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে তাকে বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি ও ব্যবস্থাপনা বলে।

দেশে প্রতি বছরই উপর্যুপরি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভাইরাসে মহামারি, উপকূলীয় নদীগুলোতে লবণাক্ততা, বনাঞ্চল উজাড়, আবহাওয়ার অস্থিরতা রোধ প্রভৃতি ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থা পরিবেশ নীতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। এদেশে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় প্রতি বছরই হচ্ছে এতে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই। তদুপরি, এদেশে অধিক জনসংখ্যার চাপ। তাই, বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি ১৯৯২ মোতাবেক দেশের সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে বনজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সরকারের উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে। পরিবেশ বিভাগ তাদের নির্দিষ্ট সংরক্ষণ পরিকল্পনা মোতাবেক উদ্ভিদ সম্পদের বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিত সুযোগের ব্যবস্থা রেখেছে। যেমন :

১. দেশের যেসব জলাভূমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে জরুরিভিত্তিতে সেগুলোর তালিকা করা।

২. লোনা পানি এবং মৃদু বা মিঠা পানির বনজ সম্পদ এবং পশু সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করা।

৩. বিভিন্ন জীব ও প্রাণী সংরক্ষণ এবং তার জন্য পরিবেশ বিভাগে পর্যবেক্ষণ সেল (monitoring cell) গঠনের ব্যবস্থা করা।

৪. বিভাগ স্তরে (division level) প্রাকৃতিক সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

৫. সমাজ বিষয়ক এন.জি.ও (N.G.O.), জীব বৈচিত্র্য সম্বন্ধীয় সম্পদ উন্নয়নের উপর সাহায্যকারী প্রকল্প স্থাপন অথবা NEMAP এর নীতি অনুসরণ করা।

৬. জীবন বাঁচানো নির্দিষ্ট গাছপালা (life support plant species) এবং জীবিত রসের ব্যাংক (Germ plasm Bank) স্থাপনকরণ।

৭. বিভিন্ন আর্থ পদ্ধতির উপর প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করা।

৮. দেশের বিভিন্ন হাওড়, যেমন—হাকালুকি হাওড়, হেইল হাওড় (Hail Haor), টাঙ্গুয়ার হাওড় (Tanguar Haor) ইত্যাদির সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থ-পদ্ধতির ব্যবস্থার জন্য সাহায্যকারী প্রকল্প গঠন।

৯. দেশের জলাভূমিসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত।

১০. সামুদ্রিক এলাকার জলাভূমিসমূহের নির্দিষ্টভাবে ভয়াবহতা এবং অব্যবস্থার উন্নয়ন-সাধনের তালিকাকরণ।

১১. বাংলাদেশের কেবল কোরাল রীফ দ্বীপ (Coral Reef Island) সংরক্ষণ এবং পুনঃজমাকরণ কাজ পর্যবেক্ষণকরণ।

১২. জরুরি আর্থ পদ্ধতির জন্য পরিবেশগত মানচিত্র অঙ্কন প্রস্তুতকরণ।

১৩. জীব বৈচিত্র্যের নির্ভরযোগ্য তহবিল গঠন করা।

এ সম্পর্কে মন্তব্য হলো, উন্নয়নশীল দেশে সমস্যা পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও কিছু থাকবে। পরিবেশ পর্যবেক্ষণের পূর্ব শর্ত হচ্ছে নীতি (Policies), কৌশল (Strategies), পরিকল্পনা (Plans) এবং অনুষ্ঠানলিপি (Programme) প্রণয়ন করা যা দ্বারা এ হারানো সম্পদসমূহ (Diverse resources) ফিরে পাবার উপায় খুঁজে পাওয়া যায়। এ কাজের জন্য দেশের জনগণের এবং বৈদেশিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

আর্থ-পর্যটন উন্নয়ন (Eco-Tourism development) : বাংলাদেশে আর্থ পর্যটন উন্নয়নের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। জাতীয় পার্কসমূহ এবং ভ্রমণশীল বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমেই এটি করা সম্ভব। কারণ, এগুলো বর্তমানে তত বেশি উন্নত নয়। এক্ষেত্রে সুন্দরবনের সম্ভাবনা সবারই জানা এবং এটির জন্য মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। তদুপরি, মধুপুরের গড়, ভাওয়ালের গড়, হিমচড়ি (Himchari) এবং শ্রীমঙ্গলের বনজঙ্গল পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উন্নয়ন করা যেতে পারে।

৬.৬ জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিম্যাপ, বাংলাদেশ (National Environment Management Action Plan, NEMAP, Bangladesh)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচনা, পর্যালোচনা, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে প্রণীত পরিবেশ সম্পর্কিত যে একটি জাতীয় দলিল সম্পাদন করা হয়, তাকে জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বা নিমাপ (NEMAP) বলে।

এ জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের দলিলকে কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত পাঁচ খণ্ডে শ্রেণীভাগ করা হয়। যেমন :

প্রথম খণ্ড : নিমাপ বিষয়ক সারাংশ প্রতিবেদন

দ্বিতীয় খণ্ড : নিমাপ বিষয়ক মূল প্রতিবেদন

তৃতীয় খণ্ড : প্রকল্প সারাংশ

চতুর্থ খণ্ড : নিমাপ প্রণয়ন প্রণালি সংক্রান্ত প্রতিবেদন

পঞ্চম খণ্ড : সারণিসহ কারিগরি প্রতিবেদন।

দেশের কেন্দ্র বিন্দু থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিমাপ এর কার্যক্রম রয়েছে। দেশের যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিমাপ এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়। জনগণকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার পরিবেশ বজায় রাখাই এর উদ্দেশ্য। এই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। যেমন : দেশে আর্সেনিক দূষণ রোধ, পোলিও টিকা দেয়া প্রভৃতি সম্পর্কে নিমাপ এর যথাযথ প্রচার ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সেল, নীতিমালা, নির্দেশিকা ইত্যাদি রয়েছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার ফলে জনগণের জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে দিন দিন উন্নতি সাধিত হয়। সময়ের পরিবর্তনে তাই নিমাপ এর কার্যক্রমের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও উৎকর্ষতা সাধিত হয়। উপরোক্ত কার্যক্রম গ্রহণে UNDP, USAID, BRAC, দেশের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ইত্যাদির সরাসরি ও পরোক্ষ সহযোগিতা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে এ কাজের জন্য দেশী বিশেষজ্ঞের পাশাপাশি বিদেশী বিশেষজ্ঞও প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬.৭ পরিবেশগত দিক নির্দেশনা (Environmental Guidelines)

শিল্প কারখানা এবং পানি সম্পদের উপর পরিবেশগত দিক নির্দেশনা নিম্নরূপ :

১। শিল্প কারখানার পরিবেশ (Environment of industry),

১. শিল্প কারখানার স্থান লোকালয় থেকে দূরে থাকা উচিত।

২. শিল্প এলাকায় যাতে কোনো বস্তি গড়ে না ওঠে সেদিক খেয়াল রাখা।

৩. শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের পূর্বে তা অবশ্যই পরিশোধন করা।

৪. শিল্প কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া অনেক বড় চিমনির মধ্য দিয়ে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়া।

৫. এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কাজ করার সুবিধার্থে প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

৬. কারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৭. কারখানা থেকে কর্মচারিদের সুযোগ ও বেতন ভাতাদি ব্যয় সাধ্য মোতাবেক ধার্য করা উচিত।

৮. কর্মচারিদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

৯. ভালো কাজ করলে তার জন্য উৎসাহ প্রদানের (incentive) ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

১০. কর্মরত কর্মচারিদের নির্দিষ্ট কাজে ঢোকার পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

১১. কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বাসস্থানের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

১২. বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান নদী ও পার্শ্ব রাস্তার ধারে স্থাপন করা উচিত, এতে যোগাযোগের সুবিধা হয়।

২। পানি সম্পদের পরিবেশ (Environment of Water) :

১. কোনো নদী, পুকুর বা যে কোনো জলাশয়ের যে কোনো বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করা ঠিক নয়।

২. বাসগৃহ, শহর এলাকা, শিল্পকারখানা প্রভৃতি থেকে আগত বর্জ্য পদার্থ মিশ্রিত পানি শোধন করে যে কোনো জলাশয়ে ছেড়ে দেয়া উচিত।

৩. নদীর পানিতে গরু-ছাগল গোসল করালে পানি দূষিত হয়।

৪. নদী বা পুকুরের পাড়ে মলত্যাগ করা উচিত নয়, নির্দিষ্ট পায়খানা ব্যবহার করা উচিত।

৫. পামাণবিক বর্জ্য পদার্থ মাটিতে কঠিন শিলার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পুঁতে ফেলা উচিত, সেটি সমুদ্রের পানিতে ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়।

৬. নলকূপ বা ইন্দারা থেকে ৩০ মিটার দূরে কাঁচা পায়খানা স্থাপন করা উচিত।

৭. মজা পুকুরের কচুরিপানা পরিষ্কার করে দিলে পানি ভালো থাকে।

৮. পুকুর বা নদীর কাছে কোনো ফসলের ক্ষেতে কীটনাশক ওষুধ দিলে বৃষ্টির পানির সমন্বয়ে পুকুর বা নদীর পানি দূষিত হয়। সুতরাং এদিকে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

৯. মরা জীবজন্তু বা প্রাণীর মরদেহ পানিতে ফেলা ঠিক নয়, তাহলে পানি দূষিত হয়।

১০. পানির লবণাক্ততা (salinity), ময়লা (dirty) দূর করে তা ব্যবহার করা উচিত।

১১. মৎস্য চাষে ব্যবহৃত পানিতে মৌল নাইট্রোজেন হিসেবে অ্যামোনিয়ার সর্বোচ্চ উপস্থিতি ১.২ মিলিগ্রাম/লিটার থাকা আবশ্যক।

১২. সেচ কার্যে ব্যবহৃত পানির তড়িৎ পরিবাহিতা ২৫° সেলসিয়াস উষ্ণতায় ২২৫০ μmho/cm থাকা আবশ্যক। এই পানিতে সোডিয়াম ২৬% বা তার নিচে এবং বোরন ০.২% বা তার নিচে থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্নমালা

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। পরিবেশগত কাঠামো বলতে কি বুঝ?

উত্তর : বিশ্ব তথা দেশের প্রাণিজ, প্রাকৃতিক ও বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে কার্যকর কার্যক্রম রয়েছে তাকে পরিবেশগত কাঠামো বলে।

২। উন্নত ফলনশীল পদ্ধতি বলতে কি বুঝ?

উত্তর : উন্নত (HYV) পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা, ভূমি কর্ষণ ও আবাদ করার কৌশল এটির আওতাভুক্ত, উন্নত বীজ এই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়।

৩। জলবায়ু সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন বিশ্বের কোথায় এবং কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : জলবায়ু সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১৯৭২ সালের জুন মাসে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয়।

৪। সার্ক (SAARC) এর সাত জাতির পরিবেশ ও বন সম্পর্কিত সম্মেলন কখন এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : দক্ষিণ এশিয়ার সার্ক এর সাত জাতির পরিবেশ ও বন সম্পর্কিত সম্মেলন জানুয়ারি ৯ থেকে ১২, ১৯৯৫-তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়।

৫। বার্লিন সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : বার্লিন সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো : আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাসের উদগীরণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঐক্যমতে পৌঁছানো ও একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।

৬। জাতীয় পরিবেশ সংক্রান্ত আইন বলতে কি বুঝ?

উত্তর : দেশের পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা করার জন্য যে আইন রয়েছে তাকে জাতীয় পরিবেশগত আইন বলে।

৭। বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি (Environment policy of Bangladesh) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : বাংলাদেশে পরিবেশের বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে তাকে বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি ও ব্যবস্থাপনা বলে।

৮। নিমাপ (NEMAP) এর অর্থ কি?

উত্তর : নিমাপ (NEMAP) একটি ইংরেজি শব্দ, যার অর্থ 'জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম"।

৯। শিল্প কারখানা স্থাপনের তিনটি পরিবেশগত দিক নির্দেশনা লিখ।

উত্তর : শিল্প কারখানা স্থাপনের তিনটি পরিবেশগত দিক নির্দেশনা নিম্নরূপ :

(১) শিল্প কারখানার স্থান লোকালয় থেকে দূরে থাকা উচিত,

(২) শিল্প এলাকায় যাতে কোনো বস্তি গড়ে না উঠে সেদিকে খেয়াল রাখা,

(৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের পূর্বে তা অবশ্যই পরিশোধন করা প্রভৃতি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। ব্রুনল্যান্ড কমিশন (Brunland Commission) কি?

উত্তর : ১৯৮৩ সালে জাতিসংঘে পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব কমিশন গঠিত হয় এবং এ কমিশনে বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চেয়ারম্যানের নাম অনুযায়ী এই কমিশনের নাম হয় "ব্রুনল্যান্ড কমিশন"।

২। জলবায়ু সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন কোথায় এবং কি উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়? জলবায়ু পরিবর্তনের ছয়টি প্রতিক্রিয়ার নাম লিখ।

উত্তর : জলবায়ু সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১৯৭২ সালের জুন মাসে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয়। মানব পরিবেশের উপর জাতিসংঘে "জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি" গঠন করাই এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য। জলবায়ু পরিবর্তনের ছয়টি প্রতিক্রিয়ার নাম নিম্নরূপ :

(১) বন্যা হয়, (২) লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়, (৩) খরার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, (৪) সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়, (৫) বৃষ্টিপাত হয়, (৬) শীত ও গরম পড়ে ইত্যাদি।

৩। ধরিত্রী সম্মেলন কোথায় ও কোন সালে অনুষ্ঠিত হয়? এই সম্মেলনের তিনটি করে সফলতা ও ব্যর্থতা বর্ণনা কর।

উত্তর : ১৯৯২ সালের জুন মাসে ব্রাজিলের রাজধানী রিও-ডি-জেনিরোতে ধরিত্রী সম্মেলন (Earth Summit) অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১২০ টিরও বেশি দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, কয়েক সহস্র কর্মকর্তা, ১৭৮টি দেশের ১৪০০ এরও বেশি বেসরকারি সংস্থা (NGO's) এ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এ সম্মেলনের তিনটি করে সফলতা ও ব্যর্থতা নিচে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন :

ধরিত্রী সম্মেলনের সফলতা	ধরিত্রী সম্মেলনের ব্যর্থতা
১. পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত ঘোষণার মাধ্যমে দেশে দেশে পরিবেশ উন্নয়ন নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়।	১. শিল্পোন্নত দেশে ও জাতিসংঘের বাধার কারণে CO_2 গ্যাস নির্গমন বন্ধের সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়নি।
২. এজেন্ডা-২১ মোতাবেক ১৯৯০ দশকে ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে একটি একশালা পরিকল্পনা তৈরি করা।	২. বন সংরক্ষণ ঘোষণা কার্যকর হয়নি। কারণ অনেক দেশই এটির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নি।
৩. বনজ সম্পদ রক্ষা করার জন্য নীতিমালা তৈরি করা	৩. জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় জাতিসংঘ স্বাক্ষর করে নি। এজন্য এ সিদ্ধান্ত অকার্যকর হয়ে পড়ে।

৪। বার্লিন সম্মেলনের তিনটি উদ্দেশ্য, সফলতা ও ব্যর্থতা বর্ণনা কর।

উত্তর : বার্লিন সম্মেলনের তিনটি উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাসের উপস্থিতি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঐক্যমতে পৌঁছানো।

(২) এ লক্ষ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যার জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে বিপদজনক কার্যাবলি থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

(৩) শিল্পোন্নত দেশগুলোকে ১৯৯০ সালের গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রায় নিয়ে আসা প্রভৃতি।

সফলতা : গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছানো এবং বার্লিনে একটি সচিবালয় স্থাপনে সম্মতি জ্ঞাপন।

ব্যর্থতা : উন্নয়নশীল দেশ গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের পদক্ষেপ না নেয়ায় হতাশা প্রকাশ এবং শিল্পোন্নত দেশসমূহের ভোগবিলাসে লাগামহীন শক্তি ও সম্পদ ব্যবহারে গ্রীন হাউজ গ্যাস কমানোর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি আদায়ে ব্যর্থ হওয়া।

৫। শিল্প কারখানা সম্পর্কিত নির্দেশনা (Guidelines for Industries) বলতে কি বুঝ? পরিবেশ দূষণের মাত্রানুসারে শিল্প কারখানাকে কয়ভাগে ভাগ করা হয় লিখ।

উত্তর : শিল্প কারখানা সঠিক স্থানে ও উপায়ে স্থাপন করা এবং দূষণ রোধ বা কম দূষণ ঘটিয়ে চালানোর যে নির্দেশনা রয়েছে তাকে শিল্প কারখানা সম্পর্কিত নির্দেশনা বলে।

পরিবেশ দূষণের মাত্রা অনুসারে শিল্প কারখানাকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যেমন :

(১) **সবুজ শ্রেণী :** এ শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিবেশের কম দূষণ ঘটায়। যেমন : টিভি, টেলিফোন, কৃত্রিম চামড়াজাত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

(২) **কমলা - ক শ্রেণী :** এ শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান সবুজ শ্রেণীর তুলনায় সামান্য বেশি পরিবেশ দূষণ ঘটায়। যেমন : গো খামার, জুতা ও চামড়া সামগ্রীর প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

(৩) **কমলা খ শ্রেণী :** এ শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান কমলা - ক থেকে কম দূষণ ঘটায়। যেমন : গ্লাস ফ্যাক্টরি, ভোজ্য তেল উৎপাদন মিল ইত্যাদি।

(৪) **লাল শ্রেণী :** এ শ্রেণীর শিল্প কারখানা সবচেয়ে বেশি পরিবেশ দূষণ ঘটায়। যেমন : ট্যানারি শিল্প, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, কীটনাশক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

৬। ক-শ্রেণীর বিশটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ।

উত্তর : ক-শ্রেণীর বিশটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম নিম্নরূপ :

(১) গো-খামার, (২) পোলট্রি প্রতিষ্ঠান, (৩) আটা ও ময়দা ভাঙ্গানো প্রতিষ্ঠান, (৪) তাঁত শিল্প, (৫) জুতা প্রস্তুত প্রতিষ্ঠান, (৬) করাত কল, (৭) কাঠ কল, (৮) ধাতব শিল্প, (৯) ছাপাখানা, (১০) লবণ শিল্প, (১১) কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুত সংস্থা, (১২) কাঁসা শিল্প, (১৩) বিস্কুট ও রুটি প্রস্তুত সংস্থা, (১৪) প্লাস্টিক শিল্প, (১৫) হোটেল, (১৬) সিনেমা হল, (১৭) কৃত্রিম চামড়াজাত প্রতিষ্ঠান, (১৮) খেলাধুলার সামগ্রী, (১৯) কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুত সংস্থা, (২০) স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত সংস্থা ইত্যাদি।

৭। লাল-শ্রেণীর বিশটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ।

উত্তর : লাল শ্রেণীর বিশটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম নিম্নরূপ :

(১) ট্যানারি শিল্প, (২) সার-কারখানা, (৩) রাসায়নিক শিল্প, (৪) সিমেন্ট কারখানা, (৫) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, (৬) তেল শোধনাগার, (৭) কাগজ কল, (৮) সোডা তৈরির কারখানা, (৯) বিস্ফোরক কারখানা, (১০) প্লাস্টিক উৎপাদন কারখানা, (১১) কীটনাশক কারখানা, (১২) সমরাস্ত্র তৈরির কারখানা, (১৩) পারমাণবিক শক্তির ইউনিট, (১৪) বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট, (১৫) ব্যাটারি শিল্প, (১৬) তামাক শিল্প, (১৭) হাসপাতাল, (১৮) রেফ্রিজারেটর কারখানা, (১৯) কার্পেট মিল, (২০) রাবার শিল্প, (২১) জাহাজ নির্মাণ কারখানা ইত্যাদি।

৮। শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কিভাবে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়?

উত্তর : শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বে উদ্যোক্তাগণকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে শিল্প কারখানার শ্রেণীভেদ মোতাবেক ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়। উক্ত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য আবেদনপত্রের সাথে নানাবিধ শর্তাবলি পূরণ করতে হয়। শর্তাবলি সন্তোষজনক না হলে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ছাড়পত্র দেয়া হয় না। ছাড়পত্র দিতে ক-শ্রেণী, কমলা ক ও খ এর প্রতি অপেক্ষাকৃত কম এবং লাল শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ক. পরিবেশগত কাঠামো বলতে কি বুঝ?

খ. পরিবেশগত নীতি কি এবং পরিবেশ উন্নয়নে বারোটি নীতি রাখা হয়েছে তার মধ্যে অন্ততপক্ষে পাঁচটি বর্ণনা দাও।

২। ক. আর্থ-পর্যটন উন্নয়ন (Eco-Tourisum development) বলতে কি বুঝ?

খ. আন্তর্জাতিক জলবায়ু সংক্রান্ত সম্মেলন (International climate convention) এর উদ্দেশ্য কি?

গ. সার্ক (SAARC) এর অর্থ এবং উদ্দেশ্য কি?

৩। ক. সম্পদগত আইন বা পরিবেশগত অ্যাক্ট (Material Laws বা Environment Act, 1995) এর আওতায় কি কি পদক্ষেপ গৃহীত হয়?

খ. পরিবেশগত দিক নির্দেশনার (Environment Guidelines) ক্ষেত্রে শিল্প কারখানার পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত আলোচনা কর।

৪। ক. বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি ও নিমাপ (NEMAP) বলতে কি বুঝ?

খ. বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সম্পর্কে সারাংশ লিখ।

৫। ক. জাতীয় পরিবেশ আইন (National Environment laws) কি?

খ. বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে পরিবেশ সংক্রান্ত যে আইন-কানুন জারি করা হয়েছে তা লিখ।

৬। ক. শিল্প কারখানার পরিবেশগত নির্দেশনা (Environment guidelines for industries) বলতে কি বুঝ?

খ. এ নির্দেশনাকে কয়ভাগে ভাগ করা করা হয়, বর্ণনা কর।

৭। ক. শিল্প কারখানা স্থাপনের পূর্বে সবুজ ও লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প কারখানাগুলোকে কি কাজ করতে হয়?

খ. সবুজ ও লাল শ্রেণীভুক্ত পাঁচটি করে শিল্প কারখানার নাম লিখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা

প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম

ষষ্ঠ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা ১৯৯৭

৫ম পর্ব সমাপনী (বিশেষ) পরীক্ষা ১৯৯৭

(সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের জন্য)

সকল টেকনোলজি

বিষয় : এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ

সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৫০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ থেকে যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১০ × ১ = ১০)

১। পরিবেশ জীবজগতে কি প্রভাব বিস্তার করে?

২। পরিবেশের দুটি কাজ উল্লেখ কর।

৩। আপেক্ষিক দরিদ্রতা বলতে কি বুঝায়?

৪। জমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ হ্রাস করার পদ্ধতি কি?

৫। ইটের ভাটা দ্বারা কিভাবে বায়ু দূষিত হয়?

৬। কৃষি জমিতে কীটনাশক ছিটানো দ্বারা পানি দূষণের প্রতিক্রিয়া লিখ।

৭। ইউট্রোফিকেশন বলতে কি বুঝায়?

৮। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের দুটি পদ্ধতি লিখ।

৯। অজৈব সার প্রয়োগের দুটি প্রতিক্রিয়া লিখ।

১০। ওজোন স্তর ক্ষয়ের দুটি কারণ লিখ।

খ-বিভাগ (মান : ১০ × ২ = ২০)

১। পরিবেশ শিক্ষার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

২। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা উল্লেখ কর।

৩। পরিবেশের উপর জনসংখ্যার প্রভাব লিখ।

৪। বাংলাদেশের দরিদ্রতার কারণ চিহ্নিত কর।

৫। বেকারত্ব দূরীকরণের পাঁচটি পদ্ধতি উল্লেখ কর।

৬। ইকোসিস্টেমের অজৈব উপাদানগুলি লিখ।

৭। পরিবেশের উপর নগরায়ণের পাঁচটি উপায় উল্লেখ কর।

৮। শিল্প দূষণ হতে পরিত্রাণের পাঁচটি উপায় উল্লেখ কর।

৯। পানি দূষণের প্রতিক্রিয়াসমূহ লিখ।

১০। পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান পাঁচটি কারণ লিখ।

গ-বিভাগ

(মান : ৫ × ৪ = ২০)

১। পরিবেশগত নাগরিকত্ব কার্যক্রমের বর্ণনা দাও।

২। বাংলাদেশে পরিবেশগত কার্যক্রম ও উন্নয়নের বিষয় উল্লেখ কর।

৩। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা দাও।

৪। বাংলাদেশে কৃষি ও পশু সম্পদ রক্ষাকল্পে পরিবেশের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

৫। বর্জ্য পদার্থ অপসারণ পদ্ধতিগুলির বর্ণনা দাও।

৬। ওজোন স্তর ক্ষয় রোধে গ্রীন হাউজের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বি:দ্র: প্রশ্নের উত্তর বাংলা অথবা ইংরেজি অথবা উভয় ভাষায় প্রদানযোগ্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা

প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম

পঞ্চম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা ১৯৯৯

এবং

৬ষ্ঠ পর্ব সমাপনী (বিশেষ) পরীক্ষা ১৯৯৮

সকল টেকনোলজি

বিষয় : এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ

সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৫০

'ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ'-বিভাগ হইতে যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

'ক'-বিভাগ (মান : ১০ × ১ = ১০)

১। প্রধানত কি কি ভাবে পরিবেশ দূষণ হয়?

২। ইকো সিস্টেমের প্রধান উপাদানগুলোর নাম লিখ।

৩। বায়ো-ডাইভারসিটি কাকে বলে?

৪। ইউট্রোফিকেশন বলতে কি বুঝায়?

৫। গ্রীন হাউজ গ্যাসগুলোর নাম লিখ।

৬। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখ কর।

৭। বায়ু দূষণের কারণগুলি উল্লেখ কর।

৮। আপেক্ষিক দরিদ্রতা বলতে কি বুঝায়?

৯। পরিবেশ কাকে বলে?

১০। বাংলাদেশে বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রধান ৪টি কারণ লিখ।

'খ'-বিভাগ (মান : ১০ × ২ = ২০)

১১। ভূ-প্রকৃতি বা ভূমিরূপ অনুযায়ী বাংলাদেশকে কি কি অঞ্চলে ভাগ করা যায়?

১২। ওজোন লেয়ার অবক্ষয়ের কারণে কি কি অসুবিধা হতে পারে?

১৩। শব্দ দূষণের প্রতিক্রিয়াগুলো উল্লেখ কর।

১৪। বনভূমির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দানগুলো কি কি?

১৫। গ্রীন হাউজ ইফেক্ট বলতে কি বুঝায়?

১৬। বাংলাদেশের দীর্ঘ মেয়াদি সমস্যাগুলো কি কি?

১৭। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ এর তাৎপর্য উল্লেখ কর।

১৮। পশু সম্পদ উন্নয়ন কৌশলগুলো লিখ।

১৯। পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতিগুলি কি কি?

২০। বন্যা ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝায়? সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

'গ' বিভাগ

(মান : ৫ × ৪ = ২০)

২১। বাংলাদেশের শক্তি সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২২। জনসংখ্যা সমস্যাকে কিভাবে জনশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব?

২৩। পরিবেশ সংরক্ষণে নাগরিকত্ব কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর।

২৪। সম্পদ কি? বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সম্পদগুলি সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

২৫। অজৈব সার ও কীটনাশক ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর।

২৬। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Waste management) বলতে কি বুঝায়? বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর।

বি:দ্র: প্রশ্নের উত্তর বাংলা অথবা ইংরেজি অথবা উভয় ভাষায় প্রদানযোগ্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা

প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম

পঞ্চম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা ২০০১

সকল টেকনোলজি

বিষয় : এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ

সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৫০

'ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ'-বিভাগ হইতে যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

'ক'-বিভাগ (মান : ১০ × ১ = ১০)

১। পরিবেশের প্রধান ২টি উপাদানের নাম লিখ।

২। প্রাকৃতিক ক্ষয়সাধন বলতে কি বুঝায়?

৩। অজৈব সার প্রয়োগের দুটি প্রতিক্রিয়া লিখ।

৪। আপেক্ষিক দরিদ্রতা বলতে কি বুঝায়?

৫। মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ৫টি মৌলিক উপাদান কি কি?

৬। "ওজোন স্তর" ক্ষয়ের দুটি কারণ লিখ।

৭। "গ্রীন হাউজ" কাকে বলে?

৮। ওজোন গ্যাস সূর্যের কোন ক্ষতিকর রশ্মি শোষণ করে?

৯। ইউট্রোফিকেশন বলতে কি বুঝায়?

১০। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ কর।

'খ'-বিভাগ (মান : ১০ × ২ = ২০)

১১। পরিবেশ শিক্ষার ৪টি বৈশিষ্ট্য লিখ।

১২। "পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কযুক্ত"—এই উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

১৩। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

১৪। চামড়া শিল্পের বর্জ্য পরিবেশের কিরূপ দূষণ করে লিখ।

১৫। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদসমূহের নাম লিখ।

১৬। বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণসমূহ চিহ্নিত কর।

১৭। বাংলাদেশ একটি বড় আকারের "ব–দ্বীপ" আলোচনা কর।

১৮। শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পানি অপচয়ের কারণগুলো কি কি হতে পারে?

১৯। শব্দ দূষণ রোধের ৪টি উপায় বর্ণনা কর।

২০। বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ হ্রাসের ৪টি কৃত্রিম কারণ উল্লেখ কর।

'গ' বিভাগ **(মান : ৫ × ৪ = ২০)**

২১। বাংলাদেশে দরিদ্রতার কারণগুলো আলোচনা কর।

২২। পরিবেশের প্রতি জনসংখ্যার প্রভাব বর্ণনা কর।

২৩। বাংলাদেশের উন্নয়নে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব আলোচনা কর।

২৪। ওজোন স্তর ক্ষয়রোধে গ্রীন হাউজের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২৫। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বন্যা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

২৬। বাংলাদেশে কৃষি ও পশু সম্পদ রক্ষাকল্পে পরিবেশের গুরুত্ব আলোচনা কর।

বি:দ্র: প্রশ্নের উত্তর বাংলা অথবা ইংরেজি অথবা উভয় ভাষায় প্রদানযোগ্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা

প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম

পঞ্চম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা ২০০২

সকল টেকনোলজি

বিষয় : এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ

সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৫০

'ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ'-বিভাগ হইতে যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

'ক'-বিভাগ (মান : ১০ × ১ = ১০)

১। পরিবেশের সংজ্ঞা দাও।

২। গ্রীন পিস বলতে কি বুঝায়?

৩। অধিক জনসংখ্যা পরিবেশের জন্য হুমকি কেন?

৪। গাছ পরিবেশের বন্ধু কেন?

৫। ম্যান গ্রোভ্ড ফরেস্ট কাকে বলে।

৬। পরিবেশ দূষণের ৪টি কারণ উল্লেখ কর।

৭। শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবগুলি উল্লেখ কর।

৮। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ কর।

৯। গ্রীন হাউজ গ্যাসগুলির নাম লিখ।

১০। পরিবেশ দূষণের জন্য বেশি দায়ী ৪টি শিল্প কারখানার নাম লিখ।

'খ'-বিভাগ (মান : ১০ × ২ = ২০)

১১। পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

১২। পরিবেশ দূষণের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের উৎসমূহ কি কি?

১৩। "পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কযুক্ত"—এই উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

১৪। মৎস্য সম্পদ হ্রাসের প্রধান প্রধান কারণগুলি উল্লেখ কর।

১৫। পশু সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

১৬। ঘূর্ণিঝড়ের কারণগুলি উল্লেখ কর।

১৭। পানির pH মান পরিবর্তনের ফলে জলজ প্রাণীর উপর কি প্রতিক্রিয়া হয়?

১৮। চামড়া শিল্প কিভাবে পরিবেশকে দূষিত করে?

১৯। CFL গ্যাস কিভাবে ওজোন স্তরের ক্ষতি করে তা আলোচনা কর।

২০। ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনের সফলতাগুলি আলোচনা কর।

'গ' বিভাগ **(মান : ৫ × ৪ = ২০)**

২১। একজন পরিবেশ নাগরিক হিসেবে তোমার দায়িত্ব কি হওয়া উচিত আলোচনা কর।

২২। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বনজ সম্পদের গুরুত্ব আলোচনা কর।

২৩। পরিবেশের উপর জনসংখ্যার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

২৪। "জীবনের জন্য পানি" বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

২৫। ওজোন স্তর ক্ষয়রোধে গ্রীন হাউজের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২৬। বাংলাদেশে দরিদ্রতা দূরীকরণের উপায়গুলি আলোচনা কর।

বি:দ্র: প্রশ্নের উত্তর বাংলা অথবা ইংরেজি অথবা উভয় ভাষায় প্রদানযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Air Pollution M.N. RAO, HVN, RAO, (McGRAW HILL).

২. Environment Pollution W.A. Endrews (PRENTICE HALL).

৩. Environment Protection -- Enil T. Chanlett (McGRAW HILL).

৪. Hand Out on fish Resources of Bangladesh (Bangladesh Matshya Sampad) – Dr. M. Yousuf Ali.

৫. Lecture Notes on Environmental Issues in water Resources sector (BUET, DHAKA) - A. Nisgat.

৬. Hand Out on Biodiversity Conservation in Bangladesh – Mohiuddin Ahmed.

৭. The Fundamental Principles of Irrigation and water power – V.B. Priyani.

৮. স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং – শ্রী নীহার কান্তি সামন্ত, অশোক পুস্তকালয়, ৬৬, রমনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০২০১

৯. উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল পরিচয় – তরুণ কুমার বন্দোপাধ্যায় ও অজিত কুমার শীল, ছায়া প্রকাশনী, ৪, কলেজ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

১০. জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সহায়িকা – মোঃ আনোয়ার হোসেন, শাহীন গ্রন্থাগার, কুমিল্লা

১১. পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং – বিশ্বনাথ মজুমদার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

১২. Water supply and sanitary Engineering – Prof. G. L. Kulkarni.

১৩. এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ – খন্দকার আলী আজম, হক পাবলিকেশন, ৩৮ বাংলাবাজার ,ঢাকা।

১৪. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং – মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ৮৬, তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

১৫. Environment Activities in Bangladesh and Development Linkages – Dr. Saleemul Huq.

BANSDOC Library
Accession No...17785

BANSDOC Library Dhaka